KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : 45/6 45/9 45/10	Year of Publication : Oct 1984 Jan 1985 Feb 1985
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ/দশম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
মাঘ-ফাল্গুন ১৩৯১

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অমিয়কুমার মজুমদার ৭৯১
আনন্দমঠ ও আনন্দভবন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮১৭
ইন্দিরা গান্ধী—এখনকার ভাবনা ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৩৮
রবীন্দ্রনাথ ও শব্দবিদ্যা পবিত্র সরকার ৮৫৮

আমাদের ভূখণ্ড আজ রত্নেশ্বর হাজরা ৮২৬
অলৌকিক আশার মোজেস খোন্দকার আশরাফ হোসেন ৮২৭
আনন্দময়ী বার্ণিক রায় ৮২৯
দুটি কবিতা সৈয়দ সমিদুল আলম ৮৩০

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৮০৪
পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৮৩১
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৮৪৪
হৃদয়ে রজনী সুধাংশু ঘোষ ৮৫০

গ্রন্থসমালোচনা ৮৬৫
বিজিতকুমার দত্ত, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিষ্ণু মুখার্জি,
আবদুর রউফ
ঢাকার চিঠি সৈয়দ আবুল মকসুদ ৮৭৪
আলোচনা ৮৭৭
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তুহিন চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী দাস,
দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদচিত্র : বনপথে একাকিনী। জয়নুল আবেদিন
মুখপাতের ছবি। শামীম সিকদার চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Calcutta Steel Company Limited

"Steel House"

20, Hemanta Basu Sarani, Calcutta-700 001

Manufacturers of :

STEEL BARS, RODS, WIRE RODS, COLD TWISTED DEFORMED BARS AND FLATS.

অপরাজিত জরা। শামীম সিকদার চৌধুরী

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অমিয়কুমার মজুমদার

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জন্ম ইংরেজি ১৮৮৭ সালে তৎকালীন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়াতে ; এই স্থান বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। সুরেন্দ্রনাথের আদি বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) গৈলা গ্রামে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই পরিবার সংস্কৃত সাহিত্য-বিশেষত ব্যাকরণ, এবং আয়ুর্বেদ-চর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ; সর্বসাধারণের কাছে এই পরিবার 'কবীন্দ্র' পরিবার নামে পরিচিত ছিল। পিতা কালীপ্রসন্নই প্রথম ব্যক্তি যিনি পিতা-পিতামহের বৃত্তি ত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে জরিপের চাকুরিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না এবং সরকারি চাকুরিয়া হিসাবে তাঁকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হত।

মাত্র তিন বছর বয়সে বালক সুরেন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। কোনো শিক্ষকের সাহায্যে বাঙলা বর্ণমালা শেখার আগেই তিনি রামায়ণ পড়ে এই মহাকাব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারতেন। পিতা কালীপ্রসন্নের মনে সন্দেহের উদয় হওয়াতে তিনি বালককে রামায়ণের একটি দুরূহ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে-সঙ্গে সেই শব্দের যথার্থ অর্থ পিতাকে বলেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারতেন, এবং নানাপ্রকারের যোগাসন সম্পর্কে তাঁর সহজাত জ্ঞান ছিল। হিন্দু ধর্ম এবং দর্শনের নানা দুরূহ প্রশ্নের সদুত্তর তিনি বিনা আয়াসে দিতে পারতেন। সুরেন্দ্রনাথের এই-জাতীয় লোকোত্তর প্রতিভার খবর পেয়ে কলকাতার থিয়সফিক্যাল সোসাইটি সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে জিজ্ঞাসু মানুষের নানা ধর্মীয় তথা দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দেবার ব্যবস্থা করতেন। বহতা গঙ্গানদীর দিকে তাকিয়ে থাকলে, পুরীর সমুদ্র দর্শন করলে, অথবা জলপ্রপাত দেখলে কিংবা কীর্তনগান শুনলে বালক সুরেন্দ্রনাথের সমাধি হত। এই-জাতীয় সমাধির জন্য তাঁর কোনো প্রয়াস ছিল না ; মানুষের শ্বাসগ্রহণের মতো এই অনুভূতি সুরেন্দ্রনাথের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই আসত।

এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাবল্যে সুরেন্দ্রনাথের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে—এই আশঙ্কা করে তাঁর পিতা কলকাতা থেকে সরিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করেন। সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন কৃষ্ণনগরে বদলি হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন এবং গৈলায় গিয়ে টোলে ভরতি হন। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য এবং দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলাপ-ব্যাকরণ আর নব্যন্যায়ের

গ্রন্থাবলী তিনি নিজে পড়ে বুঝে নিতেন, এবং ছাত্রাবস্থায় তিনি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের দুরূহ বিষয়ের পাঠ বুঝিয়ে দিতেন। গৈলা থেকে কৃষ্ণনগরে ফিরে গভর্নমেনট কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'তিলোত্তমাকাব্য' রচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সমান অনুরাগ ছিল ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ঝংকার তাঁকে বেশি মুগ্ধ করত।

কৃষ্ণনগর কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কলেজ-জীবনে সেই সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটে। কলেজের ল্যাবরেটরির অবস্থা খুব ভালো ছিল না এবং রসায়নশাস্ত্র সুরেন্দ্রনাথের কাছে কিছুটা অদ্ভুত মনে হত। কলেজের বার্ষিক বাছাই-পরীক্ষার আগে সুরেন্দ্রনাথ রসায়নের পাঠ্য পুস্তক থেকে প্রায় পঞ্চাশ পাতা কমা-সেমিকোলোন সহ মুখস্থ করে ফেললেন এবং পরীক্ষার খাতায় সেইসব জিনিস বইতে যেমন আছে, ঠিক তেমনি লিখে ফেললেন। পরীক্ষাশেষে ওই খাতা দেখে অধ্যাপক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ক্লাসে এসে বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজন পরীক্ষাগৃহে বই থেকে নকল করেছ ; এটা খুব অমার্জনীয় অপরাধ।" সমস্ত ক্লাস এই কথা শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অধ্যাপক সকল ছাত্রকে লক্ষ করলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের ওপর চোখ রেখে বললেন, "তুমি—তুমিই এই অপকর্ম করেছ!" বিস্মিত, বিহ্বল সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। তবু অধ্যাপকের বিশ্বাস হল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "সুরেন, তোমার উত্তর পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল কেমন করে?" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ জানালেন তিনি বইয়ের প্রায় পঞ্চাশ পাতা মুখস্থ করে ফেলেছেন, এবং প্রয়োজন হলে আবার সেইসব জিনিস অধ্যাপকের সামনে বসে লিখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ওইসব জিনিস অধ্যাপকের সামনে বসে আবার লিখে তিনি অধ্যাপকের অশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা সীমিত উপার্জনের সাহায্যে এক বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করতেন ; আত্মীয়স্বজন ছাড়া বহু ছাত্রও এই পরিবারভুক্ত ছিলেন। অর্থাভাবে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক কেনা সম্ভবপর হয় নি। কাজেই তিনি লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা চালাতেন।

কর্মজীবনের সূত্রপাত

১৯০৬ সালে সংস্কৃতে অনারস নিয়ে বি-এ পাশ করেন এবং নিস্তারিণী পদক পান। ১৯০৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম-এ পাশ করে সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি রাজসাহী (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কাজে যোগদান করেন। পোশাক-পরিচ্ছদে সুরেন্দ্রনাথ মোটেই আধুনিক ছিলেন না, এবং এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন—তাঁর পোশাক ছিল খুব সাদাসিধে আর অল্প দামের। অধ্যাপনার বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', বইটি আগাগোড়া সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। তাই তিনি বই ছাড়াই ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একদিকে যেমন ব্যাকরণ আর ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে নাটকটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা করতেন, তেমনি নাট্যতত্ত্বের দিক থেকেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতেন। তিনি ছাত্রদের প্রায়ই বলতেন, "আমার পোশাক যেমন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তৈরি নয়, তেমনি অধ্যাপনাপদ্ধতিও হবে আমার নিজস্ব ঢঙে, আমি প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে পড়াব না।" রাজসাহীর পরে সুরেন্দ্রনাথ ১৯১১ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে বদলি হন। সেখানে তিনি ছিলেন সংস্কৃত এবং বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ যোগদর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন এবং যোগদর্শনের ওপর গবেষণা করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধের জন্য ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধি পান। পরে ১৯২২ সালে বিলাতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল. উপাধি পান, এবং ১৯৩৯ সালে তাঁকে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়।

বাল্যকাল থেকেই সুরেন্দ্রনাথ যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিলেন তা পরবর্তী কালেও তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইজন্য উপনিষদে যে অপরোক্ষানুভূতির কথা আছে, সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময় সুরেন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটে। যৌবনেই হেগেলীয় ভাববাদের প্রতি তাঁর অনীহা প্রকাশ পেয়েছিল, এবং কেমব্রিজে যখন তিনি অধ্যাপক ম্যাকটাগার্টের কাছে গবেষণা শুরু করেন (গবেষণার বিষয় ছিল 'সাম্প্রতিক ভাববাদিগণ এবং তাঁদের সমালোচক') তখন তাঁর মনে ইউরোপীয় ভাববাদ এবং ভারতীয় অদ্বৈতবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য, সে সম্বন্ধে সংশয় জাগে। তাঁর এই মানসিকতার প্রস্তুতিপর্বে ম্যাকটাগার্ট ছাড়া মুর এবং ওয়ার্ড-এরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ আইনস্টাইন-এর সাপেক্ষতাবাদ, জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদ এবং পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। অদ্বৈতবাদের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের মনে যে বিরাগ যৌবনকালেই দানা বেঁধেছিল সেটি কেমব্রিজ-দার্শনিকদের ভাববাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তাঁর মনোজগতে পরিপূর্ণতা লাভ করল। আসলে, কেমব্রিজ-দার্শনিকেরা সুরেন্দ্রনাথের মনে এমন এক সাহসের সঞ্চার করলেন যার ফলে তিনি অদ্বৈতবাদের ভুলভ্রান্তি নির্ভীকভাবে প্রকাশের সুযোগ পেলেন।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনা

নিঃসন্দেহে, সুরেন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্তি তাঁর পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'এ হিসট্রি অব ইনডিয়ান ফিলসফি'। এই গ্রন্থকে নিছক সাধারণ দর্শনের গ্রন্থ মনে করলে ভুল হবে। সুরেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে ভারতীয় সাধনা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন ; এই বিরাট কর্মযজ্ঞের পিছনের ইতিহাস খুব কৌতূহলপ্রদ। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে একদিন বাঙলার ক্লাসে সুরেন্দ্রনাথ পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় বাঙলার লাট রোনালডশে কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এই সুযোগে সুরেন্দ্রনাথ রোনালডশেকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন-উৎসবে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সুরেন্দ্রনাথ জানতে চান যে, লাটসাহেবের এ ব্যাপারে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা আছে কিনা, কারণ তিনি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। লাটসাহেব জানতে চান সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের কোন্ শাখায় পারদর্শী। জবাবে সুরেন্দ্রনাথ জানালেন, ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় তিনি সমান পারদর্শী। লাটসাহেব এই কথা শুনে বিস্মিত, কিছুটা হয়তো সন্দিহান হয়ে ওঠেন। বিভাগীয় কমিশনার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দে লাটসাহেবের সন্দেহ ভঞ্জন করে বলেন যে সুরেন্দ্রনাথ সত্যিই অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এবং ভারতীয় দর্শনের এমন কোনো শাখা নেই যাতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যুৎপন্ন নন। বাঙলা ক্লাসের বাইরে প্রায় একঘণ্টা যাবৎ ভারতীয় দর্শন নিয়ে লাটসাহেব রোনালডশের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আলোচনা চলতে লাগল। সমস্ত কলেজ উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ করল দুইজনে গভীর আলোচনায় মগ্ন। এই আলোচনার বিষয়বস্তু কী, তা নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনা চলল। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনার সময় সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের আকরগ্রন্থগুলি পড়ে এ বিষয়ে তার নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটা রূপরেখা তৈরি করেন এবং যোগদর্শন বিষয়ে তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এমন সময় একদিন চট্টগ্রামের রাস্তায় বিভাগীয় কমিশনার শ্রী দের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, তিনি সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর ভারতীয় দর্শনের ওপর বইটি কতদূর তৈরি হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন শুনে কিছুটা বিব্রত আর বিস্মিত বোধ করলেন। শ্রী দে তাঁকে জানালেন যে সুরেন্দ্রনাথের বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লাটসাহেবের সঙ্গে পুজোর ছুটির সময় তাঁর দারজিলিঙে দেখা করবার কথা আছে। হাতে তখন মাত্র এক মাস সময়। সুরেন্দ্রনাথ ভাবতেই পারেন নি যে লাটসাহেব ব্যাপারটির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। যাই হোক, দিনরাত্রি অসাধারণ পরিশ্রম করে একটা পাণ্ডুলিপি রচনা করে সুরেন্দ্রনাথ সেটিকে লাটসাহেবের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

তখন সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল বইটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। লাটসাহেব বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই বই কালে পাঁচটা খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের মতো অন্যান্য খণ্ডগুলিও কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস প্রকাশ করেন।

পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পূর্ব পরিকল্পনামতো একটিমাত্র খণ্ডে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। কারণ, গবেষণা করতে-করতে সুরেন্দ্রনাথ নিত্যনতুন উপাদান আবিষ্কার করেন, এবং সেই বিপুল উপাদানের জন্যই পাঁচটি খণ্ডের প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পরেই সুরেন্দ্রনাথ ইনডিয়ান এডুকেশন্যাল সারভিসে উন্নীত হন এবং ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন। এই পদের সঙ্গে অন্য একটি দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়—বঙ্গীয় সংস্কৃত সংসদের সচিব হিসাবে রাজ্যের সকল চতুষ্পাঠীর সুষ্ঠু পরিচালনার ভার ছিল তাঁর ওপর। প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে উপাধি পরীক্ষা দিতেন এই সংসদের তত্ত্বাবধানে। প্রশাসনিক কাজে সুরেন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা ছিল ; কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল জ্ঞানান্বেষণ। জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করলেই তিনি হয়ে উঠতেন এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ; তখন জগৎ এবং মানবজীবন তাঁর কাছে অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিত। তবুও জ্ঞানের জগতের অধিবাসী হিসাবে তিনি ছিলেন এক মোহমুক্ত, বিগতস্পৃহ, অসঙ্গ পুরুষ। তাঁর অধ্যয়ন আর প্রশাসনিক কাজ পাশাপাশি চলত। তিনি বলতেন, প্রশাসনের কাজ তাঁর কাছে ছিল পূর্ণ পরিচ্ছদের ওপর একখানা লঘু উত্তরীয়ের মতো।

রবীন্দ্রচর্চা : 'রবীন্দ্রপরিষৎ'

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে তিনি কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই অনলস প্রযত্নের ফলে ১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষৎ স্থাপিত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। কোনো ডিগ্রী কলেজে রবীন্দ্রচর্চার উদ্দেশ্যে এই-জাতীয় প্রচেষ্টা প্রেসিডেন্সি কলেজেই প্রথম হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর ছাত্র এবং অধ্যাপকদের ব্যাপক আলোচনা ছিল এই পরিষদের বৈশিষ্ট্য। এই পরিষৎ ১৯৩১ সালে 'কবিপরিচিতি' নামে আলোচনাগুলির একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রপরিষদের অধিবেশনগুলি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতেন। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই পরিষদের যোগসূত্র ছিল নিবিড়। ১৯২৭ সালে পরিষৎ কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং ১৯২৮ সালে কবি পরিষদের সদস্যদের তাঁর নিজের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন। আবার কবি ১৯২৯, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে তিনবার এই পরিষদে উপস্থিত থেকে সদস্যদের কাজকর্ম দেখেন, তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রপরিষৎকে একটি প্রাণবন্ত আলোচনাচক্রে পরিণত করার কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথের। ১৯৪৪ সালে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্রসংসদ নতুন করে গঠিত হয় তখন রবীন্দ্রপরিষৎ ছাত্রসংসদের অন্তর্গত সাহিত্য-সংস্কৃতি শাখায় পরিণত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন তখন দেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। সেই আন্দোলনের ঝড়ের মুখে সুরেন্দ্রনাথ অবিচলিত থেকে নিজের কর্তব্য করে গেছেন। তাঁর চরিত্রে ছিল অদম্য সাহস এবং অন্তরে ছিল বিধাতাপুরুষের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। তাই তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থাকেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারতেন।

১৯৪২ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এই পদের নাম ছিল 'জর্জ দ্য ফিফথ প্রফেসর অব মেনটাল অ্যানড মর‍্যাল সায়েন্স'। বর্তমানে এই নাম পরিবর্তন করে এই পদকে বলা হয় 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রফেসর অব ফিলসফি'। সুরেন্দ্রনাথ বহু দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছেন এবং তাঁর সকল অভিভাষণের মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দ চিন্তার জগতে এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯২১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইনটার-অ্যালায়েড কংগ্রেস অব ফিলসফি-তে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯২৫ সালে রাশিয়াতে লেনিনগ্রাডের অ্যাকাডেমি অব সায়েনস-এর অধিবেশনে আমন্ত্রিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙলা সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে নেপলস-এ ১৯২৪ সালে এবং হার্ভার্ড-এ ১৯২৬ সালে ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিলসফিতে যোগদান করেন। শিকাগোতে ১৯২৬ সালে হ্যারিস ফাউনডেশন লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা দেবার জন্য বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পান ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল নিউইয়র্ক, ইলিনয়েস, মিসিগান, আইওয়া, রোম, মিলান, বারলিন, কোনিগসবার্গ, বন, সোরবোন, প্যারিস ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে লনডনে অনুষ্ঠিত ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অব রিলিজন-এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। ওই বছরই তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইনডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস-এর দ্বাদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন। ইনডিয়ান ওরিয়েনটাল কংগ্রেস-এর দর্শন-শাখায় তিনি অনেকবার সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৩৯ সালে রোম, মিলান এবং ওয়ারশ-তে ভারতীয় শিল্প এবং ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ওই বছর তিনি আরও দুটি জায়গায় বক্তৃতা করেন, একটি জুরিক-এ অবস্থিত সাইকোলজিক্যাল ইনসটিটিউট অব ইয়ুং-এ ; অপরটি প্যারিস-এ ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অব রিলিজন-এ। ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুরেন্দ্রনাথকে স্টিফেনস নির্মলেন্দু ঘোষ ফেলোশিপ বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই বক্তৃতামালা তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৫৪ সালে এলাহাবাদ থেকে 'রিলিজন অ্যানড র‍্যাশনাল আউটলুক' নামে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়।

আজীবন সারস্বত সাধনার ব্যাপারে এবং ব্যবহারিক সাফল্যের ক্ষেত্রে যাঁদের কাছ থেকে সুরেন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং লর্ড লিটনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যখন কেমব্রিজে গবেষণায় রত ছিলেন সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ লিটনের সংস্পর্শে আসেন। উভয়ের প্রথম

সাক্ষাৎ হয় ছাত্রদের একটি ঘরোয়া বৈঠকে। অনেক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতে ব্রিটিশ-সরকার-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। পরে লিটন যখন বাঙলাদেশের লাটসাহেব হয়ে ভারতে আসেন তখন সুরেন্দ্রনাথ লিটনের সঙ্গে আবার যোগসূত্র স্থাপন করেন। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। পাণ্ডিত্য এবং প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য লিটন সুরেন্দ্রনাথকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করতেন। তবুও নানা বাধাবিঘ্ন আর প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ওই পদে নিযুক্ত হতে সুরেন্দ্রনাথকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে লর্ড লিটনের হস্তক্ষেপের ফলে সব বাধা দূর হয়ে যায়।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সৌহার্দ্য

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দানবীর বলে খ্যাত। বাঙলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি দান করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে মুর্শিদাবাদে এক বক্তৃতাসভায়। মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সেই সভার সভাপতি। সুরেন্দ্রনাথকে একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হয় ; শর্ত ছিল যে, যে-মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠবেন কেবল তখনই তাঁকে বক্তৃতার বিষয়বস্তু জানানো হবে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'প্রেম, মানবীয় ও ভাগবত'। যুবক সুরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে হেগেলীয় ভাববাদে উদ্বুদ্ধ। হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি প্রায় দু ঘণ্টা ধরে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠানশেষে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় মুগ্ধ মণীন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন সুরেন্দ্রনাথকে কোনো প্রকারে সাহায্য করতে পারেন কিনা। বিহ্বল সুরেন্দ্রনাথ এ-জাতীয় প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি হঠাৎ কিছু না ভেবেই বলে ফেললেন, "আমাদের গ্রামে আমার পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার আছে ; সেই গ্রন্থাগারের জন্য কিছু অর্থসাহায্য পেলে ভালো হয়।"

বহু বছর পরে, সুরেন্দ্রনাথ যখন চট্টগ্রাম কলেজে

অধ্যাপক এবং উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করছিলেন তখন আবার মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত দেখে আনন্দিত হন এবং তাঁর জন্য একটা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গঠন করে দেবার প্রস্তাব দেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের কাছ থেকে মাসে-মাসে নিয়মিত অর্থসাহায্য পেতেন : এই দান এবং নিজের সঞ্চয় থেকে ধীরে-ধীরে এক বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তুললেন সুরেন্দ্রনাথ যার পুস্তকসংখ্যা ছিল প্রায় বারো হাজার। বলা বাহুল্য, বইগুলি ছিল সুনির্বাচিত এবং ভারতীয় দর্শন আর ইউরোপীয় দর্শন—উভয় ক্ষেত্রে চর্চার জন্য অপরিহার্য। গ্রন্থাগারটি সুরেন্দ্রনাথ প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং এটা ছিল তাঁর অত্যন্ত গর্বের বস্তু। আমি যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন একবার মনোহরপুকুর রোডে ওঁর বাড়িতে গিয়ে গ্রন্থাগারটি দেখছি, হঠাৎ একটি বই চোখে পড়ল যেটা আমি অনেকদিন থেকে খুঁজছিলাম। বইটার নাম মনে পড়ছে না। অত্যন্ত বিনীতভাবে, খানিকটা ভয়ে-ভয়ে, অধ্যাপকের কাছে আবেদন জানালাম বইখানা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়বার জন্য। মৃদু হেসে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "তুমি যদি আমার বুকের একখানা পাঁজর খুলে নিতে চাও, তা দিতে পারি। কিন্তু বই? কদাচ না। শুনেছ তো বই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, পরহস্তং গতা গতা। তুমি অবসর-সময়ে এইখানে বসে বইখানা পড়ে যেও।" এই হল তাঁর গ্রন্থাগারের প্রতি মমতার নিদর্শন : পুত্রকন্যাকে লালন করার মতোই তিনি তাঁর গ্রন্থাগারকে লালন করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর ; তাঁকে দেখেছি কখনও কোনো রেফারেনস-এর দরকার হলে উনি বলে দিতেন প্রয়োজনীয় বইটি শেলফ-এর কোন্ জায়গায় আছে এবং কত পাতায় বাঞ্ছিত তথ্যটি পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কৌতুককর কাহিনী মনে পড়ছে। সুরেন্দ্রনাথের 'এ হিসট্রি অব ইনডিয়ান ফিলসফি' তৃতীয় খণ্ড বোধহয় ১৯৩৯-১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। ওই বইয়ের এক কপি তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপককে পড়তে দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন যদি তথ্যগত কোনো ভুল বইতে লক্ষ করেন তাহলে যেন তিনি গ্রন্থকারকে জানান, যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যায়। বেশ কিছুদিন বইখানা নিজের কাছে রেখে যেদিন সুরেন্দ্রনাথকে সেটি ফেরত দিতে আসেন সেদিন তিনি বলেছিলেন, কী আর বলি আপনাকে! বইয়ের পাতায়-পাতায় অসংখ্য ভুল রয়েছে! সুরেন্দ্রনাথ শান্তকণ্ঠে তাঁকে বললেন, ভুলগুলি দেখিয়ে দিতে ; তবে একটা কথার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, ভুল তথ্যগত হওয়া চাই—ব্যাখ্যানে গ্রন্থকারের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। অধ্যাপক একটি-একটি করে ভুল দেখাচ্ছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লাইব্রেরি থেকে প্রাসঙ্গিক আকরগ্রন্থ এনে দেখিয়ে দিচ্ছেন—সুরেন্দ্রনাথই ঠিক লিখেছেন, সমালোচক-অধ্যাপকেরই ভুল হয়েছে। বিব্রত, পর্যুদস্ত পণ্ডিত অধ্যাপক যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বসিয়ে রেখে বললেন, "দেখুন, আমি লিখি, কাজেই আমার লেখার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেই পারে। কিন্তু আপনি বড়ো বেঁচে গেলেন। আপনি কোনোদিন বই লিখলেন না। কাজেই আপনার ভুলও কেউ ধরতে পারবে না।" রুষ্ট অধ্যাপক প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি কোনোদিন কিছু লিখি নি বলতে চান?" সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমারই ভুল হয়েছে, আপনি তো মাঝে-মাঝে ছুটির দরখাস্ত লিখে থাকেন।"

এই সময়কার আর-একটি ঘটনাও সমান কৌতুককর। একজন তরুণ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের কাছে কোনো স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে এসেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বিনীতভাবে জানালেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে টাকাপয়সা জমিয়ে সুরেন্দ্রনাথের 'এ হিসট্রি অব ইনডিয়ান ফিলসফি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড কিনেছেন এবং তাঁর পড়বার ঘরে বইখানি গীতা-উপনিষৎ-রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে রেখেছেন। তিনি রোজ সকালে যেমন গীতার কোনো অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করেন তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বইয়েরও কোনো অধ্যায়ের অংশ নিয়মিত পাঠ করে থাকেন। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে অধ্যাপক বললেন, "স্যার, আপনার কলমের ডগায় নিশ্চয়ই সরস্বতী দেবী উপবেশন করেছিলেন, নতুবা এমন অভূতপূর্ব গ্রন্থ আপনি লিখলেন কী করে? আমি যতই পড়ছি ততই বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছি।" সুরেন্দ্রনাথ একটু গম্ভীরকণ্ঠে তাঁকে বললেন, "ওহে, তুমি একবার চৌরঙ্গীতে যে বেঙ্গল স্টোরস আছে সেখানে ঘুরে এসো।" অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, "বেঙ্গল স্টোরস? সেটা কী জিনিস?" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, সেটা হল নিত্য ব্যবহারের নানা সামগ্রীর দোকান, যাকে বলে ডিপার্টমেনটাল স্টোরস।" অধ্যাপক বিনীতভাবে জানালেন, তিনি গরিব মানুষ, যা কেনাকাটার তা তিনি কলেজ স্ট্রীটের বাজার থেকেই কিনে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন, "তোমাকে কিছু কিনতে হবে না, শুধু একবার বেঙ্গল স্টোরসে বেড়িয়ে এসো। দেখবে সেখানে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে লেখা আছে, "হোয়েন ইয়ু আর প্লীজড উইথ আওয়ার ডীলিঙস, টেল আদারস ; হোয়েন নট, দেন টেল আস।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

১৯৩৭-১৯৩৯—এই দু বছর যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' নিয়ে এম-এ পড়ি, তখন সুরেন্দ্রনাথ আমাদের সপ্তাহে দুটি করে ক্লাস নিতেন। আমি ভারতীয় দর্শনের বৌদ্ধ-জৈন শাখা বিশেষ বিষয় হিসাবে পড়তে চাই, এই মর্মে আবেদন করেছিলাম। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তখন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক। সেকালে একটা রীতি ছিল, কোনো স্পেশাল পেপার পড়বার জন্য তিনজনের কম ছাত্র হলে সে বিষয় পড়াবার কোনো ব্যবস্থা হত না। এইজন্য অনেক সময় উৎসাহী অধ্যাপকেরা চাকরি বজায় রাখবার জন্য এবং অন্য কারণে অন্তত তিনজন ছাত্র বিশেষ বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য জোগাড় করতেন। শোনা যায়, কখনও কখনও ছাত্রদের বেতনও অধ্যাপকেরা দিয়ে দিতেন। বৌদ্ধ-জৈন শাখা পড়বার জন্য আমি সেবারে একমাত্র ছাত্র আবেদন করেছিলাম। ন্যূনপক্ষে তিনজন ছাত্র না হওয়ায় আমার পড়াশুনার কোনো ব্যবস্থাই হল না। এইভাবে একমাস কেটে যাবার পরে বিভাগীয় প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তুমি লজিক অথবা বেদান্ত বিশেষ বিষয় হিসাবে বেছে নাও।" আমি জিদ ধরলাম, বৌদ্ধ-জৈন শাখাই পড়ব। তখন তিনি আমাকে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে গিয়ে যোগাযোগ করতে বললেন, কারণ তিনিই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি যদি আমাকে পড়াতে রাজি হন তাহলে আমার সমস্যার সমাধান হয়। ভয়ে-ভয়ে সংস্কৃত কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সব কথা মন দিয়ে শুনে আমাকে দুটি প্রশ্ন করলেন : বি. এ. পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনারস পেয়েছিলাম কিনা, এবং আমার বই কেনার টাকা আছে কিনা। প্রথম প্রশ্নের জবাবে 'না' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলেছিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন, কারণ তিনি পাস কোরস গ্র্যাজুয়েটকে পড়াবেন না। যখন বুঝিয়ে বললাম যে আমি বি. এ. অনারসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ তখন আবার আদর করে বসালেন এবং পারিবারিক নানা প্রশ্ন করলেন। বৌদ্ধদর্শনের একটি পাঠ্যপুস্তক পালি টেকসট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত, দাম পাঁচ টাকা। আমি সেই বইটি কিনব বলাতে তিনি রাজি হলেন না, তাঁর বইয়ের শেলফ থেকে একখানি বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এইটা কিনে পড়তে হবে।" বইখানা ছিল প্রখ্যাত রুশ দার্শনিক সারবাটস্কির 'বুদ্ধিস্ট লজিক'। গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথকে ওটি উপহার হিসাবে দিয়েছেন ; প্রথম পাতায় একদিকে রুশ ভাষায়, অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় নিজের হাতে গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথের নাম লিখে সকৃতজ্ঞ স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। বইটির দাম তখনকার দিনেও প্রায় একশ টাকা। সুরেন্দ্রনাথকে আমি প্রস্তাব দিলাম যেহেতু ওই বিষয়ে আমিই তাঁর একমাত্র ছাত্র হতে যাচ্ছি, সেইজন্য ওই উপহার-পাওয়া বইখানি আমরা দুজনে মিলে পড়ব। এ প্রস্তাব উনি অনুমোদন করলেন না, শুধু মন্তব্য করলেন, "এম. এ. পড়াটা চার আনার টিকিটে বায়োস্কোপ দেখা নয়।" তখনকার দিনে সিনেমাকে বায়োস্কোপ বলা হত। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরামর্শে এবং বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে আমি শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ-জৈন শাখা ছেড়ে বেদান্ত নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের বেদান্তের রামানুজভাষ্য (যাকে শ্রীভাষ্য বলা হয়) পড়াতেন। প্রথম দিনই ক্লাসে আমাকে শ্রীভাষ্য থেকে একটা বাক্যাংশ উদ্ধার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী সমাস হয়েছে?" ঠিক উত্তর দিতে পারি নি। বললেন, "কাল থেকে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নিয়ে এসো।"

অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য

যদিও সুরেন্দ্রনাথের কথা ছিল সপ্তাহে আমাদের একটা করে ক্লাস নেবেন, তবুও তিনি নিয়মিত আসতে পারতেন না। এর কারণ তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, প্রশাসনিক কাজের চাপ, নিজের বই লেখা, আন্তর্জাতিক কনফারেনসে যোগদান ইত্যাদি। তবে যেদিন পড়াতেন সেদিন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ আমাদের চোখের সামনে খুলে গেল। ও'র লেকচার শুনতে-শুনতে বুঝতে পারতাম, উনি অধ্যাপনাকে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে কখনও বেঁধে রাখেন নি ; দর্শন থেকে পদার্থবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান থেকে প্রাণিবিজ্ঞানে, প্রাণিবিজ্ঞান থেকে নন্দনতত্ত্বে ও'র স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। আমরা অনেক সময়ে যে-সকল গভীর তত্ত্ব শুনতে-শুনতে সূত্র হারিয়ে ফেলতাম। যত দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সকল শাখায় ও'র অধিকার কত ব্যাপক, দৃষ্টি কত গভীর, দুরূহ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কত প্রাঞ্জল আর সরস। ও'র পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা আর গভীরতা কালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। ও'র অধিকার সম্বন্ধে, ও'র দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যার প্রামাণ্য সম্বন্ধে উনি সচেতন ছিলেন। যখন অধ্যাপনা শুরু করেছি তখন সাহসভরে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিদ্যা তো বিনয় দেবে, এই কথা। কিন্তু লোকের প্রশ্ন, বিদ্যা আপনাকে দম্ভ দিল কেন? উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেখো, বিদেশে বিদ্যার আদর আছে ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে অধ্যাপক নিয়োগের বেলায় কর্তৃপক্ষ সত্যিকারের গুণী লোককে খুঁজে বার করে তাঁকে পদগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। আর আমার দেশে জর্জ দ্য ফিফথ প্রফেসর অব ফিলসফি-পদের জন্যও দরখাস্ত করা হয় এবং তদ্বিরের জোরে কোনো নিকৃষ্ট প্রার্থী ওই পদ পেয়ে যেতেও পারে। সেইজন্য আমি নিজের ঢাক নিজে পেটাই, নইলে লোকে আমার দান সম্বন্ধে জানবে কী করে? তবে এটা আমার দম্ভ বা অহংকার নয়। আমার সারস্বত সাধনা দেশজননীর ঋণ শোধ করার প্রচেষ্টা মাত্র। উচ্চপদের লোভ ত্যাগ করে আমি নিজেকে শুধু সারস্বত সাধনার মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে।"

একদিন আশুতোষ বিল্ডিঙের তিনতলা থেকে নীচে নামবার জন্য লিফট-এর দরজায় সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তখন নীচে নামছি। ও'র হাতে একখানা বই ছিল, এ. জে. এয়ার-এর 'ল্যাঙ্গুয়েজ, লজিক অ্যানড ট্রুথ্'। উনি বইখানা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়েছ?" আমি বললাম, হ্যাঁ। উনি ইশারা করাতে আমিও ও'র সঙ্গে লিফট-এ নামলাম। ওইটুকু সময়ের মধ্যে বললেন, "এখন তো ওদেশে লজিক্যাল পজিটিভিজম নিয়ে খুব আন্দোলন চলছে। কিন্তু এ তো বড়ো ভাসা-ভাসা লেখা। আমাদের মীমাংসা আর ন্যায়শাস্ত্রে এই বিষয়ে আরও কত গভীর তত্ত্ব আছে, তোমরা তা দেখতে পার।" প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনেই তিনি গভীর নিষ্ণাত ছিলেন বলে যখনই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোনো তত্ত্ব শুনতেন বা পড়তেন তখনই তিনি অনুরূপ প্রাচ্য দর্শনের ভাবনাচিন্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতেন। এই তুলনামূলক বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক বিচারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে জেগেছিল কেমব্রিজে গবেষণায় রত থাকার সময়ে অধ্যাপক ম্যাকট্যাগার্ট-এর প্রেরণায়। উনি ক্লাসে পড়াবার ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের প্রায়ই বলতেন, "জান, অধ্যাপক ডকটর ম্যাকট্যাগার্ট তাঁর বহু ছাত্রের মধ্যে মাত্র চারজনের সম্বন্ধে সত্যিকারের গর্ব বোধ করতেন। এই চারজন হলেন, বারট্রানড রাসেল, জি. ই. মুর, সি. ডি. ব্রড এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।"

ভিয়েনাতে মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েডের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়াতে তিনি ফ্রয়েডকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রেরা ফ্রয়েডের তত্ত্ব সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হয়েছে। ফ্রয়েড বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ভারতীয় ছাত্রেরা কি আমার তত্ত্ব বুঝবার মতো ক্ষমতা রাখে?" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ ফ্রয়েডকে বলেছিলেন, "আপনি যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন সে তো এই যে, নির্জ্ঞানই আমাদের সচেতন কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং মানুষ নির্জ্ঞানের কাছে অসহায়। কিন্তু আপনি জানবেন, হাজার হাজার বছরের সাধনার ফলে আমাদের দেশের যোগশাস্ত্র এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে মানুষ সম্যক সাধনার ফলে নির্জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" একথা শুনে ফ্রফেড মন্তব্য করেন, "এ অসম্ভব।" তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে, একজন বিজ্ঞানসেবী হিসাবে কোনো বিষয়ে পরীক্ষা না করেই তাকে 'অসম্ভব' বলা অনুচিত। আমাদের দেশের যোগীরা জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তাকে না জেনেশুনে নস্যাৎ করে দেওয়া অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয়। বেনেডেটো ক্রোচের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের আলোচনাও শিক্ষাপ্রদ। ১৯২৪ সালে নেপলস্-এ অনুষ্ঠিত ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিলসফিতে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তার শিরোনাম ছিল 'ক্রোচে এবং বৌদ্ধচিন্তা'। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং ক্রোচে। সভান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে ক্রোচে বলেছিলেন, "আমার চিন্তাভাবনা যে এমন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত মহান দর্শনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে একথা জেনে আমি পুলকিত।" অধ্যাপক তুচি এবং অধ্যাপক লুই রেনোর সঙ্গেও সুরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রেনো সুরেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আপনি যতদিন আমাদের মধ্যে আছেন, আমরা অনুভব করি যে একজন শংকরাচার্য অথবা একজন পতঞ্জলি যেন আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন।" নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে ক্রোচের মত সুরেন্দ্রনাথ সমর্থন করতেন না। কল্পনা বা প্রাথমিক অনুভূতির অবশ্যই স্থান আছে আর্টসৃষ্টির ক্ষেত্রে ; কিন্তু সেই অনুভূতিমাত্রই আর্টের প্রকাশ নয়। শিল্পী অন্তরের জগৎ এবং বাইরের জগৎ—দুটোর মধ্যেই বিচরণ করেন এবং রূপে রসে গন্ধে সেই আন্তর অনুভূতিকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই।

১৯৪৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ স্কটল্যানডে যাত্রা করেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্য। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পত্নী সুরমা দেবী। সুরমা দেবী দর্শনের জগতে মৌলিক গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি কলিকাতা আর কেমব্রিজ—উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট উপাধি পেয়েছেন ; লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপকরূপে বহুদিন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের একটি চোখ ছিল দৃষ্টিহীন ; সুরমা দেবী যখন সুরেন্দ্রনাথের কাছে গবেষণা করতেন তখন দর্শনের নানা বই ওঁকে পড়ে শোনাতেন, ও'র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিতেন, আকরগ্রন্থের নাম সংগ্রহ করে আর প্রুফ দেখে দিতেন। কেমব্রিজে দাশগুপ্ত-দম্পতি প্রায় পাঁচ বছর কাল বাস করেছেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের 'এ হিসট্রি অব ইনডিয়ান ফিলসফি'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। কেমব্রিজে যাবার এক বছরের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু দৈহিক ক্লেশ তাঁর মনকে দুর্বল করতে পারে নি ; তিনি বরাবর উৎসাহের সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন, গবেষণার কাজ চালিয়েছেন এবং পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। এসব কাজেই সুরমা দেবীর সাহায্য ছিল অপরিহার্য। আসলে সুরমা দেবী ছিলেন একাধারে সুরেন্দ্রনাথের গৃহিণী, সচিব এবং সখী।

১৯৫০ সালে দাশগুপ্ত-দম্পতি ভারতে ফিরে আসেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সকল শক্তি নিয়োগ করেন। রোগশয্যায় থেকেই তাঁর নিরলস গবেষণা চলতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে তখনকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু শিক্ষামন্ত্রকের মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। শুনেছি, এই ব্যাপারে ডকটর রাধাকৃষ্ণান পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ করিয়ে দেন। বাঙলা ভাষায় একটি আত্মজীবনী, এবং জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী, এই বিষয় নিয়ে দুখণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। এই প্রস্তাবিত গ্রন্থের মাত্র ভূমিকাটুকু তিনি লিখেছিলেন কিন্তু গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। দেশে ফিরে মাত্র দু বছর তিনি বেঁচে ছিলেন ; ১৯৫২ সালে তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাক্ষিণ্যে যে বাসস্থান পেয়েছিলেন সেখানেই পরলোক গমন করেন। সুরমা দেবী তাঁকে তাঁর আত্মজীবনী লেখার কাজ শেষ করতে বারবার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বলতেন তাঁর কাছে স্বদেশের স্থান সকলের ওপরে। তাই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লেখার কাজ তিনি আগে শেষ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তার মধ্যেই আমাদের দেশের ঐতিহ্য, সাধনা আর সংস্কৃতির কথা স্থান পাবে।

যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক

দার্শনিক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন যুক্তিবাদী এবং বস্তুনিষ্ঠ। শ্রুতির চাইতে যুক্তিকে তিনি বরাবর উচ্চ

স্থান দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় তিনি সমান পারদর্শী হলেও এই দর্শনের প্রতি তাঁর অন্ধ অনুরাগ ছিল না। তাঁর মতে, ভারতীয় দর্শনের চারিদিকে চারটি মতুয়াবোধের (ডগম্যাটিজম) দেয়াল রয়েছে ; এগুলি হল : (১) বৈদিক জ্ঞানের অভ্রান্ততা, (২) বন্ধন ও মুক্তির অপরিহার্যতা, (৩) কর্মবাদ এবং (৪) পুনর্জন্ম। প্রথম ডগমাটি সবচেয়ে মারাত্মক, কারণ এটি মানলে যুক্তিকে গৌণ স্থান দিতে হয়, অর্থাৎ এই কথাই স্বীকার করতে হয় যে, যুক্তির কোনো স্বাধীন ভূমিকা নেই, সেই যুক্তিই গ্রাহ্য যা শ্রুতিসিদ্ধান্তের অনুকূলে যায়। উপনিষদে স্বপ্রকাশ অনির্বাচ্য চরম সত্তার কথা বলা আছে। এই চরম সত্তার কথা যদি অপরকে বুঝিয়ে বলতে হয় তাহলেই ভাষার সাহায্য দরকার হয়, ভাষা প্রয়োগ করতে গেলেই সংযোগের কথা এসে পড়ে। কিন্তু এই সংযোগ, ভেদ—এসব তো মিথ্যা। কাজেই অনির্বচনীয় শুদ্ধ সৎ এবং 'বহু'র মধ্যে তার প্রকাশ—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ চারটি ডগমার বিরুদ্ধেই তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের মতে, দর্শনের লক্ষ্য হল মানবজীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার একটি সুসংবদ্ধ এবং সমন্বিত ব্যাখ্যা দেওয়া, যার মধ্যে সকল খণ্ড অনুভূতির গুরুত্ব এবং ভূমিকা স্বীকৃত হবে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতকে বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদের কাছাকাছি বলে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে একটি বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে রাধাকৃষ্ণন ও মুরহেড-সম্পাদিত 'কনটেমপোরারি ইনডিয়ান ফিলসফি' গ্রন্থে। সুরেন্দ্রনাথের মতে, বস্তুবিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্যে বিজ্ঞান যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ অবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রকল্পগ্রহণ, আরোহ এবং অবরোহ অনুমানের প্রয়োগ ইত্যাদি, দর্শনও অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ শুধু আলোচ্য বিষয়ে। দর্শন অতীন্দ্রিয়, অপরোক্ষানুভূতির জগতের বিশ্লেষণ করে থাকে, যা বিজ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনের ক্ষেত্রে কোনো অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা মানে তাকে বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্গত করে দেখানো এবং মনোজগতের অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

'রিলিজন' সম্বন্ধে ধারণা

যেমন দর্শন সম্বন্ধে তেমনি রিলিজন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা ছিল। ধর্ম কথাটি রিলিজন অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ; আসলে ইংরেজি রিলিজন কথাটির ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ না থাকায় রিলিজন কথাটিই ব্যবহার করা হল। 'রিলিজন অ্যানড র‍্যাশনাল আউটলুক' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মত বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বের দিক থেকে তিনি নানা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে এ বিষয়ে তাঁর একটা সংশয়াতীত প্রত্যয় ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর অন্তর্যামী, তাঁর হৃদয়ের রাজাধিরাজ তাঁর ভিতর দিয়ে যেমন নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন তেমনি তৃণলতাগুল্মে, পর্বতে, সমুদ্রে, বনরাজিতেও তিনি নিজেকে সমানভাবে প্রকাশ করতে ব্যস্ত। 'এক' যখন 'বহু' হতে চান, তখন তিনি তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানুষ যখন কোনো সৃজনশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করতে চায় তখনও তাকে তপস্যা করতে হয়। এই তপস্যার শেষ নেই, কারণ মানুষ সারা জীবন ধরেই আত্মপ্রকাশ করতে চায়। মানুষ যখন তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তখন নিশ্চয়ই সে আনন্দিত হয় ; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে যেটুকু লাভ করেছে তার চাইতে আরও বেশি কিছু আশা করে। একদিকে যেমন সে গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক, অপরদিকে সে কিছু দান করতেও আগ্রহী। গ্রহণ করতে না পারলে যেমন সে কষ্ট পায়, দান করতে না পারলেও তার দুঃখ হয়। মানুষের জীবনে নিরন্তর এই দেওয়া-নেওয়ার পালা চলছে। তাই সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর রিলিজন হচ্ছে এক ধরনের আধ্যাত্মিক শিল্পসৃষ্টি। নবনব রূপে আত্মপ্রকাশ করার নামই রিলিজন—কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, শিল্পসৃষ্টিতে এই আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। ভগবৎপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে মানুষকে নিত্য সামনের দিকে নিয়ে যায়, পেছনে ফেলে দেয় না। ভগবৎপ্রেম নরনারীর কামের শামিল নয় ; এই প্রেম মানুষকে জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে শক্তি জোগায়। রিলিজন-এর লক্ষ্য বিদেহমুক্তি নয়, নিশ্চল পারমার্থিক শান্তি নয়। রিলিজন-এর লক্ষ্য মানুষকে গতিশীল করা, তার জীবনকে স্থাণু, স্থিতিশীল গণ্ডী থেকে মুক্ত করা।

দার্শনিক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর সৃষ্টি যথাযোগ্য সমাদর পায় নি ; যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছেন। লরেন্স্ বিনিয়নও তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে লিখেছিলেন :

I am impressed by the richness of imagination which pervades the poems and the glow of mystic faith and fervent emotion reminding me of one of Wilhain Blake's sayings : 'exuberance is poetry'.

কাব্যসাধনা

১৯৩৮, ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে যথাক্রমে তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; তাদের নাম 'ক্ষণলেখা', 'বিজয়িনী' এবং 'চারণচারণী'। 'ক্ষণলেখা' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ক্ষণলেখা নামটি সঙ্গত হয় নি। সময়ের সীমার দ্বারা এর পরিচয় নয়। ইংরেজিতে যাকে ক্লাসিক রীতি বলে তোমার কবিতা সেই রীতির...এ বড় সভার জন্য প্রস্তুত। এর মধ্যে অনবধানতা ও অপরিপাট্য নেই।" 'ক্ষণলেখা'র বিষয়বস্তু প্রধানত প্রকৃতি—মেঘ, ঝড়, বর্ষা প্রভৃতি। 'বিজয়িনী'তে প্রধানত নারী, সংসারে তার ভূমিকা ও কান্তাপ্রেম নিয়ে কবির সৃষ্টি ; আর 'চারণী' কাব্যগ্রন্থের উপজীব্য জীবন, মৃত্যু, জগৎ, মানুষের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি। যুদ্ধের বীভৎসতার চেহারা কবি প্রকাশ করেছেন 'চারণী'র একটি কবিতায় :

পুর পল্লীর মল্লিকাননে অগ্নির শিখা বঙ্গ লহরে ফেরে,
মণিচত্বরে গহ্বর গোলা গরজি গরজি বজ্র উগারি ফেরে ;
পূর্বকালের গ্রন্থের রাশি অট্টহাসিতে অগ্নি ফেলিছে গ্রাসি',
জ্বলে দর্শন, জ্বলে বেদান্ত, জ্বলে বেদাঙ্গ, সকল শাস্ত্ররাশি ;
জ্বলিছে কাব্য কোমলকান্ত, নিমেষে নিমেষে বাড়িছে আগুন
সকল ফেলিয়া নাশি'।

শব্দচয়নে সুরেন্দ্রনাথ মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, সংস্কৃত শব্দের ঝংকার অক্ষুণ্ণ রেখে। নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন, নারীর জীবন সুখ অন্বেষণের জন্য নয়। জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য দয়িতের সঙ্গে একযোগে দুঃখকষ্ট বরণ করে অগ্রসর হতে হবে।

জীবন-মৃত্যু, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কবিতায় পত্র লেখেন। কবি এইসব সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব তা কবিতায় সুরেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

যাহা জানিবার কোন কালে তার জেনেছি যে কোন কিছু
কে বলিতে তাহা পারে ?
সকল ধরার মাঝে অধরার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।

সুরেন্দ্রনাথের মতে, রবীন্দ্রকাব্য মোটামুটি উপনিষদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে যদিও এক নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, তবুও রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনকে চরমসত্য বলে স্বীকার করেন নি ; তিনি স্থিতি এবং গতি দুটো থেকেই মুক্তি চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে চঞ্চল এবং অচঞ্চলের সমন্বয়ের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ। নদীর তরঙ্গবেগের মধ্যে, মেঘের নিরন্তর পরিবর্তনশীল বর্ণচ্ছটার মধ্যে, তাদের কেন্দ্রগত শক্তিরূপে সেই শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ বিরাজ করছেন। অর্থাৎ ধ্যানের মধ্যে যাঁকে উপলব্ধি করি সংসারের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে, প্রবল আঘাতবিক্ষোভের মধ্যেও তাঁকেই অনুভব করি। সুরেন্দ্রনাথ জীবনমৃত্যুর সমস্যা, চঞ্চল-অচঞ্চলের সমন্বয়—এসব ব্যাপার নিয়ে বিব্রত নন। তাঁর অনুরক্তি অফুরন্ত জীবনপ্রবাহের প্রতি। তাই প্রকৃতির মধ্যে যখনই তিনি 'বেগের আবেগ' অনুভব করেন তখনই তিনি তাঁর 'মনের মানুষ'কে আবিষ্কার করেন যাঁর লীলারূপে মানুষ, প্রকৃতি এবং জীবনের শাশ্বত মূল্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রশ্নগুলির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার তাৎপর্য কী, এ বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড়, এবং উভয়েই নিজেদের মধ্যে জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে ভাববিনিময় করতেন। এই সূত্রে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ রবীন্দ্রনাথকে এক সংবর্ধনায় 'কবি সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এই বিদ্যামন্দির থেকে সম্মানলাভের কল্পনা কোনোদিন আমি করি নি, এ আমার আশার অতীত। একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের বিরোধ ছিল। তখন এর দৈন্যকে

উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে।"

সুরেন্দ্রনাথের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অটুট। এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রপাতের মাঝখানেও স্থিতধী হয়ে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কোনো প্রতিকূল অবস্থাতে কখনও তিনি বিচলিত হন নি। মহাভারতের বহুশ্রুত একটি কথা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—টীকাকার মল্লিনাথকে অনুসরণ করে 'জয়' কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, নিজের চারিত্রিক উৎকর্ষের দ্বারা সব-কিছুকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকার নাম জয় করা। অন্য ভাষায় বলা যায়, সবচাইতে ওপরে থাকা, উচ্চতম সোপানে অবস্থান করার অর্থ জয় করা। উৎকর্ষ কথার অর্থ কোনো বস্তুর সার নিষ্কাষণ করে যা পাওয়া যায় তাই। যেমন দুধ থেকে ননী নিষ্কাষণ করা। জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিরোধসংঘাতের মধ্যে যা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে তার নাম ধর্ম। ধর্মই সত্য। সত্য স্বয়ম্প্রকাশ, তার স্বরূপ হল এই যে সে কখনও বাধিত হয় না, যদি কখনও বা কোনো অভিজ্ঞতা পরবর্তী কোনো অভিজ্ঞতার দ্বারা বাধিত হয়, তাহলে এই দুটিই বৃহত্তর কোনো সত্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে পড়ে। মানুষ সমাজে সংঘবদ্ধ হয়ে শান্তিতে থাকতে চায়। সেইজন্য সমাজ কিছু আইনকানুন তৈরি করেছে, যা লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়। মানুষ অবশ্য জানে যে জীবনে এমন ঘটনা ঘটে থাকে যেখানে আইন ভঙ্গ করলেও সামাজিক শান্তির অবকাশ থাকে না। সেক্ষেত্রে শান্তি প্রকৃতির কাছ থেকে আসবেই—এ বিশ্বাস মানুষের আছে। এইটাকেই বলা হয় ধর্মবোধ।

'অধ্যাত্ম' বলতে বোঝা যায় আমাদের জাগ্রত জীবনের সেই-সকল গুণ এবং কর্ম, যা আমাদের আন্তর জীবনের দিকে আকৃষ্ট করে। এইখানেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। নানা রকমের কামনা, বাসনা, সংস্কারের দ্বারা আমাদের জীবন মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। অপ্রমাদের (অমনোযোগের অভাব) সাহায্যে নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোন্ কোন্ সংস্কার এবং আকর্ষণের জন্য আমাদের আত্মিক জীবনের স্ফুরণ হচ্ছে না। আমরা তখন বুঝতে পারব আমার সামগ্রিক সত্তার কতটুকু আমার নিজস্ব, আমার স্বরূপ, আর কতখানি বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে আমার জীবনে প্রবেশ করেছে। জ্ঞান এবং প্রেমের মধ্যে দিয়ে এই আধ্যাত্মিক জগৎকে আবিষ্কার করা যায়। নিরাসক্ত জ্ঞানতপস্বীর সাধনার পথে বাধা অনেক; সেই বাধাগুলিকে দূর করবার জন্য নিরন্তর তপস্যা করতে হয়; বহিঃপ্রকৃতি থেকে নানা প্রলোভন আসে, তাকে জয় করতে হয়। তবেই আধ্যাত্মিক জগৎ তার সকল ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রেমের চাবিকাঠি দিয়ে এই জগতের দরজা খুলতে হয়, বুদ্ধি দিয়ে এর নাগাল পাওয়া যায় না। বুদ্ধি বা তর্ক আমাদের জ্ঞানরাজ্যের এক সীমিত অংশ মাত্র। যখন আমার সমগ্র সত্তা পরিপূর্ণরূপে জেগে ওঠে, তখন আমরা অসীমের আভাস পাই। সমগ্র সত্তা শুধু প্রেমের মাধ্যমেই জাগে। এই প্রেমের পথে দুঃখ আছে, বেদনা আর বিচ্ছেদ আছে সত্য; তবুও এই পথ দিয়ে যাত্রা করেই আমরা প্রেমসঞ্জাত আনন্দের আস্বাদ পাই। পরমাত্মা এই ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন তাঁর বধূরূপে; এই দুই সত্তা যখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় তখনই প্রেমের সার্থকতা।

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য যে সকল গ্রন্থ, পত্রিকা, রিপোর্ট প্রভৃতি থেকে সাহায্য নিয়েছি তাদের নাম এইরূপ:

Surama Dasgupta, An Ever-expanding Quest of Life and Knowledge, Orient Longman, 1971

Radhakrishnan and Muirhead (Ed.) Contemporary Indian Philosophy, George Allen and Unwin, London, 1936

Presidency College Centenary Volume, Calcutta, 1955

ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, কলিকাতা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থাবলী

বাঙলা

১। তত্ত্বকথা
২। দার্শনিকী, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা
৩। কাব্যবিচার, ঐ
৪। সৌন্দর্য-তত্ত্ব, ঐ
৫। সাহিত্য পরিচয়, ঐ
৬। রবি-দীপিতা, ঐ
৭। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ঐ
৮। অধ্যাপক ; ৯। ক্ষণলেখা ; ১০। বিজয়িনী ; ১১। চারণ ; ১২। চারণী

ইংরেজি

1. A History of Indian Philosophy, in 5 Volumes Cambridge University Press
2. A Study of Patanjali, University of Calcutta 1920
3, Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian Thought, University of Calcutta, 1930
4. Yoga as Philosophy and Religion, Kegan Paul, 1924
5. Hindu Mysticism, Open Court, 1927
6. Indian Idealism, Cambridge University Press, 1933
7. Philosophical Eaaays, University of Calcutta, 1941

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

সতেরো

ভূরিভোজনের পর বিদায় নেবার পালা। মোহিনীবাবু বলেন, "ত্রেতাযুগে দ্রৌপদী এর চেয়ে এমন কী ভালো রাঁধতেন হে, বাসুদেব?"

"কথাটা ঠিক। তবে ত্রেতাযুগে নয়, দ্বাপরযুগে।" রায়বাহাদুর হাসেন।

"কিন্তু কোফতা আর কালিয়া কি দ্বাপরযুগেও ছিল?" শরীফ সাহেব তর্ক করেন। "আমি ভাবছি চৌধুরানীজী কার কাছে এ বিদ্যা শিখলেন।"

"কেন? আমাদের বাড়ির বাবুর্চির কাছে। মানে বাপের বাড়ির। পিণ্ডিতে যখন ছিলুম তখন থেকেই আবু তালিব আমাদের সঙ্গে আছে। বছর তেইশ-চব্বিশ।" জুলির যতদূর মনে পড়ে।

"সে কী, আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন?" শরীফের তাক লাগে।

"এখনো তো দেশভাগ হয় নি। হবে না আশা করি। কিন্তু যদি হয় তবে আবুকে বিদেশী বলে তার বুড়ো বয়সে জবাব দিতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে।" জুলি বলে।

"কেন? বিদেশী বলে কেন?" শরীফ চমকে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তানের শামিল হবে? যদি দেশভাগ হয়।

"কিন্তু আমরা যে কলকাতার মানুষ। কলকাতা কি পূর্ব পাকিস্তানের সামিল হবে? যদি দেশভাগ হয়। হবে না আশা করি।" জুলির ধারণা।

"কলকাতা বাদ দিয়ে কি পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবা যায়? আপনারা ঠাওরেছেন পূর্ব পাকিস্তান মানে পূর্ব বঙ্গ। ভুল! ভুল! বিলকুল ভুল! গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে দিল্লী ছেড়ে দিচ্ছি, আগ্রা ছেড়ে দিচ্ছি। তার উপর কলকাতাও ছাড়ব! এ তো ভারি মজার কথা।" শরীফ সাহেব বিদ্রূপ করেন।

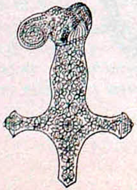

ডাক্তার নিয়োগী আর সইতে পারেন না। বলেন "সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অভিযান মনে পড়ে? কলকাতার গোরাদের তিনি মানুষ বলে গণ্য করেন নি। পরিণাম পলাশীতে পরাজয় আর পতন। এবার কলকাতার হিন্দুদের মানুষ বলে গণ্য করা হবে না, যেন তাদের সম্মতি-অসম্মতির কোনো দাম নেই। মুসলিম লীগ চাইবে, ব্রিটিশ সরকার দেবেন। ব্যস্! অমনি কলকাতার হিন্দুরা ক্রীতদাসের মতো হস্তান্তরিত হবে!"

ক্যাপটেন মুস্তাফী উভয় পক্ষকে থামিয়ে দেন। "আর কটা দিন সবুর করুন। শোনা যাক ক্যাবিনেট মিশন কী নিষ্পত্তি করেন। তাঁরা এক-এক করে গান্ধী, জিন্না, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি বড়ো বড়ো নেতাদের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করছেন। নিজেদের মন খোলা রেখেছেন। গান্ধীজী নাকি দেশভাগে রাজি, জিন্না সাহেব যদি দুই রাষ্ট্রের এক ডিফেন্স, এক ফরেন অ্যাফেয়ার্স, এক রেল পোস্ট আফিসে রাজি হন কলকাতা তা হলে পূর্ব পাকিস্তানেই যাবে। কিন্তু কলকাতার লোক ইনডিয়ান পাশপোর্টেই সর্বত্র যেতে আসতে পারবে। আমরা যারা এখানে বাস করব তাদেরও সেই একই পাশপোর্ট।"

শরীফ সন্তুষ্ট হন না। "গান্ধীজী এক হাতে যা দেবেন আরেক হাতে তা ফিরিয়ে নেবেন। ঝানু পলিটিসিয়ান। কিন্তু জিন্না সাহেব কি ভুলবেন! ভবী ভোলে না। বিকেন্দ্রীকরণ নয়, দ্বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর লক্ষ্য। কেউ তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবেন না। ক্যাবিনেট মিশনও না। তাঁর পেছনে ন কোটি মুসলমান। সবাই লড়াকু। তবে গৃহযুদ্ধ এড়ানোই সুবুদ্ধি। তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করতে হবে উভয়কেই।"

মিলির মা-বাবাকে, জুলি আর সৌম্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিরা একে-একে বিদায় নেন। তখন চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে মিসেস মুস্তাফী বলেন, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।"

"কেন ওকথা মনে হল, মাসিমা?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"ও'দের ওইসব কথাবার্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে কলকাতা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। মিলি থাকলে ওই আগুনে ঝাঁপ দিত। ভাগ্যিস সে এখন নিরাপদ দূরত্বে। তার সঙ্গে রণও। ওদের আচমকা দেশ ছেড়ে যাওয়ায় শক পেয়েছিলুম। জুলি এসে পড়ায় সামলে নিই। এখন দেখছি ওদের চলে যাওয়াই শাপে বর হয়েছে। বেঁচে থাকলে আবার কতবার দেখা হবে। মিলির যা স্বভাব। আগুন দেখলে ও ঝাঁপ দেবেই।"

"সেটা তো আমারও স্বভাব, মাসিমা। কলকাতা জ্বলছে শুনলে আমি কি এখানে বসে বেহালা বাজাব নাকি? আমার মা রয়েছেন ওখানে। তা ছাড়া আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে জনতা। হিন্দুদের মুসলমানদের হাত থেকে, মুসলমানদের হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চার বছর আগে ওরা সবাই আমাকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নইলে আমার তো কোর্ট মারশাল হত, মাসিমা।" জুলি মনে করিয়ে দেয়।

"তোমাকে আমরা কলকাতা যেতে দেব না, জুলি। সৌম্যকেও না। সেটা শুধু তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে নয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্যেও। কলকাতার আগুনের ফুলকি এখানেও তো উড়ে আসতে পারে। নুরুদ্দীনের দলবল কি আমাদের রেহাই দেবে? জ্বরের যম জারমলীন, হিন্দুর যম নুরুদ্দীন। গায়ে কাঁটা দেয়। কেন যে তোমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে চাও বুঝতে পারি নে। ওরা তো ঘরের ঢেঁকি কুমির নয়, যেমন এরা।" মিলির মা অকপটে বলে যান।

"আমরা তো মনে-মনে ঠিক করে রেখেছি যে এদিকে পাকিস্তান হলে ওদিকে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেব।" মুস্তাফী প্রকাশ করেন। "কিন্তু কলকাতা নিয়ে যদি লড়াই বাধে তবে যেখানে আছি সেখানে থাকাই ভালো। এখানে আমার অসংখ্য পেশেনট। অধিকাংশই মুসলমান। ওরা যদি বাঁচতে চায় তো ওদের ডাক্তার পরিবারকেও বাঁচাবে। আর তোমরাও তো আশ্রমের মাধ্যমে জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু লোককে জীবিকা জোগাচ্ছ। ওরা বাঁচবে কী করে তোমরাই যদি না বাঁচ? যাকে বাঁচাও সে বাঁচায়।" মুস্তাফী বিশ্বাস করেন।

সৌম্য সে কথা সমর্থন করে। "আমি কাসাবিয়াঙ্কার মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকব। সেটাই আমার পিতার আদেশ। মরতে হয় মরব। আমাদের উদ্দেশ্য অপর পক্ষের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো। ইংরেজদের বেলা সেটা অনেক দূর সফল হয়েছে। কিন্তু লীগপন্থী মুসলমানদের বেলা আদৌ সফল হয় নি। কেমন করে হবে, কত দিনে হবে, এই এখন আমাদের ভাবনা। মূলনীতি বিসর্জন না দিয়ে এটা যদি সম্ভব হয় তো গান্ধীজী বাঁচবেন। নয়তো তাঁর জীবনসংশয়। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনা। জুলির জন্যে আমি চিন্তা করি নে। সে দ্রৌপদীর মতো রন্ধনের পরীক্ষায় পাস করেছে। দ্রৌপদীর মতোই বীরত্বের পরীক্ষায়ও পাস করবে।"

"তোমাকে একলা রেখে আমি কোথাও যেতে পারব

না। তুমি যেখানে আমি সেখানে।" জুলি বলে দৃঢ়স্বরে।

মুস্তাফীরা তা শুনে আশ্বস্ত হন। মিলির মা বলেন, "আমার মেয়ে নও বলে কি তুমি আমার মেয়ের চেয়ে কম আপন? তোমাকে কি আমি বিপদের মুখে কলকাতায় ঠেলে দিতে পারি?"

মিলির বাবা বলেন, "আমার মনে হয় না ব্যাপার ততদূর গড়াবে। গড়ালে ইংরেজরাই এদেশে অনির্দিষ্টকাল আটকা পড়বে। মর্টিমার সাহেব আমাকে বলে গেছেন সামনের জানুয়ারি মাসেই তিনি ইনডিয়া কুইট করবেন। তবে যদি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পান আরো এক বছর দেরি করতে পারেন। একই মনোভাব আরো অনেক সাহেবেরই। এ দেশ থেকে ওঁদের মন উঠে গেছে। দেশে ফিরে গেলে অন্য কোনো চাকরির আশা আছে। কিন্তু বেশি দেরি করলে ততদিন চাকরি খালি থাকবে না। ক্যাবিনেট মিশন এটা বোঝেন। তাই একটা মিটমাটের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। দ্যাখো, সৌম্য, তোমরা স্বীকার কর আর না কর, মুসলিম লীগেরও একটা বেস আছে। বিলেতের গভর্নমেন্টে এক পার্টি যায়, আরেক পার্টি আসে। কনসারভেটিভের পর লিবারল, লিবারলের পর কনসারভেটিভ। ইদানীং লিবারলের জায়গায় লেবার। এর নাম রোটেশন। আমাদের দেশে কি রোটেশনের জো আছে? কংগ্রেসের পর মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের পর কংগ্রেস—এরকম পালাবদল কি সম্ভব? দিল্লীতে মুসলিম লীগ কোনো কালেই মেজরিটি পাবে না। তা হলে কি সে কোনোদিনই ক্ষমতার মুখ দেখবে না? তার জন্যে কি তাকে কংগ্রেসের অনুগ্রহে কংগ্রেসের জুনিয়র পার্টনার হতে হবে? জিন্না সাহেব কারো অনুগ্রহ চান না। না কংগ্রেসের, না ইংরেজের। সেইজন্যে তিনি একটা তৃতীয় বিকল্প বার করেছেন। মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান। পাকিস্তান হলে সেখানে কংগ্রেসই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী হবে। তাঁর জুনিয়র পার্টনার হতে পারবেন কংগ্রেস মন্ত্রীরা। যেমন এই বাঙলাদেশে। কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া একদিন না একদিন হবেই। কোথাও কংগ্রেস সিনিয়র আর লীগ জুনিয়র পার্টনার। কোথাও লীগ সিনিয়র আর কংগ্রেস জুনিয়র পার্টনার। বলা বাহুল্য, এর জন্যে চাই দুই পার্টির মধ্যে চুক্তি। আর সেই চুক্তি পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর রিনিউ করা চাই। কিন্তু তার গ্যারানটি কে দেবে? নতুন শাসনতন্ত্র কি গ্যারানটি দিতে পারে! নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করার অপূর্ব সুযোগ এসেছে আমাদের জীবনে। আমরা যেন এর সদ্ব্যবহার করতে পারি।"

সৌম্যকে স্বীকার করতে হয় যে ইংলন্ডের মতো রোটেশন ভারতে চলবে না। কোয়ালিশনই শ্রেয়। কিন্তু সমমনস্ক পার্টি না হলে কোয়ালিশন মানে নিত্য দ্বৈরথ। তা হলে কি তৃতীয় বিকল্প বলতে পার্টিশন? দুই আর্মি, দুই ফরেন অ্যাফেয়ার্স, দুই রেলওয়ে সীস্টেম? এক রাষ্ট্রের নাগরিক অপর রাষ্ট্রে এলিয়েন? পাকিস্তানে গান্ধী, হিন্দুস্থানে জিন্না? ইনডিয়ান নেশন দু ভাগ? ভারতীয় মুসলিম সমাজ দু ভাগ? কোনো স্তরেই ঐক্য থাকবে না? পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু-চির? মোগল সম্রাট বা ব্রিটিশ বড়লাট কেউ এমন বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারেন নি। জিন্নাকে বড়লাট করলে যদি তাঁর অন্তঃপরিবর্তন ঘটত!

"আমাদের গণসংযোগ প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানই পাউরুটি আর মাছ ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এর প্রতিকার ইংরেজের গদিত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে কংগ্রেসেরও গদিত্যাগ। অন্যান্য দল মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলেমিশে রাজত্ব করুক। কিন্তু পার্টিশন কদাচ নয়।" সৌম্য এই বলে শুভরাত্রি জানায়।

সৌম্যর 'সর্বোদয় আশ্রম' ধর্মীয় আশ্রম নয়। তার বাইরের ফটকে উৎকীর্ণ : "শুনহ, মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ফটকের একপাশে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা : "এখানে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ হরিজন, উচ্চ নীচ, নরনারী ভেদ নাই। সকলেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব।" আর একপাশে : "শ্রমই এই আশ্রমের প্রাণ। শ্রমই জপ তপ উপাসনা ও আরাধনা।"

আশ্রমের কাজকর্ম সকাল ছটায় শুরু, সন্ধ্যা ছটায় শেষ। সে সময় সকলেই যে যার বাড়ি ফিরে যায়, থাকে কেবল চৌকিদার, মালি আর জনাকয়েক আবাসিক কর্মী, যাদের আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাদের আহারাদির ব্যবস্থা তারাই করে। কিন্তু দুপুরবেলা সকলেই আশ্রমের লঙ্গরখানার অতিথি। সেখানে নিখরচায় ডাল, ভাত আর একটা কি দুটো পদ খেতে দেওয়া হয়। পরিবেশন করে ব্রাহ্মণ হরিজন, হিন্দু মুসলমান, নর নারী, যখন যাদের নাম লটারিতে ওঠে। আর রান্না করে যারা রন্ধননিপুণ। তাদের জাত বা ধর্ম দেখে নয়, গুণ আর কর্ম দেখে বাছাই করে আশ্রম কমিটি। তারাও পালা করে রাঁধে। অন্য সময় করে যার যার নিজের কাজ। কামারের কাজ, কুমোরের কাজ, ছুতোরের কাজ, তিলির কাজ, তাঁতির কাজ, কাটুনির কাজ। এমনি হরেক রকমের কাজ। ময়লা সাফাইয়ের কাজ নিয়মিত করতে হয় কর্মীদের সবাইকেই। বাসনমাজা, কাপড়কাচা যার যার নিজের।

সকলে একসঙ্গে বসে খায়। কিন্তু মেয়েদের আলাদা পঙ্‌ক্তি। রাত্রে মেয়েদের থাকতে দেওয়া হয় না। তবে যারা স্ত্রী নিয়ে থাকতে চায় তাদের জন্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র কুটির আছে। তার জন্যে ভাড়া দিতে হয়। সেটা আসে উপার্জন থেকে। উৎপাদন অনুসারে উপার্জনের হিসাব হয়। উপার্জনে তারতম্য থাকে। আশ্রম কাউকে মজুরি দেয় না। নিজের খরচে খেলে আমিষ খেতে নিষেধ নেই। কিন্তু আশ্রমের খরচে খেলে নিরামিষই বিধি। নইলে খরচ বাড়ে। আশ্রমের সাধ্যের বাইরে। এই আশ্রম একটা ট্রাস্ট। সৌম্যও ট্রাস্টীদের একজন। তার পৈতৃক সম্পত্তির কতক অংশ ট্রাস্টের তহবিলে খয়রাত করেছে। বাকি দুজন ট্রাস্টী গুজরাতি। তাঁরা সৌম্যর উপরে আস্থাবান। তাকে পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়।

রোজ আশ্রমে গিয়ে তার প্রথম কাজ ঝাড়ু আর বালতি হাতে সাফাইয়ের অভিযানে যোগ দেওয়া। এটাই আশ্রমিকদের সমবেত প্রার্থনা। শরীরকে শুচি রাখা যেমন প্রাথমিক কর্তব্য, পরিবেশকে পরিষ্কার রাখাও তেমনি প্রাথমিক কর্তব্য। অপরিষ্কার পরিবেশ থেকে কতরকম ব্যাধির উৎপত্তি। সভ্য জাতি বলে যাদের পরিচয় তারা পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। আমরা কি সভ্য জাতি? তা যদি হয়ে থাকি তবে আমাদের পরিবেশকেও নিজের শরীরের মতো সাফসুতরো রাখা চাই। দুঃখের বিষয় যত জন নিখরচায় আশ্রমের ভাত খায় তত জন নিখরচায় আশ্রম সাফ করতে এগিয়ে আসে না। সৌম্য ধৈর্য ধরে সহ্য করে যায়। এর পেছনে বহু শতাব্দীর উচ্চনীচ মনোভাব আছে। আমরা উচ্চবর্ণ, আমরা নীচবর্ণের মতো ধাঙড়ের কাজ করব? তা হলে করবেটা কে? যারা চিরকাল করেছে তারাই চিরকাল করবে। পূর্বজন্মের কর্মফল। কত বড়ো-বড়ো মহাপুরুষ এলেন আর গেলেন, কেউ কি এ প্রথা বদলে দিতে পারলেন? মহাত্মা গান্ধী পারবেন? পাগলামি। সৌম্য একটু-একটু করে সাড়া পায়। জুলি ঝাড়ুদারনির মতো গাছকোমর বেঁধে সাথী হয়।

এখানকার কর্মীরা সবাই সবাইকে সাথী বলে। যেমন কমিউনিস্টরা পরস্পরকে বলে কমরেড। এটা ছোটোখাটো একটা সমাজ। অথচ ধর্মীয় সমাজ নয়। তা বলে ধর্মহীনও নয়। যে যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে প্রেরণা এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা পুরাতন তাঁত চরকা ঘানি ইত্যাদি অবলম্বন করলেও নতুন এক আদর্শের প্রেরণা। সারা দিন তারা অক্লান্তভাবে কাজ করে।

"আমরা যদি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারি তা হলে বিশ্ব জয় করতে চাই নে। বিশ্ব জয় করে কী লাভ হবে, যদি নিজের আত্মাকেই হারাই? ইউরোপ আমেরিকা আর জাপানের দিকে চেয়ে দ্যাখো। মিলিটারি ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স তাদের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করছে। যার পরিণতি জারমানদের গ্যাস চেমবারে ইহুদীদের গণহত্যা আর মার্কিনদের পারমাণবিক বোমায় জাপানিদের গণবিনাশ। এ ছাড়া আর কোনো পরিণতি হতে পারত না আর পারবে না। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে দ্যাখো। সেখানেও মিলিটারি ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স। তফাতটা এই যে প্রাইভেট ক্যাপিটালিজমের স্থান নিয়েছে স্টেট ক্যাপিটালিজম। শ্রমিকদের আর কৃষকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটিয়ে নিয়ে এবং নাগরিকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈনিক বানিয়ে ওরা ভাবছে ওরা একটা নতুন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করছে। একদিন উপলব্ধি করবে ওটা একটা নতুন শৃঙ্খল। যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর কোনো পক্ষ আদৌ কেউ জীবিত থাকে। আমরা মনুষ্যত্বের বিনাশের উপর নয়—বিকাশের উপরেই জোর দিই। চরকা চিরকাল চরকা থাকবে না, তারও বিবর্তন হবে। কিন্তু সে থাকবে কাটুনির আয়ত্তে। কাটুনি তার আয়ত্তে নয়। মানুষের জন্যেই যন্ত্র, যন্ত্রের জন্যে মানুষ নয়। যন্ত্রকে দিয়ে মানুষের পরিশ্রম কমাতে গিয়ে মানুষকেই ছাঁটাই করছে, আর সেই ছাঁটাই মানুষগুলিকে যুদ্ধের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়ে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভারতেও তাই হবে কংগ্রেস নেতারা যদি

গান্ধীজীর পন্থা থেকে বিচ্যুত হন। যদি মিলিটারি ইনডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে সত্য আর অহিংসা ততই দূরতর হচ্ছে।" সৌম্য তার প্রিয় সাথীকে শোনায়।

জুলি বিনাবাক্যে মেনে নেয়। কখনো ঝাড়ুদারনি হয়ে ঝাড়ু দেয়, কখনো ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয়, কখনো তাঁতঘরে গিয়ে ব্লাউসের কাপড় বুনতে বসে, কখনো কাটুনিদের সঙ্গে বসে তার জন্যে সুতো কাটে। বাগানে গিয়ে মাটি কোপায় কখনো। সারাদিন খেটেখেটে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে যখন তখন তার শরীরময় ক্লান্তি আর ব্যথা। আহারের পর সকাল-সকাল বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ঘুমের ঘোরে সৌম্যকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে। পাছে সে উঠে পালিয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে সে কখন থেকে জেগে আছে। সাথীকে জাগিয়ে না দিয়ে অপেক্ষা করছে।

মনে-মনে সে তার বান্ধবী বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেয়। তাদের বিপ্লবের আগে আমাদের বিপ্লব হবে, আমরাই জনগণের হৃদয় জয় করব। একবার ওদের হৃদয় জয় করতে পারলে ওদের যা করতে বলব তাই করবে। না, আর ভাঙচুর নয়। খুনখারাপি তো নয়ই। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করবে, আর বাইরে থেকে আক্রমণ এলে আত্মরক্ষা করবে। ভাতকাপড়ের জন্যে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। মোটা চাল মোটা কাপড় নিজেরাই উৎপন্ন করবে। নুনটাই যা দুর্লভ। সেটাও লোনা জমিতে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতই হবে সত্যিকার সোভিয়েট।

জুলি যে সর্বতোভাবে সৌম্যর সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করছে এটা লক্ষ করে সে আনন্দিত হয়। কিন্তু একই কালে বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেবার কথাও ভাবছে। এর জন্যে সে দুঃখিত। জুলিকে বলে, "বাবলী-দের দলেও ত্যাগী পুরুষ আর নারী আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু উপায় মহৎ নয়। আমরা যদি আমা-দের উপায়ে দৃঢ় থাকি তা হলে একদিন জনগণ তুলনা করে দেখবে কোন্‌টা শ্রেয় আর কোন্‌টা প্রেয়। আপাতত আমাদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট দোনোমনো। সত্যি-কার গান্ধীপন্থীর সংখ্যা এখন আঙুলে গোনা যায়। পঁচিশ বছর আগে আরো অনেক বেশি ছিল। এইভাবে যদি চলতে থাকে পঁচিশ বছর বাদে একটি কি দুটিতে ঠেকবে। বাপু বলেন, একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। হ্যাঁ, একজন সত্যাগ্রহীই প্রতিরোধের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু দেশের পুনর্গঠন বা সমাজের পুনর্বিন্যাসের জন্যে যথেষ্ট নয়। বাবলীদের সে সমস্যা নেই। তারা সবাই একমত যে জমিদার, মহাজন আর পুঁজিপতিদের খতম করে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে, আর রাষ্ট্রকে পার্টির হাতের মুঠোর মধ্যে আনলে আর পার্টিকে একজন প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরের আজ্ঞাবহ করলেই প্রগতির পরাকাষ্ঠা হবে! ইতিহাস রুশদেশে ওদের একটা সুযোগ দিয়েছে। তার থেকে ওদের ধারণা হয়েছে সব দেশে দেবে। আমাদের এদেশে দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃথা। শুধু নিজের লক্ষ্যে আর নিজস্ব উপায়ে স্থির থাকতে হবে। তোমার আমার যদি সেই পরিমাণ বিশ্বাসের জোর না থাকে তবে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব না। ইতিহাস আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তবে বাপুকে পেছনে ফেলার সাধ্য কারো নেই। তিনি দুশো বছর এগিয়ে রয়েছেন। নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া মানবসভ্যতা বাঁচতেই পারে না, আর সে নেতৃত্ব তিনি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেলেও নৈতিক নেতৃত্ব বজায় থাকবে। ধ্রুবতারার মতো তিনি পথ দেখাতে থাকবেন। ইংরেজরা বলে, স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস। তুমি যদি বাবলীর সঙ্গে দৌড়ে জিততে চাও তবে তোমাকে ধীর স্থির আর তন্নিষ্ঠ হতে হবে।"

"তোমার কি মনে হয় বাপুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে? কংগ্রেস কি তাঁর নেতৃত্ব মানবে না?" জুলি জানতে চায়।

"কংগ্রেস নেতারা যদি একবাক্যে বলতেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেনটের সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে একমাত্র গান্ধীজীই কথাবার্তা চালাবেন এবং তাঁর যা সিদ্ধান্ত কংগ্রেসেরও সেই সিদ্ধান্ত, তা হলে তিনি সরে দাঁড়াতেন না। কিন্তু নেতাদের মধ্যেই এখন একটা অধীরভাব দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে যে-কোনো দাম দিতে প্রস্তুত। ওদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও দিল্লীকা লাড্ডু খাবার জন্যে সাদরে ডাকছেন। যে খাবে সেও পশতাবে, যে খাবে না সেও পশতাবে। কংগ্রেসের ভিতরে একটা খাই-খাই ভাব আর ইংরেজের ভিতরে একটা যাই-যাই ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ওরা আর থাকতে চায় না। কিন্তু ওদের শর্ত কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে। ভাগ করে খেতে গেলে ঝগড়া বাধবেই। সে ঝগড়া কতদূর গড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য গম্ভীর মুখে বলে।

"না, না। তা কিছুতেই না।" জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। "কাজ নেই অমন লাড্ডুতে। বিনা শর্তে দিলে খাব, নয়তো খাব না। এই হবে কংগ্রেসের জবাব।"

"বিনা শর্তে দিলেও খাওয়া মুশকিল হবে। মুসলিম লীগ এমন গন্ডগোল বাধাবে যে গিলতে পারা যাবে না, উগরে ফেলতে হবে। পদত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে ওরা মুসলিম লীগকেই দিল্লীকা লাড্ডু দিক। ওরাই গ্রাস করুক। শিখদের সঙ্গে যখন বেধে যাবে তখন টের পাবে কেমন মজা। তখন হয়তো কংগ্রেসের দিকে মিটমাটের জন্যে হাত বাড়াবে। মিটমাট হলে পার্টিশনের ভিত্তিতে নয়, হবে বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে।" সৌম্যর মতে।

"যদি বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে না হয় তা হলে?" জুলি প্রশ্ন করে।

"তা হলে মিটমাট হবেই না। শহীদ হবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। বাপুকেও। তিনি তৈরি।" সৌম্য ঠিক জানে।

জুলি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলে, "তা হলে আমরা কেন ঘর বাঁধতে যাচ্ছি? কুটির নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিই।"

"না, বন্ধ করে দেব না। সবচেয়ে খারাপটা ধরে নেব কেন? সেটা না ঘটতেও পারে। ইংরেজদের মতো লীগ-পন্থী মুসলমানদেরও অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। বিকেন্দ্রীকরণে ওদেরও তো কিছু লাভ হবে। নিতান্ত ফ্যানাটিক না হলে তাতেই তারা রাজি হবে।" সৌম্যর মনে হয়।

"নিতান্ত ফ্যানাটিক যদি হয়?" জুলি জেরা করে।

"তা হলে দুরাশা।" সৌম্য হাল ছেড়ে দেয়।

"তা বলে তোমাকে আমি অনর্থক শহীদ হতে দেব না। বাপুকেও বারণ করব। আমরা বাঁচব আর বাঁচাব।" জুলি ভেবেচিন্তে বলে।

জুলিদের গৃহপ্রবেশের আগের দিন মুস্তাফীরা একটা পার্টি দেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন

মানসের বন্ধু ও সেই সূত্রে সৌম্যরও আলাপী সত্যভূষণ সমাদ্দার। মর্টিমারের জায়গায় নতুন জেলা জজ। মিসেস সমাদ্দারও ছিলেন।

মুস্তাফী বলেন, "এরা দুটিতে ঘরকন্না পাতছে বটে, কিন্তু কে জানে ক দিনের জন্যে! হঠাৎ একদিন সত্যা-গ্রহের ডাক আসবে, অমনি এরা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।"

সমাদ্দার তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বলেন, "সত্যাগ্রহটা হবে কার বিরুদ্ধে? ইংরেজরা তো ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে চলে যাবার তালে আছে। যারা আপনি চলে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কেনই বা দরকার হবে? এক যদি কংগ্রেসের দাবি হয় ক্ষমতার হস্তান্তরকালে তাকেই একমাত্র উত্তরাধিকার করা। তেমন দাবি ইংরেজ মানবে কেন? মানলে যে মুসলিম লীগকে শত্রু করা হবে। তাতে ইংরেজের কী লাভ? কংগ্রেস কি তার বিপদের দিন পাশে দাঁড়াবে? পুরাতন শত্রুকে উত্তরাধিকারী করে পুরাতন মিত্রকে শত্রু করা কি সম্ভব? ওটা ইংরেজ চরিত্র নয়। ইংরেজ তেমন কাজ করতে গেলে মুসলিম লীগ জেহাদ ঘোষণা করবে। আর সেই জেহাদের লক্ষ্য কেবল ইংরেজ নয়, কংগ্রেসও হবে। মুসলিম লীগ ধর্মের নামে মাঠে নামলে যা হবে তা আর-একটা কুরুক্ষেত্র। গান্ধীজী কি এটা বোঝেন না।"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "কংগ্রেস বলবে মুসলিম লীগকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী করতে। তার জন্যে সত্যাগ্রহ করতে হবে কেন? পদত্যাগ করলেই চলবে। পদত্যাগের পর গঠনের কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেই হল।"

"বামপন্থীরা সে নির্দেশ মানলে তো?" সমাদ্দার সন্দেহ করেন।

সৌম্য মৌন থাকে। মুস্তাফী বলেন, "বামপন্থীরা দূরে থাক, দক্ষিণপন্থীরাও কি মানবে? সাড়ে ছ বছর ধরে যারা অভুক্ত রয়েছে তারা এখন খেতে বসেছে, লাট-সাহেবরাও তাঁদের জামাই-আদরে খাওয়াচ্ছেন। এবার তো যুদ্ধের অজুহাতে উপবাস করা যায় না, যুদ্ধ আবার কবে বাধবে তারও ঠিকঠিকানা নেই। এখন যদি অকারণে বা তুচ্ছ কারণে উপবাস করেন তবে ভবিষ্যতে যখন সত্যি-সত্যি বিশ্বযুদ্ধ বাধবে তখন করবেন কী? বামপন্থীরা যদি অবুঝ হয় তবে তারাই দেশশাসনের দায়িত্ব নিক।

মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া কেন? ক্ষমতা বলতে দেশভাগ করার ক্ষমতাও তো বোঝায়। ক্ষমতার আসনে বসে যদি ওরা ওদের ইচ্ছামতো দেশভাগ করে তবে তো সারা বাঙলাদেশ ওদেরি হবে। মায় আসামও। এবার ইংরেজরা সত্যি-সত্যি কুইট করছে। এবার প্রত্যাশা করতে পারা যাবে না যে তারাই কংগ্রেসের শূন্য গদি আগলাবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না। এবারকার ইস্যু ইংরেজদের শূন্য স্থান পূরণ করবে একমাত্র কংগ্রেস, না যুগ্মভাবে কংগ্রেস আর লীগ, না বিভক্তভাবে কংগ্রেস আর লীগ। ইংরেজও থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না, মুসলিম লীগ যা খুশি তা করবে, আর কোথাও না করুক বাঙলাদেশে তো করবেই। তাকে সংযত করবে কে? কী উপায়ে? সত্যাগ্রহ কি সেই উপায়?"

সৌম্য নিরুত্তর থাকে। জুলি বলে ওঠে, "সত্যাগ্রহ বিফল হলে গৃহযুদ্ধ।"

"ছেলেমানুষি! মিলিও সেই কথা বলে। গৃহযুদ্ধ যদি সৈনিকে সৈনিকে হয় তা হলে হয়তো আমরা বেঁচে-বর্তে থাকব, কিন্তু যদি জনতায় জনতায় হয় তবে সপরিবারে পরলোক যাত্রা করতে হবে। যাদের পরলোকে যেতে আপত্তি তারা পর প্রদেশে যাত্রা করবে। যঃ পলায়তি স জীবতি।" মুস্তাফী বলেন।

সমাদ্দার আবার খেই হাতে নেন। "উপরের শ্রেণীর মুসলমানরা প্রায় দু শো বছর ধরে অভুক্ত। একবার রক্তের স্বাদ পেলে তাঁরা পঞ্চাশ বছরের আগে গদি থেকে নামবেন না। ছলে বলে কৌশলে গদি আঁকড়ে থাকবেন। তাঁদের কাছে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। সত্যাগ্রহ বা গৃহযুদ্ধ কোনোটাই তাঁদের নড়াতে পারবে না। নীচের শ্রেণীর মুসলমানরা যতদিন না সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক চেতনায় উপনীত হয় ততদিন তাদের টলাবে কে? বৃথা অপেক্ষা। আপাতত আমাদের কর্তব্য ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝা-পড়া হলে ইংরেজরাই মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে দেবে। কতকটা নিজেদের স্বার্থে, কতকটা ভারতের স্বার্থে। ভারতকে দুর্বল রেখে গেলে সোভিয়েট রাশিয়া এসে ঘাড় মটকাবে। ভারতরক্ষার দায়িত্ব ওরা বিভক্ত করতে চাইবে না। সেটা হবে যৌথ দায়িত্ব। তা হলে বিদেশনীতিকেও যৌথ রাখতে হয়। যোগাযোগব্যবস্থাকেও। শুনতে পাচ্ছি ক্যাবিনেট মিশনও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

সৌম্য এইবার মুখ খোলে। "গান্ধীজীও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

প্রতিমা সমাদ্দার জুলিকে একান্তে বলেন, "আপনা-দের কুটির দেখতে যাব একদিন আমরা। আপনারাও আমাদের কুটির দেখতে আসবেন একদিন।"

জুলি খুশি হয়ে বলে, "নিশ্চয়! কিন্তু আমাদের কুটিরটা বাস্তবিকই কুটির। আপনাদের কুটিরটা কাল্পনিক।"

প্রতিমা সমাদ্দার হেসে বলেন, "তা হোক। আসবেন কিন্তু।"

আঠারো

স্বপনদার বাড়ির কাছাকাছি বাস করেন যশোবিকাশ রায়। ব্রাহ্মণ তথা জমিদার তথা ব্যারিসটার। এর জন্যে তাঁর গর্বের কারণ ছিল। কিন্তু বিধাতা তাঁর মুখরক্ষা করেন নি। যৌবনে বিলেত যাত্রার সময় অর্থাভাবে পিরালী বংশে বিবাহ করেন। ফলে পিরালী হন। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যে পিরালী হয় তার ভাই বোন ছেলেমেয়েও পিরালী হয়। তাদের বিয়ের সময় মুশকিলে পড়তে হয়। তাঁর একমাত্র কন্যা যশোধরাকে তিনি লোরেটোতে পড়িয়েছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে গানবাজনাও শিখিয়ে-ছিলেন। দেখতেও সুন্দরী। তন্বী। দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু পিরালীদের মধ্যে সুপাত্র পাওয়া দুষ্কর। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাত্ররা গুরুজনের ভয়ে পেছিয়ে যায়। যদি বা কেউ রাজি হয় সে মোটা টাকা চায়, সেটা খরচ হবে তার বোনের বিয়েতে।

অসবর্ণ বিবাহ যদিও তাঁর অহংকারে বাধে তবু তিনি মেয়ের মুখ চেয়ে তাতেও রাজি হন। হাতের কাছে পান স্বপনদাকে। তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। রায়সাহেবেরই কাছে শিক্ষা-নবীশ। যাকে বলে ডেভিল। নিজের ডেভিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তো প্রায়ই হয়। প্রস্তাবটা করেন মেয়ের মা। কিন্তু বিলিতি কেতা অনুসারে করতে হত স্বপনদাকেই। বলতে হতো, "টুকটুক, তুমি কি আমার হবে?" স্বপনদা প্রেমের শিক্ষানবীশি করতে আসেন নি, সে বিদ্যা তিনি

ছাত্রজীবনেই আয়ত্ত করেছেন। প্রয়োগও করেছেন। ব্যর্থও হয়েছেন। বলেন, "আমাকে মাফ করবেন। আমার ভাঙা হৃদয় জোড়া দেবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে যে ভেঙে দিয়েছে। তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি, আরো কয়েক বছর করব।"

স্বপনদা জানতেন না যে টুকটুক দারুণ আঘাত পাবে। বিভিন্ন পাত্রের দ্বারা একটা না একটা অজুহাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে এক কাণ্ড করে বসে। বিলেত পালিয়ে গিয়ে এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করে। বাপ মা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? যতদিন পারেন চাপা দেন। কিন্তু পরে জানা-জানি হয়ে যায়। সাহস করে মেনে নেন। পাত্রটি তো ভালো। সদ্বংশীয়। ওদের বংশের কে যেন নবাব ছিলেন। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তঃপাতী সোয়াটের আকন্দ। রেজা আলী আকন্দের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন স্বপনদা ইংরেজিতে ছড়া কাটেন—

"Who, or why, or which, or what,
Is the Akond of Swat?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে যান। তাঁকে জিজ্ঞাসু দেখে স্বপনদা বলেন, "ছড়াটা আমার নয়, এডওয়ার্ড লীয়ারের। ইংরেজরা জানত না আকন্দ বলতে কী বোঝায়, কাকে বোঝায়, কেন বোঝায়। আমরাও কি বুঝি? আমরা তো ভাবি আকন্দ ফুল। একজন আকন্দকে চাক্ষুষ করে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম। নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

বরটি উদার হলে কী হবে? তাঁর গুরুজন ঘোর রক্ষণশীল। তাঁর বেগম পর্দা মানেন না, পিয়ানো বাজান, ক্যারল গান করেন, ছদ্মনামে সিনেমায় অভিনয় করেন। আকন্দ পরিবারের মাথা হেঁট। ব্যারিস্টারি পসারেও টান পড়ে। স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য। তখন টুকটুক আবার এক কাণ্ড বাধায়। যুদ্ধের সময় যেসব মারকিন মিলিটারি অফিসার এসেছিলেন তাঁদের একজনের সঙ্গে পালায়। স্বামী তালাক দেন।

কিছুদিন পরে খবর আসে টুকটুক আবার বিয়ে করেছে। বরের নাম জন উডরো শারম্যান। পূর্বপুরুষ সিভিল ওয়ারে নাম করেছিলেন। টুকটুকের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল হলিউডে গিয়ে চিত্রতারকা হওয়া। শ্বশুর-বাড়ির সেটা পছন্দ হয় না। ও বাড়ির মেয়েরা কেউ অভিনেত্রী হয় না। হলিউডের প্রযোজকরাও তাকে আমল দেন না। আজেবাজে ভূমিকা নিতে বলেন। সে রাজি হয় না। তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ততদিনে জনেরও ক্লান্তি এসেছে। টুকটুক ডিভোরস চায়, এবং পায়।

স্বপনদা একদিন আইনের পরামর্শ নিতে গিয়ে দেখেন ব্যারিস্টার সাহেবের মুখখানা কালো। কেন জানতে চাওয়ার আগে তিনি কাতর স্বরে বলেন, "স্বপন, টুকটুক আমার এক গালে কালি মাখিয়েছিল, এখন আরেক গালে মাখিয়েছে। গ্রামে মুখ দেখাব কার কাছে? মেয়ে দ্বিতীয়বার ডিভোরস পেয়েছে।"

স্বপনদা সান্ত্বনার স্বরে বলে, "অসুখী হওয়ার চেয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেয়।"

মেয়ের মা বলেন, "এর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে ও সুখী হত। এসব কেলেঙ্কারি করত না।"

"আমি কেমন করে জানব? আমি কি সর্বজ্ঞ?" স্বপনদা জবাবদিহি করেন।

"তোমার জানা উচিত ছিল যে তোমার নভেল পড়ে তরুণী মেয়েরা তোমাকেই তাদের রোমানটিক নায়ক করতে চাইবে। আরো কজনের মাথা খেয়েছ কে জানে? ওরাও হয়তো এমনি অসুখী।"

"গ্যেটের 'তরুণ ভেরটারের দুঃখ' পড়ে সেকালের তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। তার জন্যে কি গ্যেটে দায়ী? এ কী সর্বনেশে কথা! কজন প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করতে পারতুম?" স্বপনদা কপট ভয়ে ভীত।

যশোবিকাশ বলেন, "আর্ট যেমন জীবনের অনুকরণ করে জীবনও তেমনি আর্টের অনুকরণ করে। কার উক্তি? অসকার ওয়াইলডের না?"

"আর কার? যা চটকদার উক্তি!" স্বপনদা বলেন।

"আমি ভাবছি ও মেয়ে ইবসেনের সৃষ্টি না চেখভের? তোমার নয়, তা এতদিনে বোঝা গেছে। তুমি জান কেমন করে সব দিক সামলাতে হয়। কিন্তু বলতে পার ওর ভবিষ্যৎ কী? ও চায় স্বাধীন জীবিকা। সিনেমা লাইফই ওর পছন্দ। এদেশে তার কী রকম প্রসপেকট?" জানতে চান যশোবিকাশ।

"স্ট্যান্ডার্ড বিসর্জন দিলে অসীম পরিসর। কিন্তু টুকটুক আর টুকটুক থাকবে না। দেবিকারানী আর

দেবিকারানী থাকতেন না। তিনি সময়মতো সরে যান। অবশ্য মনের মতো স্বামী পেয়ে। অতি উচ্চমনা পুরুষ। টুকটুকের ভাগ্যে কী আছে কে বলতে পারে! আর এক-জন শ্বেতোস্লাভ রোয়েরিঙই বা কোথায়?" স্বপনদা সহানুভবী।

"তেমন একটি বর খোঁজা বাপমায়ের সাধ্য নয়। আমরাই বা আর কদ্দিন? আমাদের পরে মেয়েটার ভার নেবে কে? টাকার অভাব হবে না। কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? পারমানেনট সেটলমেনট রদ হয়ে যেতে পারে। ওটা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। ওরা চলে গেলে ব্যারিস্টারিও তো উঠে যেতে পারে। ব্যারিস্টাররাও ইংরেজদেরই সৃষ্টি। আমাদের রুজিরোজগারের সূত্র থাকবে না। তোমাকে ধরতে হবে বৈদ্যবৃত্তি। আমাকে যজমানবৃত্তি।" যশোবিকাশ হা-হুতাশ করেন।

স্বপন হেসে বলে, "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, চতুরানন।"

"হাসির কথা নয়, স্বপন। ইংরেজি এসেছিল ফারসির জায়গায়। এর পর হিন্দি আসবে ইংরেজির জায়গায়। পারবে তুমি হিন্দিতে আদালতের কাজ চালাতে? আমি তো অক্ষম। এ বয়সে হামাগুড়ি দিতে নারাজ।" যশোবিকাশ হাসেন না।

"হিন্দি কেন বলছেন? উরদুই তো হবে পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। আর বাঙলাদেশ তো পড়বে পাকিস্তানে।" স্বপনদা মনে করিয়ে দেন।

"ভাবনার কথা। ইংরেজরা আমাদের উপর শোধ তুলে যাবে। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্যে প্রতিশোধ। তুমি তো জান আমরা মডারেটরা সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করি নি। আমরা ছিলুম দূরদর্শী। আর একস্ট্রীমিসটরা অদূর-দর্শী। এখন ডে অভ রেকনিং আসন্ন। ইংরেজরা যদি গোটা বাঙলাদেশটাই মুসলিম লীগকে দিয়ে যায় কংগ্রেস বা মহাসভা সেটা থামাবে কী করে? এবারকার নির্বাচনে মুসলিম লীগেরই একাধিপত্য। সুহরাবর্দী একজন বর্ণহিন্দুকেও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেন নি। আর তাঁরই বা কতটুকু স্বাধীনতা? দাবার ঘুটি চালাচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেসকে জব্দ করাই তাঁর পলিসি। কংগ্রেস হয়তো ইংরেজেরই সঙ্গে আপস করবে, কিন্তু লীগ কখনো কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে না। ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসে বাধা দেবে। কৈকেয়ীর মতো দশরথকে বলবে, তুমি আমাকে বর দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। আমি চাই পাকিস্তান। যার শামিল হবে সারা বাঙলা, সারা আসাম, সারা পানজাব। আমাকে আমার প্রার্থিত বর না দিয়ে তুমি কেমন করে বনবাসে যাও, দেখব। তোমার বিপদের দিন কৌশল্যা কি তোমার সেবা করে-ছিল? তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল? বুঝলে, স্বপন। ইংরেজরা মুসলিম লীগকে তার পাওনা না দিয়ে ছাড়া পাবে না। দিতে গেলে লীগপন্থীরা বিদ্রোহ করবে। গুলি করে হাজার হাজার মুসলমান মারতে হবে। নেভার।" যশোবিকাশ মাথা নাড়েন।

ক্যাবিনেট মিশনের স্টেটমেনট পড়েছেন? ও'রা সাফ বলে দিয়েছেন যে ও'রা পাকিস্তান সমর্থন করেন না। মুসলিম লীগ যদি নাছোড়বান্দা হয় তবে অর্ধেক বঙ্গ, অর্ধেক পানজাব আর আসামের সীলেট জেলা পাবে। তা ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান আর সিন্ধুপ্রদেশ। যদি গোটা বাঙলা, গোটা পানজাব আর গোটা আসামের জন্যে জেদ ধরে তবে সোভরেনটি পাবে না। সৈন্যসামন্ত, পররাষ্ট্রবিভাগ ও যোগাযোগব্যবস্থা থাকবে অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। মুসলিম লীগকে খুশি করার জন্যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সর-কারের অন্যান্য ক্ষমতা তিনটি গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটা গ্রুপ, পশ্চিম প্রান্তের মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে আর-একটা গ্রুপ, বাঙলাদেশ আর আসামকে নিয়ে আরো একটা গ্রুপ। শেষের গ্রুপটাতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা বাহান্নর নীচে। অমুসলমানদের সংখ্যা শতকরা আট-চল্লিশের উপরে। প্রায় সমান-সমান। গ্রুপদের নিজস্ব আইনসভা আর সরকার থাকবে। কোয়ালিশনের সম্ভা-বনাই বেশি। এই হল ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা। সেটা কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সেটা একটা অ্যাওয়ার্ড নয়।" স্বপনদা সংক্ষেপে প্রস্তাবের মর্ম শোনান।

"কেন্দ্র আর প্রদেশের মাঝখানে আরো একটা স্তর! গ্রুপ! দুনিয়ার আর কোনো শাসনতন্ত্রে কেউ দেখেছে? ওটাকে চালু করে দেবার জন্যে ইংরেজদের আরো কিছু-কাল থেকে যেতে হবে। নয়তো দুদিনেই ভেঙে পড়বে। কেন্দ্রকে অমন করে কমজোরি করা বিজ্ঞতা নয়। মোগলরাও তা করে নি, ইংরেজরা নিজেরাও তা করে নি। কংগ্রেস তাতে রাজি হবে? লীগ যদি রাজি হয় তবে তা সেই মই বেয়ে গাছে ওঠার জন্যে। গ্রুপ থেকেই পৌঁছবে পাকিস্তানে। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র পানজাব আর সমগ্র আসাম সমেত। ভাঙন ধরাবে কেন্দ্রীয় সৈন্যদলে। কংগ্রেস লীগ আপস ছাড়া এ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। সে আপস ইংরেজের হাতে নেই। আছে দুই দলের দলপতিদের হাতে। আমি তোমার মতো আশাবাদী নই, স্বপন।" যশোবিকাশ বলেন।

"আমিও কি আশাবাদী? লক্ষণ যা দেখছি তা আপসের নয়, গৃহযুদ্ধের। দু পক্ষই তৈরি হচ্ছে। বিনা যুদ্ধে কেউ কাউকে সূচাগ্র মেদিনী দেবে না। আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাই নে। আমি দূরে সরে থাকতে চাই। কিন্তু যাবই বা কোথায়। ইউরোপে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দীপিকা কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তার কুকুরই তার সর্বস্ব।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

টুকটুকের মা মেখলা দেবী হেসে ওঠেন। "কুকুরই তার সর্বস্ব! স্বামী নয়! এই হচ্ছে তোমার শাস্তি। টুকটুককে বিয়ে করলে দেখতে তুমিই হতে তার ঠাকুর। সে হত ঠাকুরসর্বস্ব।"

দীপিকা যদি শোনে তবে রক্ষে থাকবে না। স্বপনদা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, "তা নয়। দীপিকা কলকাতায় থাকতে চায় সম্পত্তি পাহারা দিতে। ইংরেজরা যদি সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারত থেকে অপসরণ করে তবে তার পরে যেটা হবে সেটা জোর যার মুলুক তার। মালিক পালিয়ে গেলে সম্পত্তি লোপাট হয়। এটাই তো নিয়ম। আদালত কোথায় যে নালিশ করে ফেরত পাবে! ওসব অচল হবে। লর্ড ওয়েভেল ইনটারিম গভর্নমেনটের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি সফল হন তবে কংগ্রেস আর লীগ একসঙ্গে কাজ করতে-করতে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিখবে। একটা মোডাস ভিভেনডি গড়ে উঠবে। হিন্দু মুসলমান যদি এক না হয় ভারত এক হবে কোন্ মন্ত্রবলে? ইংরেজরা ক্ষমতা হাতে দিয়ে গেছে বলে? আমি চাই হিন্দু-মুসলমানে কোলাকুলি। তুমি আমাকে কিছু দাও, আমি তোমাকে কিছু দিই। গিভ অ্যানড টেক। কিন্তু ওরা তো কেউ কারো সঙ্গে কথাই বলছে না। প্রত্যেকেরই সম্পর্ক ইংরেজের সঙ্গে। অপর পক্ষের সঙ্গে নয়। কৌশল্যাতে-কৈকেয়ীতে মুখ-দেখাদেখি নেই।"

"দ্যাখো, স্বপন, কংগ্রেস আর লীগ যদি মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে পরস্পরকে অপোজ করে, যদি প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেসের বা লীগের বিরোধী পক্ষ হয়, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরস্পরের বিরুদ্ধতা করে, তবে বড়লাটের শাসনপরিষদে তারা মিলেমিশে শাসনকার্য চালাবে কী করে? গিভ অ্যানড টেক সর্ব ক্ষেত্রেই করতে হবে। কেবলমাত্র শাসনপরিষদে নয়। গান্ধীজী শুনেছি ওয়েভেল সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস বা লীগ এদের এক পক্ষের উপর গভর্নমেনট ছেড়ে দিতে। লীগ যদি গভর্নমেনট চালায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দুই দলের যেমন সম্পর্ক তাতে ওদের মেলাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে।" যশোবিকাশ বলেন।

ব্র্যানডি এল। স্বপনদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যশো-বিকাশ বলেন, "আমার বয়স হল সত্তর। কোরট যাওয়া-আসা করা আর চলবে না, গাউটের মতো হয়েছে। যতদিন পারি চেমবার প্র্যাকটিস চালিয়ে যাব, যতদিন ইংরেজি থাকে। এখন আমার প্রধান ভাবনা টুকটুকের কী হবে। তোমার কি মনে হয় ও আবার বিয়ে করবে?"

"কেমন করে জানব? স্ত্রিয়াঃ চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

যশোবিকাশ হাসেন, কিন্তু মেখলা দেবী চটে যান। "নারীজাতিকে অত বড়ো অপমান আর কেউ করে নি। পচা রসিকতা।"

যশোবিকাশ তাঁর স্ত্রীকে প্রবোধ দেন। "যাঁরা সীতা, সাবিত্রী, উমা, হৈমবতী চরিত্র এ'কেছেন তাঁরা নারীকে কত বড়ো আসন দিয়েছেন! সম্মানও তো আর কেউ তেমন করে নি।"

"টুকটুক আসছে কবে?" স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন।

"যে কোনো দিন। আমাদের কাছে থাকবে। বরা-বর থাকলে তো আরো ভালো হয়। এ বয়সে আর কে আমাদের দেখাশুনা করবে? ভাস্কর? ভাস্কর তো বউ নিয়ে মিলিটারি ক্যানটনমেনটে। শুনছি ব্রিগেডিয়ার হবে। ইংরেজরা এক-এক করে উচ্চ পদ ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের এখনকার পলিসি হল আরমিটাকে ওদের সাগরেদ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া। গোরা ইংরেজের জায়গায় কালা ইংরেজ। যাতে ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয়রক্ষা হয়।

ভারতের স্বাধীনতায় ওদের আপত্তি নেই। যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে মেনে নেওয়াই তো বিজ্ঞতা। এবারকার যুদ্ধে এন্তার ছেলেকে কমিশন দেওয়া হয়েছে। তারা বেকার হলে তো শত্রুতা করবে। আর তাদের বহাল রাখতে গেলে নিজেদেরই হটতে হয়। সেটার জন্যে ওরা মনে-মনে প্রস্তুত। তবে ওদের পেনসন আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সিভিলিয়ানদেরও ওই একই বক্তব্য। কিন্তু দেবেটা কে? হোম গভর্নমেনট না ভারত গভর্নমেনট? হোম গভর্নমেনট দীর্ঘকাল ধরে পেনসন আর ক্ষতিপূরণের দায় বইতে রাজি হবে না। বইতে হবে ভারত সরকারকেই। কোন্ ভারত সরকারকে? যারা বিদায় নিচ্ছে তাদের ভারত সরকার নয়। যারা ক্ষমতা বুঝে নিতে চায় তাদেরই সরকার। ক্ষমতার হস্তান্তর মানেই দায়িত্বের হস্তান্তর। ইনটারিম গভর্নমেনট গঠন করার জন্যে বড়লাট যে ব্যাকুল হয়েছেন তার কারণ তাঁকেই নিতে হবে পেনসন আর ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত। রাজি হলে মিটমাট, নারাজ হলে বিচ্ছেদ। কংগ্রেস বা লীগ কেউ ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় না। শত্রুতার অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। মিত্রতার অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। আমরা মডারেটরা এইটেই কল্পনা করেছিলুম। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, ডব্লিউ সি বনার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লর্ড সিনহা কেউ তাঁবেদার ছিলেন না। তখনকার দিনে মহম্মদ আলী জিন্নাও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। তিনিও সমান স্বাধীনচেতা। পরিবর্তন তো মানুষমাত্রেরই হয়। তাঁরও হয়েছে। গোখলের শিষ্য গান্ধীরও। দুঃখ এইখানে যে এঁদের মাঝখানে এখন দুস্তর ব্যবধান। গান্ধীজী যেমন বড়লাটের প্রতিপক্ষ জিন্না সাহেব তেমনি গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ। বিরোধী পক্ষই তো অলটারনেটিভ গভর্নমেনট গঠন করে। গান্ধীজী একদিন তা করবেন, কিন্তু জিন্না সাহেবের কী আশা? যদি না দেশ দুভাগ হয়। বাধা দিলে সিভিল ওয়ার। ফলাফল অনিশ্চিত। ইংরেজ তার আগেই কুইট করবে।" যশোবিকাশ অনুমান করেন।

স্বপনদা জানতে চায়, "জিন্নাকে কি আপনি চিনতেন?"

"চিনব না? তখনকার দিনে কংগ্রেস ছিল আমাদেরি হাতে গড়া। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিসটার অ্যাটরনি আর উকিলরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করতেন কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হবে, সভাপতি হবেন কে, পলিসি কী হবে। 'আমরা বিলেতফেরতা কটাই দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই।' স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল থাকতেন আমাদের এই পাড়ায়। কংগ্রেসের কাজ দেখাশুনা করতেন। গান্ধীজীর আত্মচরিতে যে ঘোষালবাবুর নাম আছে তিনি আর কেউ নন, জানকীনাথ। হ্যাঁ, তিনিও ব্যারিসটার। সরলা দেবী তাঁরই কন্যা। কংগ্রেসের অধিবেশনে গানবাজনার ভার ছিল তাঁর উপরে। রবীন্দ্রনাথও গান গেয়ে শুনিয়েছেন। কংগ্রেস মুসলমানদেরও সভাপতি করত। মেমবর তো করতই। জিন্না ছিলেন আমাদের তুরুপের তাস। ইংরেজদের বলতুম, এই দ্যাখো জিন্না আছেন আমাদের সঙ্গে। ইংরেজ মহলে তিনি অপ্রিয় ছিলেন। প্রিয় মুসলমানরা ঢাকায় শিক্ষাসম্মেলন করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে একটা চমক দেন মুসলিম লীগ বলে একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন করে। খবরটা আসে রয়টারের মারফত লনডন থেকে। ঢাকা থেকে সরাসরি নয়। তা হলে বোঝো কার কারসাজি। ওটা যে ব্রিটিশ গভর্নমেনটের সেকেনড ফ্রনট এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। বড়লাট লর্ড মিনটো ও'দের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন যে মুসলমানদের দিতে হবে সেপারেট ইলেকটোরেট। আমরা যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করেছিলুম তার পরিণতি হয় নির্বাচনের সময় হিন্দু-মুসলমানের পৃথক ভোট। নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যেতে হলে হিন্দু প্রার্থী মুসলিম ভোটারের স্বারস্থ হবেন না, মুসলিম প্রার্থী হিন্দু প্রার্থীর স্বারস্থ হবেন না। যে যার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে নির্বাচিত হবেন। জিন্নাকে বাধ্য হয়ে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে প্রার্থী হতে হবে। মুসলিম লীগের মেমবর হতে হয়। তা বলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন না। তিনি দুই নৌকায় পা রেখেছেন কেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতের জাতীয় স্বার্থে আমি কংগ্রেসে আছি। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মুসলিম লীগেও আছি।' তখনকার দিনে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। ফলে জিন্না ছিলেন বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝখানে লখনউতে যে কংগ্রেস-লীগ প্যাকট স্বাক্ষরিত হয় সেটা ছিল টিলক আর জিন্নার যৌথ উদ্যোগে। লখনউতে আমিও উপস্থিত ছিলুম। লীগ সদস্যরা কংগ্রেসের অধিবেশনে আসেন, আমরাও যাই লীগ অধিবেশনে। টিলক বলেন, 'হিন্দু, মুসলমান আর ইংরেজের ত্রিকোণীয় সংগ্রাম চলতে দেওয়া উচিত নয়। সংগ্রাম হবে এখন থেকে দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষে হিন্দু মুসলমান। অপরপক্ষে ইংরেজ।' সেটা কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মনের কথা। সে সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। পরে যখন সেটা হয় কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ তখন জিন্না বলেন, 'তার আগে আরো একটা কংগ্রেস-লীগ প্যাকট চাই।' টিলক জীবিত থাকলে সেটাই বোধহয় কংগ্রেস পলিসি হত। কিন্তু ইতিমধ্যে গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন। তাঁর পলিসি ছিল অহিংস অসহযোগ। গণসত্যাগ্রহ। তার জন্যে নির্বাচন বয়কট। আদালত বয়কট। আমি সেই সময় সরে পড়ি। জিন্না সাহেবও। কংগ্রেস-লীগ প্যাকট তো পারলামেনটারি রাজনীতির অঙ্গ। গান্ধীজী পারলামেনটারি রাজনীতি বর্জন করেন। পরে সি. আর. দাশ আর মোতিলাল নেহরুর খাতিরে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে আপস করেন, কিন্তু জিন্নার সঙ্গে নয়। সেই ইস্তক গান্ধী-জিন্নার মতভেদ আর পথভেদ বেড়েই চলেছে। জিন্না দাবি করছেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস মুসলিমরা লীগ মুসলিমদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারেন না, তাঁদের বিসর্জন না দিলে কোনো চুক্তিই সম্ভব নয়, কোনো চুক্তি সম্ভব না হলে ক্ষমতার হস্তান্তর একই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাতে পারে না, তার জন্যে চাই দুটো কেন্দ্রীয় সরকার, একটা হিন্দু নেশনের হোমল্যান্ডের আর আরেকটা মুসলিম নেশনের হোমল্যান্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। একটিমাত্র কেন্দ্রে কোয়ালিশন যদি একান্তই হয় তবে দুই পক্ষের প্যারিটি তার জন্যে অত্যাবশ্যক। কংগ্রেসকে সেটা মেনে নিতে হবে। নইলে লীগের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। সে সংঘর্ষের পথ ধরবে। সেই জিন্না আর এই জিন্না! চিনতেই পারা যায় না। মুখের চেহারা একই রকম আছে, কিন্তু মনের চেহারা বেবাক বদলে গেছে। টিলক মহারাজ যেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেইটেই আবার আমাদের সামনে। তিনকোনা সংগ্রাম। কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় অপসরণ করে তা হলে আর তিনকোনা নয়, দ্বিপাক্ষিক।" যশোবিকাশ তন্ময় হয়ে বলেন, আর স্বপনদা একাগ্র হয়ে শোনেন।

এর পরে আর জমে না। যশোবিকাশের হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। মেখলাদেবীরও। টুকটুকের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাই প্রথম কথা। ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা দ্বিতীয়।

স্বপনদা আর আইনের পরামর্শ চেয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চান না। তিনি কন্যার জন্যে চিন্তিত। সেদিন এই শেষ।

ওদিকে দীপিকাদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁর কাছে বড়ো কথা কলকাতার ভবিষ্যৎ। মুসলিম লীগ যদি স্বাধীন আর সার্বভৌম পাকিস্তান চায় তবে তাকে কেবল হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির নয়, পানজাব, বঙ্গ আর আসামের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিরও মায়া কাটাতে হবে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তার ভাগে পড়বে না। তবে সে যদি নিতান্তই সেসব অঞ্চল হাতছাড়া করতে না চায় তা হলে তাকে সার্বভৌমতার মায়া কাটাতে হবে। সার্বভৌমতার প্রতীক ডিফেনস, ফরেন অ্যাফেয়ার্স আর যোগাযোগব্যবস্থা। সেগুলি তুলে দিতে হবে এক যৌথ গভর্নমেনট বা অথরিটির হাতে। সেটাও একপ্রকার কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রই তার অধীন। যেমন হায়দরাবাদ আর কাশ্মীর। অবিভক্ত ভারতই অন্যভাবে বহাল থাকবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশ, পানজাব আর আসামও থাকবে অবিভক্ত।

"লেবার যে আমাদের কত বড়ো শুভানুধ্যায়ী এই পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। মুসলিম লীগ কিছুতেই অত ছোটো পাকিস্তান আর অত বড়ো হিন্দুস্থানে রাজি হবে না। তা হলে সমকক্ষতার মোহ ত্যাগ করতে হয়। আর কলকাতার মায়া কাটানোও কি মুখের কথা? সুহরাবর্দী কি পারবেন তার মায়া কাটাতে? আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে পাকিস্তান কলকাতা পাবে না। লড়াই করা বৃথা। কলকাতা আমাদেরই থাকবে। আমরাও কলকাতায় থাকব।"

"হ্যাঁ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমাকে আর বঙ্গভঙ্গ দর্শন করতে হবে না। এক জীবনে একবারই যথেষ্ট। ইংরেজদের উপর তোমার অবিশ্বাস জন্মেছিল। সেটা সেই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের পর থেকে। এখন তুমি বুঝতে পারছ ওরা হিন্দুর উপর জাতক্রোধ নয়। কী ভোগানটাই ওদের ভোগানো হয়েছে ১৯৪২ সালের কুইট

ইনডিয়া আন্দোলনে! একদিকে জাপান, আরেক দিকে কংগ্রেস। কিন্তু তার জন্যে ওরা প্রতিশোধ নিতে চায় না। পেথিক-লরেন্স আর ক্রিপস, গান্ধী আর নেহরুর পুরাতন বন্ধু।" স্বপনদা বলেন।

"পেথিক-লরেন্সের মতো ফেমিনিস্ট কি আর আছে! স্ত্রীর পদবী বহন করে চলেছেন। ওঁর নিজের পদবী তো পেথিক। লরেন্স পদবীটা ওঁর স্ত্রীর। হ্যাঁ, একেই বলে প্রেমের জন্যে ত্যাগস্বীকার। স্ত্রীরাই তো স্বামীর পদবী বহন করে বেড়ায়, স্বামীরা স্ত্রীর পদবী বহন করা দূরে থাক, বিয়ের পরে রাখতেও দেয় না। যেমন তুমি।" দীপিকাদি খোঁটা দেন।

স্বপনদা জানতেন যে দীপিকাদি কট্টর ফেমিনিস্ট। বাবলী যেমন কট্টর কমিউনিস্ট। এ নিয়ে আগেও তর্কা-তর্কি হয়ে গেছে। ইংরেজ মেয়েরা আজকাল স্বামীর পদবী ধারণ না করে পিতার পদবীই রক্ষা করে। দীপিকা ইচ্ছা করলে দীপিকা ঘোষ লিখতে পারেন। কিন্তু স্বপনদাকে যদি বলে গুপ্ত-ঘোষ লিখতে তাহলে সেটা হবে সুকুমার রায়ের হাঁসজারু বা হাতিমির মতো কিম্ভূত। স্বামীর মতো স্ত্রীও হাস্যাস্পদ হবেন। আসলে ফেমিনিজম তত্ত্বটাই স্বপনদার পছন্দ নয়। এই যে মেয়েরা চাকরির জন্যে আজকাল খেপেছে এটা বিবাহের সঙ্গে বেখাপ। টুকটুক তার নবতম নিদর্শন। স্বামী আর সন্তান নিয়েই মেয়েদের জীবন।

আজ এ নিয়ে আর তর্ক না করে স্বপনদা বলেন, "পেথিক-লরেন্স ব্যারিস্টার, ক্রিপস ব্যারিস্টার, গান্ধী ব্যারিস্টার, নেহরু ব্যারিস্টার, প্যাটেল ব্যারিস্টার, জিন্না ব্যারিস্টার, লিয়াকত আলী ব্যারিস্টার। ওদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীও ব্যারিস্টার। এই কজন ব্যারিস্টারই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। ইতিহাসের নির্বন্ধ। অখণ্ড ভারত বা দ্বিখণ্ড ভারত যেটাই হোক না কেন, সিদ্ধান্তটা ব্যারিস্টারদের হাতে। নেহরু আর প্যাটেলকে বাদ দিয়ে হিন্দুস্থান সরকার হয় না। জিন্না আর লিয়াকতকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান সরকার হয় না। তোমাকে মানতেই হবে যে ব্যারিস্টোক্রাসির যুগ যায় নি এবং যাবে না। ডেমোক্রাসি, ব্যুরোক্রাসি আর ব্যারিস্টো-ক্রাসি—এই তিনটি যেন এক বৃন্তে তিনটি ফুল। যেমন বিলেতে।"

দীপিকাদি রসিকতা করে বলেন, "এ যে দেখছি অষ্টবজ্র-সম্মিলন। এর ফল হবে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বসবে কি না সন্দেহ। ইনটা-রিম গভর্নমেনট গঠন করতে পারা যাবে কি না সন্দেহ। ক্যাবিনেট মিশন সফল হবে কি না সন্দেহ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ঘোরতর নৈরাজ্যের মধ্যে আইন আদালত টিকে থাকবে কি না সন্দেহ। ঘোলা জলে কমিউনিস্টরা মাছ ধরবে কি না সন্দেহ। সারা জীবনের তপস্যা ব্যর্থ হলে গান্ধীজী বেঁচে থাকবেন কি না সন্দেহ। স্টালিন তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন কি না সন্দেহ। স্টালিন এলে ট্রুমানও আসবেন কি না সন্দেহ। ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগকে তুষ্ট করার জন্যে গ্রুপ গভর্নমেনট আর গ্রুপ কনস্টিটিউশন প্রবর্তন করছেন। কিন্তু শিখদের তুষ্ট করবার জন্যে কী উপায় করছেন? ওরা কি সহ্য করবে?"

[ক্রমশ

আনন্দমঠ ও আনন্দভবন

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগে ১৯৬৪ সালে জহরলাল নেহরুর জীবন-অবসান হল। জহরলাল বিশ্বভারতীর আচার্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্যে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সভার আয়োজন হয়েছিল। সে সভায় আমি ছিলাম অন্যতম বক্তা। সেদিন যে কথা বলে আমার বক্তব্যের সূচনা করেছিলাম, আজ মনে হচ্ছে ইন্দিরার দেহাবসানে সে কথাটি আরোই বেশি প্রযোজ্য। সেই কুড়ি বছর আগে বলেছিলাম—বঙ্কিম-চন্দ্রের আনন্দমঠ এবং পণ্ডিত মোতিলালের আনন্দভবনে কোথাও একটা যেন মিল আছে। পাঠকদের মনে পড়বে, আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় মুক্তিকামী দেশব্রতী চলেছেন নিবিড় নিশীথে গহন অরণ্যপথে। নিভৃত মনের চিন্তা দেশপ্রেমীর কণ্ঠে স্বতঃ উচ্চারিত হল—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না? অন্ধকার আলোড়িত করে অপর এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—তোমার পণ কী?

পণ আমার জীবন।

জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

পণ্ডিত মোতিলাল ছিলেন স্বদেশ-অন্ত প্রাণ। অনু-মান করা যেতে পারে, ওই একই চিন্তা তাঁর মনকেও নিরন্তর আলোড়িত করেছে—আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হবে না? ভারত-ভাগ্য-বিধাতা তাঁকেও প্রশ্ন করে থাকবেন—তোমার পণ কী?

প্রত্যুত্তরে মোতিলাল নিশ্চয় বলেছিলেন—পণ আমার প্রাণ।

ভারত-বিধাতার মুখে সেই একই কথা উচ্চারিত হয়েছিল—প্রাণ তুচ্ছ, অনেকেই দিতে পারে। আর কী দিতে পার?

মোতিলালের উত্তরটি অনুমান করা কঠিন নয়। নিশ্চয় বলে থাকবেন—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে পুত্র, সেই পুত্রকে দিতে পারি।

মোতিলাল তাঁর পণ রক্ষা করেছিলেন। হ্যারো-কেমব্রিজে শিক্ষিত পুত্রকে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত না করে দেশোদ্ধারে ব্রতী করেছিলেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাম চোদ্দ বছর বনবাস করেছিলেন, জহরলাল চোদ্দ বছর কারাবাস করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু দুঃখ কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দেশ স্বাধীন হল। ভারতের শাসনভার তাঁর হাতেই অর্পিত হল। কিন্তু জহরলাল জানতেন যে, অধীনতা থেকে মুক্ত হলেই দেশ

স্বাধীন হয় না। দেশকে অধিকার করে নিতে হয়। ভালোবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে, শ্রম দিয়ে দেশকে আপন হাতে গড়ে নিতে পারলে তবেই দেশ আপন অধিকারে আসে। সে কাজ সময়সাপেক্ষ, শক্তিসাপেক্ষ—সহজে সমাধা হয় না। জহরলালের মনে শান্তি ছিল না। তাঁরও মনে সেই প্রশ্ন—আমার অভীষ্ট কি সিদ্ধ হবে না? ভারত-বিধাতা তাঁর কাছেও সর্বস্ব পণ দাবি করেছিলেন। নিঃসংশয়ে বলা যায় জহরলাল অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন—জীবন-সর্বস্ব-ধন একমাত্র সন্তান—সেই সন্তান আমার পণ। উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ইন্দিরা সেই প্রাণ দিয়ে পিতৃপণ রক্ষা করে গেলেন।

আনন্দমঠ এবং আনন্দভবন—এ দুয়ের মিল শুধু নামে নয়, কাজেও। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আনন্দমঠের যে একটি বিরাট ভূমিকা ছিল, সে কথা কারোরই অজানা নয়। অগণিত স্বাধীনতাকামীকে প্রেরণা জুগিয়েছে, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে সারা দেশ রোমাঞ্চিত প্রকম্পিত হয়েছে। গান্ধীযুগে মোতিলালের আনন্দভবন ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আর আনন্দভবনের ইতিহাস এক হয়ে মিশে গিয়েছে। বলতে বাধা নেই, আনন্দমঠের সন্তানদল যা করেছেন তার চাইতে ঢের বেশি করেছেন আনন্দভবনের সন্তানদ্বয়। কেননা একটি কাল্পনিক, অপরটি বাস্তব।

স্বাধীনতালাভের পরবর্তী ইতিহাসে আনন্দভবনের ভূমিকা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর। স্বাধীন ভারতের দুই প্রধান নির্মাতা আনন্দভবনের দুই সন্তান। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ সাঁইত্রিশ বছর। মাঝে তিনটি বছর বাদ দিলে প্রায় চৌত্রিশ বৎসর কাল দেশের শাসন পরিচালনা করেছেন ওই দুই সন্তান—পিতা জহরলাল, কন্যা ইন্দিরা। পিতাপুত্রীর মধ্যে পিতা অধিকতর ভাগ্যবান। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা ছিলেন জহরলালের সমধর্মী, সহকর্মী, স্বাধীন ভারতে তাঁরাই হয়েছিলেন শাসনকার্যে তাঁর সহযোগী। দেশবিভাগের বিশৃঙ্খলা বাদ দিলে শাসনপরিচালনায় বড়ো রকমের কোনো বিভ্রাট দেখা দেয় নি। রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহযোগিতায় শাসনকার্য অপেক্ষাকৃত বাধামুক্ত এবং সহজসাধ্য ছিল। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা তখনো দানা বাঁধে নি। যেটুকু ছিল, নেহরু তাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারতেন।

চক্রান্ত-ব্যূহ

ইন্দিরা যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন চক্রব্যূহ তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে অভিমন্যুবধ একদিনে সম্ভব হয় নি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হতে যত দিন লেগেছিল ইন্দিরাবধ করতে তত বছর লেগেছে। অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর চাইতে নেহরু-কন্যা ইন্দিরা ঢের বড়ো যোদ্ধা। চক্রব্যূহের শিকার নন, চক্রান্ত-ব্যূহের শিকার ; সপ্তরথীর বেষ্টন নয়, সপ্তদশ রথীর বেষ্টন। দেশে যত কটি দল সব কটিই তাঁর বিরোধী। সকলেই জানেন, রাজনীতির মধ্যে আর যাই থাক, নীতি-নামক পদার্থটি নেই। আমাদের বিরোধী রাজনীতি আরোই বিচিত্র এক সামগ্রী। এর মধ্যে নীতিও নেই, রাজনীতিও নেই, শুধু বিরোধটুকুই আছে। তার কারণ বিরোধটা নীতিগত নয়, রাজনীতিগতও নয়। এ হল আমাদের চরিত্রগত—হিংসা-বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত আক্রোশ, পরশ্রীকাতরতা-প্রসূত। বড়োকে ছোটো করায়, পদস্থকে অপদস্থ করায় আমাদের অপার আনন্দ। এরই নাম বিরোধী রাজনীতি। রাজনৈতিক বিরোধের একটা ধরন আছে, আমরা তার ধার ধারি না। বিরোধ বলতে যে মতবিরোধ, কার্যক্রমের বিরোধ—সে ধারণা আমাদের নেই। আমরা বিরোধ বলতে বুঝি শত্রুতা।

সুসভ্য সুশিক্ষিত দেশে দুটি-তিনটির বেশি রাজনৈতিক দল থাকে না। দলনেতারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ কিন্তু ক্ষমতা এবং মর্যাদায় সমকক্ষ। একবার ইনি প্রাধান্য পান তো আরেকবারে উনি। আমাদের দেশে গন্ডা দশেক দল—খুদে-খুদে এককেটি গোষ্ঠী। আমরা সব জিনিসকেই সস্তা করে নিতে জানি। জন দশেকে জটলা করে দল পাকাতে পারলেই একটা পার্টি গড়া যায়। এসব দলনায়করা নিজেদের দেশনায়ক বলে দাবি করেন। কিন্তু এঁদের নেতৃত্বের অধিকার কতখানি, তাঁদের ক্ষমতার বহর দেখলেই তা বোঝা যাবে। আমাদের লোকসভার মোট সদস্য ৫০২। সপ্তম নির্বাচনে শাসনক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস (ই) লাভ করেছিল ৩৫৫টি আসন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাকি সমস্ত দলের মিলিত সদস্য ১৮৭। এর মধ্যে যে দল সবচাইতে বলশালী তার আসনসংখ্যা ৩৬।

আমাদের বিরোধী রাজনীতির শক্তিসামর্থ্য কতখানি এই-সব সংখ্যার দ্বারাই তা প্রমাণিত। কিন্তু রাজনীতি তো সংখ্যামতে চলে না। কণ্ঠের জোর থাকলে সংখ্যাকে অগ্রাহ্য করা যায়।

কোনো-কোনো দল এত ক্ষুদ্র যে পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি পাবারই যোগ্য নয়। এ শুধু নেতৃত্বের লোভে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন। ডিমোক্রেসির ধুয়া তুলে খুদে-খুদে অ্যারিস্টক্রেসির আখড়া স্থাপিত হয়েছে। অমিট রায়ের ভাষায় বলা যেতে পারে—"সতী দেহ খন্ড-খন্ড হয়ে (এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস দেহ টুকরো-টুকরো হয়ে) দেশ জুড়ে একশো পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রেসি আজ যেখানে সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে। খুদে-খুদে অ্যারিস্টক্রেটে দেশ ছেয়ে গেল। তাদের কারো গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

দলনেতায় এবং দেশনেতায় দুস্তর ব্যবধান। বিরাট দেশ, জনসংখ্যা সত্তর কোটির ঊর্ধ্বে। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহুবিধ রীতিনীতি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা নিয়ে বিচিত্র এই দেশ। এত বড়ো দেশের শাসনপরিচালনার জন্যে যে শিক্ষাদীক্ষা, ন্যায়নীতিবোধ, মনের প্রসার, সর্বজনে সমদৃষ্টি, অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে সংযোগরক্ষা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন—সমস্ত মিলিয়ে শাসনকার্যে যে দক্ষতার প্রয়োজন, সে কি কোনো দলনেতা বা গোষ্ঠীপতির কাছে আশা করা যায়? এ ছাড়া সর্বপ্রকার বৃহৎ কর্মে উদ্যমে উদ্যোগে যে গুণটির সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন সেটি হল ইমাজিনেশান। এ বড়ো দুর্লভ গুণ। আমাদের নেতৃবর্গের বাক্যাবলী যা শুনি, কার্যাবলী যা দেখি, তাতে মনে হয় না তাঁদের চিন্তায় ভাবনায় ক্রিয়াকলাপে ইমাজিনেশানের কোনো স্থান আছে। নেহরু এবং ইন্দিরা যে অগণিত মানুষের চিত্ত জয় করেছিলেন তার মূলে আছে তাঁদের লাইভলি ইমাজিনেশন। ওই জিনিসের ছোঁয়াচ যিনি পেয়েছেন তাঁর সকল চিন্তা, সকল বাক্য, সকল কর্ম বর্ণসুষমায় সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। এই যে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব—আজকাল যাকে বলা হচ্ছে ক্যারিসমা, আমি তাকে বলি ব্যক্তিগত প্রতিভা। এদিক থেকে নেহরু এবং ইন্দিরা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিত্বের মহিমা শুধু যে দেশবাসীকেই মুগ্ধ করেছে এমন নয়, বিশ্ববাসীকে বিস্মিত অভিভূত করেছে।

এদেশী বিরোধী রাজনীতি

রাজনীতিতে বিরোধিতা থাকবেই। থাকা উচিতও, তাতে শাসকগোষ্ঠীর ভুলভ্রান্তি সংশোধনে সহায়তা হয়। কিন্তু আমাদের বিরোধী রাজনীতির কোনো চরিত্রবৈশিষ্ট্য এখনও গড়ে ওঠে নি। এরও মূলে ওই ইমাজিনেশনের অভাব। আদিকান্ড থেকে আজকের এই লঙ্কাকান্ড পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। বিরোধের ভূমিকা নিয়েই রাজনীতির জন্ম। বলা বাহুল্য, বিরোধ বলতে বোঝাত বিদেশী রাজের সঙ্গে দেশবাসীর বিরোধ। কংগ্রেস ছিল সর্বভারতের মুখপাত্র, সমগ্র দেশের হয়ে সে-ই কথা বলত। কংগ্রেস যখন উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল ইংরেজ তখন মুসলমানদের কানে জপাতে লাগল—কংগ্রেসটা জাতে ধর্মে হিন্দু, তোমরা কেন ওখানে গিয়ে জুটেছ। খাঁটি ইসলামি মতে একটা আলাদা সংস্থা গড়ে নিলেই হয়। মুসলিম সম্প্রদায় বিনা বাক্যে টোপটি গিলে নিল। জন্ম হল মুসলিম লীগের—ইংরেজের পরামর্শে পৃষ্ঠপোষকতায়। আজকে দেশে বিরোধী রাজনীতির যে নমুনা আমরা দেখছি সেই প্রথম তার জন্ম হল। কারণ বিরোধটা বিদেশী রাজ ইংরেজের সঙ্গে নয়, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সঙ্গে। ক্রমে দেশে বহু দলের উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু সেই পুরোনো ট্র্যাডিশনটি থেকে গিয়েছে। সকল দলই কংগ্রেস-বিরোধী, যখন ইংরেজ শাসন চলছিল তখনও। মুসলিম লীগের দেখাদেখি সকল দলেরই মূল নীতি হল—কংগ্রেস যা করবে ঠিক তার উলটোটি করতে হবে। যে-কোনো ব্যাপারে কংগ্রেস যদি বলেছে 'না', বিরোধী দল বলেছে 'হাঁ' : আর কংগ্রেস 'হাঁ' বললে বিরোধীরা 'না'। বিরোধী রাজনীতিকে একেবারে জলবৎ তরল করে নেওয়া হয়েছে। ভাবনাচিন্তাটা করতে হয়েছে কংগ্রেসকে, অন্যদের ভাবনাচিন্তার বালাই ছিল না। সব ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করেছে কংগ্রেস সিদ্ধান্তের উপর। সেজন্যে এসব দল কোনো দিনই ঠিক সাবালক হয়ে উঠতে পারে নি। যেখানে কল্পনাশক্তির চর্চা বা প্রয়োগ নেই, মন সেখানে ঘুমন্ত। ফলে, এঁদের কার্যকলাপ অনেক সময়েই খুব হাস্যকর হয়েছে। কংগ্রেস যখন 'কুইট ইন্ডিয়া' সংগ্রামে লিপ্ত আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি তখন ইংরেজ সরকারের

দোস্ত। দেশবিভাগের দাবিতেও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। ওই সূত্রে আরেকটি উপসর্গ দেখা দিল—পাকিস্তানের দাবিতে দেশব্যাপী ভায়লেনস। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ভায়লেনসের স্থান ছিল না। 'লড়কে লেঙ্গে' ধ্বনি তুলে রক্তমাখা দেশের একাংশ নিয়ে অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেল। কিন্তু 'লড়কে লেঙ্গে'র লেজুড়টি রেখে গিয়েছে। দ্য স্টিঙ ইজ ইন দ্য টেল। এখন পর্যন্ত সবকটি দলেরই একমাত্র নীতি এবং আদর্শ হয়েছে—লড়কে লেঙ্গে। এ ব্যাপারে সকলে সমান হাত পাকিয়েছে, কংগ্রেসও বাদ যায় নি।

আমাদের বিরোধী রাজনীতির কৌতুকটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিরোধের ভূমিকা যে পালন করবে তাকে ভাবতে হবে বিরোধটা কার সঙ্গে ; অর্থাৎ শত্রুমিত্রজ্ঞান থাকাটা প্রয়োজন। বিদেশী শাসন যখন চলছিল তখন ইংরেজদের সঙ্গে এদের বিরোধ ছিল না। স্বদেশী অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু কংগ্রেস-বিরোধী কর্মকাণ্ড পূর্ববৎ চলতে লাগল। ইমাজিনেশানের অভাবে দেশী-বিদেশী কারোরই স্বরূপ চেনা এদের সাধ্যে কুলোয় নি। ইংরেজ দেশ ছেড়ে গিয়েছে কিন্তু তার বৈরীভাব যে যায় নি বি বি সির প্রচারকার্যেই তার প্রমাণ। আমাদের বিরোধী রাজনীতি এসব ব্যাপারে নির্বিকার। আমেরিকার দুরভিসন্ধি বোঝা কিছুই কঠিন নয় কিন্তু কোনো কোনো দলের অভিযোগ, ভারতসরকার এখন অকৃত্রিম মিত্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। চীন ভারত আক্রমণ করল, দুটি একটি দল চীনের সমর্থনে ভারত-বিরোধী প্রচার শুরু করে দিলে। এই হল বিরোধী দলসমূহের পররাষ্ট্রনীতি। স্বরাষ্ট্রনীতি আরোই বিচিত্র। আঞ্চলিকতা- বিচ্ছিন্নতা ধর্মান্ধতা -উদ্ভূত যে কোনো দাবি—ন্যায় হোক অন্যায় হোক, সংগত হোক অসংগত হোক, বিরোধী নেতাদের সমর্থন লাভ করছে। দেশশুদ্ধ লোক বেশ ভালো করেই বুঝে নিয়েছে যে দলগত স্বার্থের খাতিরে যে-কোনো ঘৃণ্য কাজেরও সমর্থন এঁদের কাছে পাওয়া যাবে। এরই ফলে আজ দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা।

আজ ক বছর ধরে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা এবং বিবৃতি মারফত যে কী-পরিমাণ বিষোদ্গার করেছেন তা বলার নয়। আমাদের সংবাদপত্রসমূহও কিছু কম করে নি। সমস্ত আবহাওয়াটাই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আকালি আন্দোলন বা খালিস্তান আন্দোলনে যে পূর্বেকার সেই 'লড়কে লেঙ্গে'র পুনরভিনয় হতে চলেছে, নেতৃবর্গ এবং সাংবাদিক মহল তা দেখেও দেখেন নি। এই সেদিন কলকাতার এসপ্লানেডে শিখরা যখন অগ্ন্যুদ্গিরণ করছিল আমাদের বামপন্থী নেতারা তখন তাদের সঙ্গে গিয়ে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আজ তাঁরা ইন্দিরাহত্যাকাণ্ডের নিন্দা করছেন, কিন্তু সাধু উক্তি আর কি তাঁদের মুখে শোভা পায়?

যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে কোনো অঘটন ঘটাই অসম্ভব ছিল না। আশা করা গিয়েছিল, এরূপ ঘটনার পরে দেশের সম্বিৎ ফিরে আসবে। তারও লক্ষণ নেই। বোঝা উচিত ছিল যে ক্ষুদ্র দল ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ক্ষুদ্র চিন্তার ফলেই এই মহতী বিনষ্টি। নেতৃবর্গ নিজ নিজ দল নিয়ে এত ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাববার সময়ই তাঁদের নেই। শুধু সময় নয়, শক্তিও নেই। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাঁদের চিন্তার জগৎটাই এত সংকীর্ণ যে গোটা দেশ এবং জাতির কথা ভাববার শক্তি তাঁদের লোপ পেয়েছে। দেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বের কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না। নেতৃত্বের সেই স্ট্যাচার ইন্দিরার সঙ্গেই লোপ পেয়ে গেল। আগেই বলেছি, ইমাজিনেশানের অভাবে আমাদের বিরোধী নেতারা নিজেদের কোনো ইমেজ গড়ে তুলতে পারেন নি। তার চাইতেও শোচনীয় ব্যাপার যে পৃথিবীর চোখে দেশের ইমেজটিও নষ্ট করে দিচ্ছেন।

সব কটি বিরোধী দলই বলতে গেলে সাম্প্রদায়িক। নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। কেউ তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতা, কেউ জাঠ সম্প্রদায়ের, কেউ আকালি শিখদের, কেউ তেলুগুভাষীদের, কেউ বা অসমীয়াভাষীদের। মুসলিম লীগ তো পূর্বাবধিই ছিল। এমন যে কমিউনিজম—যার দেশভেদ নেই, জাতিভেদ নেই, সর্বমানবের কল্যাণকামী আদর্শ—আমাদের দেশের হাওয়ার গুণে সে জিনিসেরও কী দশাই যে হয়েছে! আমাদের কমরেডদের বাক্যাবলী শুনলে, কার্যাবলী দেখলে মনে হবে এটিও একটি ধর্মান্ধ সম্প্রদায়।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আজ দেশব্যাপী যে হিংসার আগুন জ্বলছে—যার পরিণামে ইন্দিরানিধন—তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। পানজাবের ব্যাপারে প্রতি পদে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে যতখানি দোষ চাপানো হয়েছে তার শতাংশের একাংশ করা হয় নি আকালি নেতৃত্বের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে এবং ততোধিক আপত্তিকর স্বর্ণমন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধর্মস্থানকে অস্ত্রাগারে পরিণত করবার মতো অপরাধমূলক কার্যের বিরুদ্ধে। বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ যদি দেশের সংহতিনাশক কার্যাবলীর অকপটে নিন্দা করতেন, সুস্পষ্ট ভাষায় যদি ব্যক্ত করতেন যে এরূপ দেশদ্রোহী কার্যাবলী বরদাস্ত করা হবে না, তাহলে ব্যাপার এতখানি গড়াত না। যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে শুধু শিখ সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করলেই চলবে না। বিরোধী দল এবং সংবাদপত্রসমূহ একই অপরাধে অপরাধী। দেশদ্রোহী কার্যে বাধা না দিলে প্রকারান্তরে তাকে উশকানি দেওয়া হয়। আমরা যারা রাজনীতি থেকে দূরে, নীরব দর্শকমাত্র—আমারাও অপরাধমুক্ত নই। আমাদের ঔদাসীন্যও অন্যায়কে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছে। এ ঘটনার জন্যে সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ দায়ী। "ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত। এ আমার এ তোমার পাপ।"

সকল দেশেই বিরোধী রাজনীতি এবং সংবাদপত্রের বিশেষ একটি ভূমিকা আছে। শাসককর্তৃপক্ষের ভুলভ্রান্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত রাখা তাদের প্রধান কর্তব্য। এই কারণে দুটিকেই শক্তির উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সমস্তই উলটো। শক্তির উৎস দুটি সারাক্ষণ দেশের শক্তিক্ষয়কারী কার্যে লিপ্ত। দেশে সমস্যার নেই অন্ত ; সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছেড়ে নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে বিরোধী ভূমিকা পালন করা হচ্ছে। শাসককর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য। সে উদ্দেশ্যে সারা দেশে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার আবহাওয়া অবিরাম সৃষ্টি করে রাখা হয়। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি এই যে, দেশের যুবশক্তি ক্রমাগত সেই উত্তেজনার ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। উত্তেজনা কোনো কাজের পক্ষেই অনুকূল নয়। উত্তেজনা প্রশমিত হলে তবে কাজে মতি আসে। সময় এবং শক্তির অপচয় মর্মান্তিক।

সব কটি দলই শাসনক্ষমতাধীন কংগ্রেস দলের বিরোধী। কিন্তু মজার কথা এই যে, বিরোধী মনোভাব এদের মধ্যে এতই মজ্জাগত যে এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরোধী। বিরোধ যদি স্বভাবগত হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আর কোনোমতেই একের সঙ্গে অপরকে একসূত্রে বাঁধা যায় না। একবার যখন সে চেষ্টা হয়েছিল তার হাস্যকর পরিণাম আমরা দেখেছি। অতিশয় ক্ষীণপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী জনতা সরকারের কাহিনীটি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি কমিক ইন্টারলিউড হিসাবে বহুকাল লোকের স্মরণে থাকবে। এছাড়া জনতা সরকার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছেন তাতেই নিজেদের সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। মানীর মান যাঁরা রাখতে জানেন না তাঁরা কারো কাছে সম্মান পাবার যোগ্য নন। সুসভ্য দেশের রাজনীতিতে—শত্রুতার বেলায়ও—উভয় পক্ষ ডিগনিটি রক্ষা করে চলেন। আমাদের অপজিশান নেতৃবৃন্দ নিজেদের পজিশান রক্ষা করতে পারেন নি। নিজেরাই নিজেদের অপদস্থ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস যেখানে বিরোধীর ভূমিকায় সেখানে তার ব্যবহারও ডিগনিটি-সম্মত নয়।

একমাত্র কংগ্রেসই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বাকি সমস্ত দলই আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ডিগনিটি রক্ষার দায়িত্ব কংগ্রেসেরই সর্বাধিক। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে তাকেই। কংগ্রেসের শতবর্ষ পূর্ণ হল। দেশবাসীকে আবার নতুন করে কংগ্রেস আদর্শে দীক্ষিত হতে হবে। কংগ্রেসের রাজনীতিতে হিংসার কোন স্থান নেই। ইংরেজ যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতির প্রয়োগ করেছে, অকথ্য অত্যাচার করেছে, তখনও সে ফিরে আঘাত করে নি। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছে বিপুল বিক্রমে—বাহুবলে নয়, মনোবলে। সে মনোবল আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। শত প্ররোচনা সত্ত্বেও সে হিংসার আশ্রয় নেবে না। হিংসার রাজনীতি দেশের সমস্ত মানুষকে হিংস্র করে তুলেছে। ভারতীয় রাজনীতির এমন পরাভব আগে কখনো ঘটে নি। সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটেছিল আততায়ীর হাতে। সেদিনের সেই প্রচণ্ড আঘাতেও দেশবাসী ছিল ধীর স্থির শান্ত। ইন্দিরা গান্ধীরও দেহান্ত হয়েছে একইভাবে আততায়ীর অস্ত্রে। কিন্তু তার পরে দেশের নানা স্থানে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে একদল অপর দলের প্রতি দোষারোপ করছে। বাস্তবিক পক্ষে দেশের সব কটি দলই সমান দোষী। কারণ কম করেও গত দুই দশক

যাবৎ প্রত্যেকটি দলই হিংসাত্মক কাজে তালিম নিয়েছে। জ্বালানো পোড়ানো, গুলিবোমা, খুনখারাবি—এ সবই ছিল দেশসেবার প্রধান অঙ্গ এবং এ সমস্তই ঘটছিল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, আকালি দল এবং শিখ উগ্রপন্থীরা যা করেছে তার একমাত্র নাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কিন্তু পরোক্ষভাবে তারও সমর্থন মিলেছে বিরোধী দলসমূহের কাছে। এখন একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেশের লোককে কি আর ভোলানো যাবে? দেশের নেতৃবর্গকে—কংগ্রেসী অ-কংগ্রেসী সকলকেই—তারা বিলক্ষণ চিনে নিয়েছে।

রাজনৈতিক জীবনে অধোগতি, সামাজিক জীবনে ইতরতা

রাজনৈতিক জীবনে অধোগতির সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনেও এক ধরনের ইতরতা দেখা দিয়েছে। আচারে ব্যবহারে কার্যকলাপে তো বটেই, এমনকি আমাদের ভাষাতেও সেই ইতরতার ছোঁয়াচ লেগেছে। আজকাল লোকমুখে শুনি, খবরের কাগজেও দেখি—এক দল আরেক দলের উপর 'বদলা' নিয়েছে। বছর কুড়ি আগেও এ ভাষা ভদ্রসমাজে আমরা শুনি নি, ছাপার অক্ষরেও দেখি নি। এই 'বদলা নেওয়া' যে কী ভয়ংকর ব্যাপার, সে তো এখন নিত্যই দেখতে পাচ্ছেন। একে ইতরতা বললে কমিয়ে বলা হয়। ভাষাটা ইতরের কাজটা বর্বরের। এই রাজনৈতিক যথেচ্ছাচারকে রোধ না করলে আমাদের অচিরে বর্বর আখ্যা লাভ করতে হবে।

রোধ করবে কে? করবে কংগ্রেস। শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে, সে বয়োজ্যেষ্ঠ। একমাত্র সর্বভারতীয় দল এবং বৃহত্তম দল, সে গুরুজনসদৃশ। দায়িত্ব তারই সর্বাধিক। দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে তাকেই। দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা-বিরোধীরা তাঁর প্রতি হিংসাপ্রসূত যে ঘৃণ্য আচরণ করেছিলেন, অচিরে ক্ষমতায় ফিরে এসে ইন্দিরা কি তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিলেন? কিছুই করেন নি। ভোট-যুদ্ধে যে জয়লাভ করেছিলেন তার চাইতে শতগুণে বড়ো জয় বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুর প্রতি তাঁর নির্বিকার ঔদাসীন্য। বিপক্ষের আক্রোশকে তিনি উপেক্ষার দ্বারা জয় করেছেন।

সকল দলই দেশোদ্ধার এবং দেশসেবার দাবি করে—ভিন্ন ভিন্ন মতে, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। সে দাবি স্বীকার করে নিয়েও বলব—অযোধ্যা এবং কিষ্কিন্ধ্যা দু-ই সীতা উদ্ধারে ব্রতী ছিল, তাহলেও অযোধ্যা এবং কিষ্কিন্ধ্যা এক নয়। প্রবীণতম এবং প্রধানতম দল হিসাবে কংগ্রেসের আসন অনেক উচ্চে। সেই আসনের মর্যাদা তাকে রক্ষা করতে হবে। অন্যান্য দলের মতো ব্যবহার করলে চলবে না। ইফ দি সল্ট হ্যাভ লস্ট হিজ স্যাভর হোয়ারউইথ স্যাল ইট বি সলটেড?

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে আমাদের রাজনীতির খুব একটা মিল নেই। ভারতীয় জীবন নীরব নিথর নিরুদ্যম, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি যেমন উচ্চকণ্ঠ তেমনি উদ্দাম। গলাবাজি এবং গুণ্ডা-বাজি করেই বাজিমাত করতে চায়। শুধু হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির কথাই বলছি না। নিরীহ নির্বিরোধ ব্যাপারেও মাত্রাজ্ঞান থাকে না। খুব হালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু যতই শোকাবহ হোক, তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে নগরে নগরে শোকযাত্রার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোনো ব্যাপারেই আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নয়। নাটকীয়তা ইন্দিরার স্বভাবগত ছিল না ; ভক্তরা সে কথাটি স্মরণ রাখলে ভালো করতেন। ইন্দিরা হিমালয়কে ভালোবাসতেন, তাকে তিনি শক্তির উৎস হিসাবে দেখতেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহাবশেষ হিম-গিরির শিখরে-শিখরে ছড়িয়ে দেওয়াই যথাযথ এবং যথেষ্ট ছিল।

রাজনীতি জিনিসটা কাজে কর্মে, বাক্যে ব্যবহারে একটু কাটখোট্টা স্বভাবের। গরম কথা যতখানি বলে, নরম কথা ততখানি নয়। যেমন বাক্যবাগীশ তেমনি ব্যস্তবাগীশ ভাব। কিন্তু জহরলাল এবং ইন্দিরাকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে শান্তিনিকেতনে। দেখেছি শত কাজের মধ্যেও দিব্যি একটি রিল্যাক্সড ভাব। চলনে বলনে, হাসিতে খুশিতে, আচারে আচরণে, সৌজন্যে সৌহার্দে চতুর্দিকে মাধুর্য বিকীর্ণ হত। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা শুধু দর্শনে নয়, মধুর ভাষণে সকলের মনোহরণ করতেন।

ইন্দিরার ব্যক্তিগত প্রতিভা

নেহরু ছিলেন কবিপ্রকৃতির মানুষ। তাঁর সকল চিন্তায় কথায় কর্মে, এমন কি রাজনৈতিক মতামতে এবং পলিসি বিশ্লেষণেও তাঁর কবিমনের ছাপ পড়ত। এদিক থেকে

তিনি অপরাপর রাষ্ট্রনায়কদের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন জাতের মানুষ ছিলেন। কন্যা ইন্দিরা পিতার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি অভিরুচি-জাত নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হয়েও কোনো কোনো ব্যাপারে একেবারেই ভিন্নভাবাপন্ন ছিলেন। নেহরুর মন চিন্তামুখীন, ইন্দিরার কর্মমুখীন। জহরলালের মনের ফ্লেক্সিবিলিটি যতখানি ইন্দিরার মনের ততখানি নয়। নেহরুর প্রধান সহায় তাঁর ইমাজিনেশান, ইন্দিরার ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর ইনস্টিঙকট। অনেক সময়েই ইনস্টিঙকট তাঁকে অভ্রান্ত পথের নির্দেশ দিয়েছে। সমস্তটা মিলিয়ে বলতে বাধা নেই যে, পিতার চাইতে কন্যা অনেক কঠিন ধাতুতে গড়া। নেহরুকে ঘরে বাইরে যতখানি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ইন্দিরাকে সইতে হয়েছে তার শতগুণ বেশি। এরই তাড়নায় তিনি তৈরি হয়েছেন। বাধাবিঘ্নের নিত্য-নিঠুর-দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্তের একাগ্রতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা ক্রমেই বেড়েছে। তাঁর কোনো কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্মপ্রণালী দেখে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে গান্ধীযুগে দেশে যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই ইন্দিরার সাদৃশ্য সবচাইতে বেশি। এমন দুর্জয় সাহস, এমন অমিত তেজ, মৃত্যুর প্রতি এমন উদ্ধত ঔদাসীন্য আর কোথায় দেখেছি? নেতৃবৃন্দের মধ্যে—গান্ধী সুভাষ ইন্দিরা—এই তিনজনই নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন।

ইন্দিরা বজ্রের ন্যায় কঠিন হতে জানতেন। কবিত্ব করে বলব না যে, কুসুমের ন্যায় কোমলও হতে পারতেন। তবে একথা অবশ্যই বলব যে ললিতে কঠোরে বিপরীতের সমন্বয়ে এক অসামান্য চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ছাপ পড়েছে ছোটো-বড়ো সকল কাজে। বক্তৃতামঞ্চে, প্রেস কনফারেন্সে, নানাবিধ বাচনে ভাষণে, সাধারণ কথাবার্তায়, হাস্যে পরিহাসে লক্ষ করা যেত পিতার ন্যায় কন্যার স্বভাবেও একটি লিরিকাল এলিমেনট ছিল। এরই কল্যাণে প্রিয় অপ্রিয় সহস্র কাজের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেও স্বভাবমাধুর্যটি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। একটু আগে পলিটিকসের স্বভাবটাকে বলেছিলাম কাটখোট্টা। নেহরু এবং ইন্দিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে পলিটিকসও সৌন্দর্য-মাধুর্য-বিরহিত নয়।

খুব উঁচু দরের শিক্ষা সংস্কৃতি মনে মজ্জায় লেগে গেলে, রক্তধারায় প্রবাহিত থাকলে তবেই মনের এই লাবণ্য বা পারসনাল চারম-এর অধিকারী হওয়া যায়। আজকাল যাকে বলা হয় ক্যারিসমা, আমি তাকে বলি ব্যক্তিগত প্রতিভা। এ অতি দুর্লভ বস্তু, তাই বলে বিধিদত্ত নয়, নিজগুণে আয়ত্ত। এ মনের গড়ন অভি-নব। বহু দর্শনে, বহু শ্রবণে, বহু মনস্বীর সংস্পর্শে এসে, সান্নিধানে থেকে এঁর মনে প্রচুর পলিসঞ্চয় হয়েছে। ওই পলির গুণে মনটি যে উর্বরতা লাভ করেছে তারই ফলে মাটি হয়েছে সৃজনশীল। বহুমুখী তার শক্তি, অতি বর্ণাঢ্য তার দীপ্তি। ওই বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বটিকেই বলা হয় ক্যারিসমা—জনগণের হৃদয়জয়ী মনের এক মহিমান্বিত রূপ।

বালিকা-বয়স থেকে ইন্দিরা যে জীবনের শরিক হয়েছেন, যেসব মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যে চিন্তাজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, যে কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখেছেন, যাতে যোগদান করেছেন, তার চাইতে বড়ো শিক্ষা আর কী হতে পারে? এক সময়ে পণ্ডিত মোতিলালের গৃহ আনন্দভবন ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ওই গৃহ তিনি কংগ্রেসকে দান করেছিলেন। আনন্দভবন হয়েছিল কংগ্রেস ভবন। বালিকা ইন্দিরার কাছে আনন্দভবন ছিল ভারতবর্ষের প্রতীক। গোরা যেমন আনন্দময়ীকে বলেছিল—মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ, ইন্দিরা তেমনি আনন্দভবনকে বলেছেন—তুমিই আমার ভারতমাতা। বড়ো হয়ে পিতার সঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন—বলা যেতে পারে বিশ্বরূপদর্শন। এ শিক্ষা, এ বিদ্যা, এ শক্তি পুথি-পড়া বিদ্যা দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

আনন্দমঠ এবং আনন্দভবনের উল্লেখ করে কথা শুরু করেছিলাম। সেখানেই আবার ফিরে আসছি। আনন্দমঠ দিয়েছে একটি মন্ত্র—বন্দে মাতরম—দেশমাতার বন্দনা-গীত ; আনন্দভবন দিয়েছে একটি ব্রত—দেশমাতার সেবাব্রত। মন্ত্র উচ্চারণের চাইতে ব্রত উদ্‌যাপন বড়ো কথা। আনন্দভবনের তিন পুরুষ যে ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন এবং যেভাবে করেছেন, সারা দেশে তার কি তুলনা আছে? কিছুকাল ধরেই ডাইনাস্টিক প্রশ্ন নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে। বক্তৃতায় বিবৃতিতে সংবাদ-

পত্রের পাতায় প্রচুর বিষোদ্গার হয়েছে। এটা আমাদের স্বদেশী কালচার। কারো শ্রীবৃদ্ধি আমরা সইতে পারি নে। যাক, এ-জাতীয় তর্কে আমার রুচি নেই। কে বা রাজা হৈল, কে বা মন্ত্রিবর, তাই নিয়ে মাথা ঘামাই না। ডাইনাসটিক রুল এযুগের রেওয়াজ নয়, তাও জানি। কিন্তু বাকবিতণ্ডার তীব্রতা দেখে বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। মনে প্রশ্ন জেগেছে—যাকে আমরা বংশের ধারা বলি, সে কি একেবারেই ফ্যালনা জিনিস? বিশেষ ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা-জীবনচর্চার ফলে, পরিবেশ-পরিমণ্ডলের প্রভাবে কোনো কোনো পরিবারে বিশেষ কোনো শক্তির উন্মেষ ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়। দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই। জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে—দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ—চার পুরুষ ধরে অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার শোভাযাত্রা। এলাহাবাদের আনন্দভবনে—মোতিলাল জহরলাল ইন্দিরা—তিন পুরুষে ত্যাগে বীর্যে সর্বস্বপণে জীবনদানে দেশপ্রেমের মহাকাব্য রচিত হল। জানি, সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়, বংশগরিমাও নয়। শক্তি একদিন নিঃশেষ হয়ে আসে, প্রতিভার শিখাটি নিবে যায়। কিন্তু যতদিন থাকে ততদিন তার যথোচিত সমাদর করাই জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। ক্ষমতাকে ভয় করে অক্ষমেরা। দুঃখের সংগে লক্ষ করেছি, আমাদের নেতৃবর্গ ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন নি। তাঁরা ইন্দিরার ক্ষমতাকে চ্যালেনজ করেন নি, রিজেনট করেছেন। সংবাদপত্রসমূহও ন্যায্য সমালোচনা যতটুকু করেছে, তার চাইতে ঝাল ঝেড়েছে বেশি। সাংবাদিকতার পক্ষে সেটা বড়ো গৌরবের কথা নয়।

এক সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর স্তাবকেরা বলতেন—ইন্দিরা ইজ ইনডিয়া। শুনে শত্রু মিত্র সকলেই হেসেছিলেন। কিন্তু পরে ব্যাপারটা আরোই বেশি হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। কারণ যাঁরা সবচেয়ে বেশি হেসেছিলেন সেইসব বিরোধী নেতা এবং তাঁদের সমর্থক সাংবাদিকবৃন্দ ক্রমে ইন্দিরানিন্দায় এমন মুখর হয়ে উঠলেন যে নেতাদের মুখে ইন্দিরা ছাড়া কথা নেই, খবরের কাগজে ইন্দিরা ছাড়া খবর নেই। সত্যি বলতে কি, গত এক দশক ধরে আমাদের নেতারা রীতিমতো ইন্দিরা-অবসেশন-এ ভুগেছেন। কানু ছাড়া কীর্তন নাই, ইন্দিরা ছাড়া পলিটিকস নাই। অর্থাৎ ইন্দিরা-স্তাবকরা যা করতে পারেন নি, ইন্দিরা-নিন্দুকরাই তা করে দিলেন, কার্যত প্রমাণ করে দিলেন যে ইন্দিরা ইজ ইনডিয়া। আমাদের অপোজিশান পলিটিকসের এই আয়রনিটি যথার্থই উপভোগ্য।

ইন্দিরা গান্ধীর অসামান্য ব্যক্তিত্ব সমগ্র দেশকে যেমন অভিভূত করেছিল, তেমনি সমস্ত পৃথিবীকেই সচকিত রেখেছিল। দেশসুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি একজনের উপরে নিবদ্ধ। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একরকম ঢাকাই পড়ে গিয়েছিলেন। ইন্দিরা চলে গিয়ে অনেক মানুষের, অনেক জিনিসের, অনেক ব্যাপারের মুখোশ খুলে দিয়ে গিয়েছেন। দেশের অনেক দীনতা দুর্বলতা—অনেক ক্ষতস্থান চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। মুখোশ খুলে যাওয়াতে এখন সকলেরই স্বরূপ চেনা যাবে। শিখ শৌর্যবীর্যের কত না কাহিনী আমরা শুনেছিলাম, আজ সেই শৌর্যের ইতিহাস ধুলায় লুণ্ঠিত। পাঁচশ বছর ধরে যে শৌর্যবীর্যের ইতিহাস রচিত হয়েছিল, আজকের এই কাপুরুষতার কলঙ্ক ঘোচাতে আবার পাঁচশ বছর লেগে যাবে। কারণ শিখরা কত বড়ো গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা তারা বুঝতে পারে নি।

ইন্দিরার মৃত্যু প্রকৃত বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু। বহুসমর-বিজয়িনী ইন্দিরা সম্মুখসমরে প্রাণ দিয়েছেন। এরূপ মৃত্যুতে শোক শোভা পায় না। দুঃখ দেশের জন্যে। এক মহা জীবননাট্যের অবসান হল। নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে দেশবাসী আমরা সকলেই সেই জীবননাট্যের কুশীলব। কিন্তু দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও ইন্দিরার ভূমিকা সেখানে যতখানি গৌরবের, আমাদের ভূমিকা ততখানি কলঙ্কের। সকলে যখন ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র কলহে ব্যাপৃত, ভারতমাতার একনিষ্ঠা সেবিকা ইন্দিরা তখন দেশসেবায় নিরত। বিরোধীরা যখন নিন্দায় মুখর, ইন্দিরা তখন কর্মে তৎপর। নির্গুণের নিন্দাই প্রকৃত গুণীর জয়ধ্বনি। কবির ভাষায় —'নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ, এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।' দেহরক্ষীর হস্তে নিহত—যেমন নাটকীয় তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ ; সিমবলিক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত নিদর্শন। শিখ তাঁকে শত্রুজ্ঞান করেছে, তিনি শিখকে মিত্রজ্ঞানে আপন রক্ষিরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি কারো প্রতি বিশ্বাস হারান নি, শিখ তাঁর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শুধু শিখ নয়, সমস্ত দেশবাসী।

সার্থক জীবন, সার্থক মৃত্যু। জীবনদেবতা বলে, আমি ধন্য—এমন পরিপূর্ণ জীবন, এমন প্রাণবন্ত মানুষ, এমন অফুরন্ত শক্তির নেতা চোখে দেখলাম! মৃত্যুর দেবতা বলে—আমি ধন্য, শুধু মৃতদেহ দেখে-দেখে আমি ক্লান্ত ; এমন তপ্ত রক্ত নিয়ে এমন মৃত্যুহীন প্রাণ কবে কোথায় কটি এসেছে আমার কাছে? আমরাও ধন্য —দেখলাম এক মহান জীবন এবং মহত্তর এক মৃত্যু।

আমাদের ভূখণ্ড আজ

রত্নেশ্বর হাজরা

আজ সারাদিন ধরে আমাদের ভূখণ্ড ভীষণ
পরিতৃপ্ত ছিল
সে-তৃপ্তি ছড়ানো ছিল   ঘন ছিল   কোথাও বা
আভাসের মতো হয়ে ছিল—
কয়েকটা গাংচিল উড়ে এসেছিল প্রণালী পেরিয়ে এই দিকে
তাদের ঠোঁটের পাশে তৃপ্তি লেগেছিল   কিছু
বিশ্রামের মতো ছায়া   বিরামের মতো চিহ্ন   ক্ষমা
স্পষ্ট লেগেছিল। আমাদের
বিস্ময়সূচক চিহ্ন মুছে গিয়েছিল কিছু অনুভূতি থেকে—

আজ খুব ভোরে ছিল হিম   বেলায় রোদ্দুর—আর
অপরাহ্ণ এসেছিল স্বাভাবিক বয়স্কের মতো
অপমৃত্যু ছিল না কোথাও
মৃত্যু নিয়ে প্রশ্নও ছিল না
আজ যারা জন্মেছে তাদের জন্মে অহমিকা ছিল
তিথি ও নক্ষত্র খুব পরিচ্ছন্ন ছিল   আজ
ভুলত্রুটি সামান্যই করেছে মানুষ
দুঃখ ছিল সহ্যের সীমায়—সুখ তাই
শোকেরাও তাই   মানুষের
সব লোকালয় জুড়ে হেঁটে বেড়িয়েছে এক
শ্রমণের মতো উদারতা—

আজ আমাদের
ভূখণ্ড হয়তো বা এমনি সত্যিই বদলাতে চেয়েছিল—

অলৌকিক আশার মোজেস

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

আমরা তো একদিন পত্রালির সবুজ যৌবন-ঘেরা প্রান্তরে ছিলাম,
পাতার মুকুট পরে তরুতলে আমরা সেজেছি রাজা, আর
কতদিন মেঘলোকে ঝড় তুলে গোষ্ঠে ফিরেছি।
ঝরনার প্রমত্ত জলে হাঁটু গেড়ে গিলেছি পিপাসা,
নগর পোড়ালে তারা আমরা তো আপন পিতাকে
ঈনিসের মতো দীপ্র কাঁধে তুলে হেঁটে গেছি ভূমধ্যসাগর—
কার্থেজ করিন্থ কিংবা যমুনার তীরে বেণুবন
নখের দর্পণে ছিল, মাছেরা যেমন
নীল তৃষ্ণা খুঁজে ফেরে অবারিত জলের শরীরে
আমরা তেমনি শুধু জীবনের সানুদেশে বিম্বফল প্রশান্তি খুঁজেছি।

আমরা তো বানিয়েছি আশার বল্মীক, চারদিকে শত্রু ছিল
ক্ষুধার ভ্রূকুটি ছিল, এবং হননপ্রিয় রাজার ক্রোধের—
ভালোই ছিলাম তবু, ক্ষুদ্র কীট কবে চায় অনন্ত আকাশ ?
তুমি কেন আমাদের ডাকলে পথিক ?
অঙ্গীকৃত ফসলের ভূমি, নীল দরিয়ার পারে অন্য কোনো মানচিত্র
দোলালে সম্মুখে কেন, কেন স্থির ফলের আশ্বাস
ক্ষুধার্ত চোখের তীরে উত্তরঙ্গ করলে মোজেস।
দুগ্ধবতী গাভী ছেড়ে, উঠোনের বেড়ে ওঠা সযত্ন আনাজ
তুলে ফেলে মূলসুদ্ধ পুনর্বার ঝোলাঝুলি তুলে নিতে হল।
তোমার 'আশায়' নাকি আশা ঝলকায় দুর্নিবার,
ভূমিতলে ফেলে দিলে হয়ে যায় সাপ—
জানি সেই সরীসৃপ গিলবে কেবল আমাদের
যৌবন, বুকের নম্র বিশ্বাসের জ্বলজ্বলে আলো।

এ কোন অচেনা দেশ, সম্মুখে তো সম্পন্ন বসতি নেই কোনো।
উচ্ছৃঙ্খল অনিয়ম মাথা তোলে ফের,
আমাদের ভাই মাটি ছেনে গড়ে গো-বৎসের হারানো প্রতিমা :
জানি সে গোষ্ঠের স্মৃতি আজতক ভুলতে পারে নি।
তোমাকে এখন পেলে দেখে নেব একহাত, শুনি
তুমি নাকি কথা কও
দুর্বোধ্য প্রভুর সাথে তুরের তূরীয় শীর্ষদেশে ?
প্রস্তর-ফলকে দিলে দশটি নিষেধ, চেয়েছিলাম জীবন!

তেত্রিশ বছর কাল মরুভূমি ছুঁয়ে গেল জীবনের শুকনো তটরেখা,
বিশ্বাস মৃত্তিকা হল, উন্মুখর শস্যের আহ্বানে
এল না বৃষ্টির ধারা, তোমার প্রভুর তাপে বনভূমি পুড়ল কেবল,
আজ তুমি প্রতারক ছন্দোবন্ধ গীত গেয়ে গ্যালিলির তীরে হেঁটে যাও!

দাঁড়াও এখানে, খুলো অলৌকিক আলখাল্লা, ফেলে দাও
যষ্টির ছলনা,
আসে তো আসুক সাপ, অভিশাপ, ক্রোধান্ধ প্রভুর
আনত দুচোখ থেকে যদি নামে ধ্বংসের আয়াত
পরোয়া করি না আর, মৃত্যু তবু ফেলে যাবে প্রবুদ্ধ ফসিল,
নম্র হবে শুষ্ক মাটি, হামেন গাভীর মতো
পূর্ণ হবে মৃত্তিকার বুক,
অস্থিরা স্থির হয়ে জন্মাবে পলল ;
যমযম ফোয়ারা ফের তুঙ্গ হবে মানবিক পায়ের আঘাতে,
প্রস্তাবিত যুদিআর মাঠ পাবে ফুলের যৌবন।

হারানো পত্রালি ফের ফিরে পাব, গোষ্ঠের নির্ঘুম দ্বিপ্রহর,
লতানো আশার পুঁই ঘিরে নেবে মানবিক জীবনের ছাদ,
পাতার মুকুট পরে রাজা-রাজা খেলা দেখো পুনর্বার হবে।

আনন্দময়ী

বার্ণিক রায়

আনন্দময়ীর পুজো দেব :
সন্ধ্যার দিগন্ত লাল, মন্দিরে কালোর ঢেউ,
উজ্জ্বলতা ঘর উপচে পড়ে, শুদ্ধ আকুলতা।
একহাতে পদ্মফুল, অন্য হাতে রক্তাক্ত খর্পর,
নৃমুণ্ডে রক্তের ধারা, উদ্ধত অসুর,
স্নিগ্ধ হাসি, লোল জিহ্বা।
যে-মন্দিরে দেবীমুখ দেখছি দাঁড়িয়ে
তারই বেদীর নীচে শ্মশানের ছাই,
ভস্ম, পোড়া কাঠ, হাড়,
মানুষের শাদা অস্থি, বিচ্ছিন্ন কঙ্কাল,
গঙ্গার জলের পলি, শ্যাওলার মসৃণতা
নিবিড় প্রাণের শস্যে মাটি ছুঁয়ে আছে
এসব থেকেই আনন্দময়ীর হাসি
চতুর্দিকে উদ্‌ভাসিত ; ভক্তির ফুলের শ্বেত গন্ধ।
পুজো সেরে দেবীর প্রসাদ হাতে
তোমার মুখের হাসি এমনি দেখব বলে আমি
পথে যেই পা দিয়েছি, কলকাতা জুড়ে যানজট,
রাস্তা খোঁড়া, মাটির প্রচণ্ড ঢিবি, গর্ত, কাদা।
অন্ধকার আকাশের নক্ষত্র-আলোকে
কোথায় তলিয়ে টেনে নেয় তোমার শরীরে, দেবী হাসে॥

দুটি কবিতা

সৈয়দ সমিদুল আলম

নীল আভা

কেউ বলে নক্ষত্রের কথা।

কেউ তার গম্ভীর আলোয়, আলোর নকশায়
ছুঁয়ে থাকে সাদা পায়রার নরম পালক।

শব্দ ও আলোয় নড়ে ওঠে তির্যক শেকল
আর, বিজ্ঞানী
গাঢ় রাতের কথা ভেবে, এই পড়ন্ত বিকেলে
বুনসেন বার্নারের দিকে এগিয়ে যান

ভেসে ওঠে, বার্নারের চূড়ায় তৃপ্তিহীন আবিষ্কারের নীল আভা

রাত্রি

প্রদীপ নিভিয়ে বিছানায় যেতে ভুলে গেছে জ্যোৎস্না আকাশ
তারার ফুলের মালা, সমুদ্র এঁকেছে ওই অনন্ত রাগিণী

নিদ্রাহীন একাকিনী সমুদ্রপায়ের কাছে আয় তবে,
দেহের ফেনায় ডুবে যাক তোর ক্লেদ ও কষের মুখ!

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

গভীর সমুদ্রে সমুদ্রের চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। সুজা শুধু মাছই ধরে না, সমুদ্রের এইসব দৃশ্য তাকে মাতিয়েও রাখে। এজন্যেই সমুদ্রে থাকতে ওর কষ্ট নেই। রজব ভাত রান্না করেছে, তাজা ইলিশের গন্ধে বাতাস ম-ম-। শ্বাস নিলে খিদে চনমনিয়ে ওঠে। সব মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলেই ওরা খেতে বসবে। ট্রলারের পাশ কেটে সাঁই করে উড়ুক্কু মাছ চলে যায়। এই মাছের যাওয়া দেখতে ভালো লাগে ওর। এদের পাখনা আছে। অনেক সময় লাফ দিয়ে পানি থেকে উঠে পাখনায় ভর করে কিছু দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে চলে। এরা প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত বাতাসে ভেসে চলতে পারে।

—খাইত ন দিবি রজব?

—উকুইন্যা দির।

এখন জোয়ারের সময়। সুজা গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। সেনট মার্টিনের নারকেলগাছের মাথা সবুজ দেখায়। সমুদ্রের মাঝখানের ওই দ্বীপটা ওর বিস্ময়। কালো পাথরের মালা দিয়ে বেষ্টিত, সেই পাথরে আবার ফুল ফোটে। এই অতলান্তিক জলরাশির মধ্যে ওই দ্বীপ কিভাবে যে গড়ে উঠল তা ওর কাছে গোলক-ধাঁধার মতো লাগে। ভাবলে সেই ঘোর কিছুতেই কাটতে চায় না।

—তোঁয়ার কী হইল সুজা?

—ক্যা?

—ধ্যান করর না?

মানিক খোঁচা দেয়।

—স্রোত খেয়াল করির। দেখি জাল কোন্ দি ফেইল্যে মাছ বেশি পাওন যায়।

—উঁহু, ঠিক ন। তোঁয়ার চোখ অন্যরকম দেখায়।

সুজা মানিকের কথার উত্তর দেয় না। মানিক তোরাব আলীর ভাগনে। ওদের ওপর মাতবরি করার জন্যে আসে, অবশ্যই তোরাব আলীর নির্দেশে। বরফের ট্রলারে মাছ বিক্রির দায়িত্বও ওর। মানিক কিছু বখরা রাখে—কত সেটা জানতে দেয় না ওদের। কথাবার্তা বলার সময়ে ওদের ট্রলারে চলে যায়। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম থেকে বরফভরা ট্রলার আসে মাছ কিনতে। সুজার বুক কেমন করে ওঠে। ওদের ধরা এই মাছগুলো দেশের কোন দূরদূরান্তের লোক খাবে, ও জানে না। ওরা জানে না সুজা নামের একটা লোক পেটের দায়ে মাছ ধরে।

কিছুতেই ওর অভাব ঘোচে না। ভাত থাকলে নুন থাকে না, নুন থাকলে কাপড় থাকে না। সমুদ্র যতই ওর মন ভরাক, পেট ভরায় না। কিন্তু সমুদ্র তো হাজার-হাজার মাছ দেয়। এক-এক দিন মাছ তুলতে-তুলতে দিশেহারা হয়ে যায় ওরা। দেয় না তাহলে কে? দেয় না তোরাব আলী, যার লুঙ্গির কোঁচড় হাতড়ালে যে-কোনো সময়ে কয়েকটি পাঁচশ টাকার নোট পাওয়া যাবে। এমন অনেক দিন গেছে যে কয়েক ঘন্টায় আশি হাজার, নব্বই হাজার, এমন-কি লাখ টাকার মাছও বিক্রি হয়েছে। অথচ বর্ষার সময় শুঁটকি চাইতে গেলে তোরাব আলী একটা লইট্টার শুঁটকিও দিতে চায় না। সুজার মন খারাপ হয়ে যায়। কত দিন বাড়িছাড়া, এখন কী অবস্থা কে জানে। পটলা বড়ো হয়েছে, ওকে কাজে লাগানো দরকার। রূপার বিয়ে দিতে হবে। ওর সামনে সমুদ্র জুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। ও খেয়াল করে না যে রজব ওকে ভাত খাবার জন্যে ডাকছে। মাটির শানকি বোঝাই করে ভাত বেড়েছে বাদল। তোরাব আলী বলে, সুজা পাকা জেলে। মাছের আওয়াজ বোঝে। সুজাকে ছাড়া তার চলে না।

—সুজা ভাই, ন খাইবেন?

—দিবি না?

—ডাকি্য তো, ন হুনন তো।

সুজা পিঠ ঘুরিয়ে আসন পেতে বসে।

—রজবের হাতের ভাজা ইলিশ কী স্বাদ!

—আর উন্যা দিয়ম?

—আছে? সুজা একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে। সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে।

—হাসির কী হইয়ে? তুঁই তো জান সুজা ভাই কিছু চাইত ন পারে।

সুজা মুখ নীচু করে খায়। ওদের হাসি গায়ে মাখে না। সবার খাওয়া শেষ হলে জাল ফেলা হবে। আবার কাজ। ডাঙায় ওর একটা অভাবভরা ঘর আছে। দিন-রাতের অভাবে বউটা মারমুখী। তবু সুজার ডাঙায় ফিরতে হয়। নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারে বলেই ওদের প্রতি ভালোবাসা তীব্র। সমুদ্র যত সুন্দরই হোক, ও ডাঙায় ফিরতেই ভালোবাসে। জলের বসতির স্থায়িত্ব কই?

বদরমোকামে মাছকাটায় ব্যস্ত থাকে সালেক। তোরাব আলীর শুঁটকির ব্যবসায় এখন তুঙ্গে, সুমারে-সুমারে মাছ আসছে। নাড়িভুঁড়ি ফেলে পেটটা চিরে লবণ মাখিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে। বাতাসে মাছের গন্ধ। কখনো বুক ভরে বাতাস টেনে নিতে-নিতে সালেকের মনে হয় একদিন এই বদর-মোকামের শুঁটকির কারখানা ওর নিজের হবে। ওর হাতে মাছের তাজা রক্ত লেগে থাকে। বঁটির ওপর ওর হাত স্থির হয়ে যায়। ও স্বপ্ন দেখে, একদিন বড়োলোক হবে, শাহপরি দ্বীপের সবচেয়ে বড়ো দালানটা হবে ওর। সাগরের অনেক দূর থেকে সেই দালানের চুড়ো দেখে লোকে বলবে, সালেক মিয়া একটা বাপের বেটা। ও মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার মাছ কাটে। ফটফটে তাজা মাছগুলো কচকচিয়ে বঁটির গায়ে ফাঁক হয়ে যায়। মাছ-কাটা শেষ করতে দুপুর হয়। গোসল সেরে পাতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিজা লুঙ্গি নিঙড়ে ঘরের চালে মেলে দেয়। খেতে বসে মন খারাপ হয়ে যায়। নসু বাজে রান্না করেছে। ইলিশমাছের টুকরো লাউয়ের পাতায় মুড়ে ওর মা চমৎকার রাঁধত। এটা ওর শৈশবের স্মৃতি। মা রাঁধতে পারে না বলে এখন আর এসব খাওয়া হয় না। খুব সামান্য খাওয়া-দাওয়া, তবু যদি ভালো রান্না হত। আসলে ভালো কোনো-কিছুই ওদের জন্যে নয়। কোনোমতে খেয়ে উঠে পড়ে। খারাপ রান্নার জন্যে নসুকে বকতেও ইচ্ছে হয় না। এখন একটু ন্যাপ্পি পেলে ভালো হত। অল্প একটু টেনে কড়া ঘুম দেওয়া যেত। শুকুর ন্যাপ্পির যম। ভাত না পেলেও আপত্তি নেই, কিন্তু ন্যাপ্পি চাই। নিজে ঘরে বানায়, খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। ও ন্যাপ্পির লোভে শুকুরকে তোয়াজ করে। গুন্ডা বলে সবাই এড়িয়ে চলে বলে সালেকের অল্প তোয়াজে ও গলে যায়। মন ভালো থাকলে তো দরাজ দিল। মগ বোঝাই করে ঢেলে দেয়। ন্যাপ্পির কথা ভাবতে-ভাবতে ওর ভেতরটা ওলোটপালোট হয়ে যায়। ও হাঁটতে-হাঁটতে বদরমোকামের শেষ মাথায় আসে। নারকেলগাছের নীচে বসলে জোয়ারের জলে ওর পায়ের পাতা ভিজে যায়।

ফটফট করে যে ট্রলারটা সেনট মার্টিন চলে যাচ্ছে সেটা থেকে মালেক ওকে ডাকে আর হাত নাড়ে। সালেকও হাত ওঠায়। মালেকের জন্যে ওর করুণা হয়। সেনট মার্টিনের নামে ও পাগল। সুযোগ পেলেই ছুটবে। পূর্ণিমা-রাত হলে সারা রাত বালুর ওপর শুয়ে কাটিয়ে দেবে। আগে সালেককে সঙ্গে নিয়ে যেত, এখন আর ও যায় না। এত সব পাগলামিকে প্রশ্রয় দেবার সময় নেই ওর। তার চাইতে দুটো পয়সার চিন্তা করা ভালো। আজেবাজে বাতিক নেই ওর, হিসেব করে পা ফেলতে ভালোবাসে।

ট্রলার যতই সেনট মার্টিনের কাছাকাছি হয় মালেকের বুকের ধুকধুকানি বেড়ে যায়। দূর থেকে মনে হয় গোলাকার নারকেলের বাগান, কেউ বুঝি নিজের হাতে সুন্দর করে লাগিয়েছে গাছ। কিন্তু ও জানে দ্বীপটা একটুও গোল নয়—লম্বাটে। চারটি ছোটো-ছোটো দ্বীপ সরু খাল দিয়ে সংযুক্ত। জোয়ারে খাল ভরে উঠলে সবগুলো আলাদা হয়ে যায়। ওর তখন ভীষণ ভালো লাগে। কখনো কৈশোরে ফিরে যায়, দুরন্ত বালকের মতো ছুটোছুটি করে। ভাঁটার পানি মরে গেলে চারটি দ্বীপ আবার এক হয়ে যায়। দ্বীপের যে অংশটায় বাজার আর লোকবসতি, সেখানে ও থাকে না। চলে আসে নির্জন দিকটায়। কালো পাথরের ওপর বসে পানিতে পা ডুবিয়ে রাখে। ওর মনে হয় ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে যখন আসত সে সময়ের চাইতে এখনকার দ্বীপের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু ভালো করে খেয়াল করে বলেই পাথরের পরিবর্তন ও স্পষ্ট অনুভব করে। ও কখনো চমকিত হয়, কখনো শরীর শিরশির করে। দ্বীপের চারদিকে পানির নীচে আছে গোল আর ডিমের আকারের অসংখ্য ছোটোবড়ো পাথর। পানির ওপরেও আছে অনেক, কালো কুচকুচে রঙ। ওর চোখের সামনে আস্তে-আস্তে কেমন মিশমিশে কালো হয়ে গেল। মাঝে-মাঝে হাত দিয়ে পরখ করে ও। মসৃণ চকচকে পাথরের গায়ে পিছলে যায় হাত।

ট্রলার যত এগিয়ে আসে, মালেকের উত্তেজনা বাড়ে। নারকেলের সবুজ রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইদানীং দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণ শিলার স্তূপে ভরে গেছে। সেখানে পাথরের গায়ে ফুল ফোটে। ও বুঝতে পারে না যে ওগুলো প্রবাল—গড়ে উঠেছে প্রবালকানন। দ্বীপের লোকেরা প্রথম দিকে ছুটে আসত। পাথরে ফুলফোটা কি সম্ভব? তারপর নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তর্কে মাতে। মালেক দেখে সৌন্দর্য, ভালো-লাগা চোখ জুড়িয়ে যায়। কোনো ফুল মৌমাছির চাকের মতো অসংখ্য ছিদ্রে ভরা। কোনোটা বুনো ফুলের মতো। নিত্য নতুন ফুল ফোটে, আস্তে-আস্তে পাথর কালো হয়, শিলারাজি জমে পাহাড় গড়ে। কেন হয়, কেমন করে হয়? ট্রলার এসে থামে বাজারের ঘাটে। লোকে বলে জিনজিরা। মাছের কেনাবেচায় গমগম করছে এলাকা। শুঁটকির গন্ধে বাতাস-ভারি। ঠিকমতো শ্বাস নিলে মাথা ঝিমঝিম করে। গনি মিয়ার ট্রলারের তদারকি করে তমিজ। মালেককে দেখে একগাল হাসে। সবাই সেনট মার্টিন আসে কোনো-না-কোনো কাজে। মালেক আসে এমনি ঘুরতে। এর পাগলামি ভালো লাগে তমিজের।

—ক্যান আছ, মালেক ভাই?

—বালা, তমিজ ভাই। ভাবি ক্যান আছে?

তমিজ মাথা নাড়ে। পানখাওয়া দাঁতগুলো খয়রি হয়ে গেছে। লোকটা বড়ো বেশি সরল।

—আঁরার জিনজিরায় ফুল দেইখত আইস্যো বুঝি?

মালেক হাসে।

—তোঁয়ার মতো মানুষ ন দেখি। সংসার ন করিলা। কামাই কর, খ, আর ঘুরি বেড়াও। মনর মদ্যে ফুত্তি আছে। বই-বই সাগরর ঢেউ গুন আর পাখি দ্যাখ। বালাই লাগে তোঁয়ারে। বইও আঁর চার দোয়ানত। আঁই আইর।

মালেক কয়েক পা এগিয়ে দোকানে গিয়ে ঢোকে। বাজারে লোক গিজগিজ করছে। ট্রলারের ওপর রাশি-রাশি মাছ লাফায়। গণি মিয়া চেঁচিয়ে কথা বলছে। বরফ নিয়ে ট্রলার এসেছে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম থেকে। গণি মিয়া একটা আস্ত টাকার কুমির। ওদের ট্রলার আছে, জাল আছে, তাই টাকা আছে। শাহপরি দ্বীপের জেলে-পাড়ায় কারো ট্রলার নেই, জাল নেই। ওদের গতরে শক্তি আছে, মাছধরার নেশা আছে। তাই ওদের পকেটে টাকা নেই, ঘরে ভাত নেই, পরনে ত্যানাকোনাই সম্বল। মালেক বিড়ি ধরায়। গণি মিয়া একলা বড়োলোক হতে না চাইলে সেনট মার্টিন অন্যরকম হত। হবে কি? একটু পর গামছা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে তমিজ এসে দাঁড়ায়।

—ঝামেলার শ্যাষ নাই, মালেক মিয়া, বুজ্যো না?

—অ্যাতো টেঁয়া রোজগার করিলে তে ঝামেলা হইবই। তোঁয়ার গণি মিয়ার ঘেঁডিত অত চর্বি ক্যা, তমেজ ভাই?

দুজনে হো-হো করে হাসে।

—অ্যাই ফুটু, চা ল। হঙ্গে দুআ বিসকুট দিবি। মালেক মিয়া, রাইতে থাইবা তো?

—হ, তোঁয়ার কাঠের বেনচি ন হইলে তো ন বাঁচি। তুঁই আছ বলিই তো এই দ্বীপত আই।

—মিছা কথা। তুঁই আইয়ো দ্বীপর লাই। তয় দ্বীপডা দেইখত সোন্দর। ওই শামুক-ঝিনুকের পাহাড় আঁরে নিশির মতো টানে। মাঝে-মাঝে আঁইও তোঁয়ার লান পাগল হই যাই। ওই ফুটু, চা ন দিলি! কতক্ষণ লাগে সুমুনদির পুত!

তমিজ মিয়ার খেঁকানি মালেকের কানে যায় না। ও ওই পাহাড়টার কথা ভাবে—যেটাকে ও বলে ককুইনা। ককুইনা পুব থেকে পশ্চিম দিকে ঢালু। ওই পাহাড়ের চারদিকে প্রশস্ত বেলাভূমি। এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখলে শাহপরি দ্বীপের জেলেপাড়ার গরিব মানুষগুলো বুকপিঠের উদোম হাড় নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কখনো এইভাবে ম্লান হয়ে যায় দ্বীপের সৌন্দর্য।

—কী, চুপ হই গেলা যে? লও, চা খ।

তখুনি একদল ট্রলার-চালক হুড়মুড়িয়ে চায়ের জন্যে ঢোকে। ওদের মাছতোলা শেষ হয়েছে। যাবার আগে এক কাপ চা খাবে। ওদের হইচইয়ে মালেক বিরক্ত হয়।

—যাই গিয়ে, তমিজ ভাই।

—বেশি রাইত করি ন ফিরো্যা কিন্তু। দোয়ান বন্ধ করি দিয়ম।

দোকানের সামনে সজনেগাছে ফুল এসেছে। সাদা ফুল বিছিয়ে আছে পথে। মালেক পাশ কাটিয়ে চলে আসে। সামনে গণি মিয়ার ধানখেত। এখানে আর কারো ধানখেত নেই। গণি মিয়া কেবল আমন আর ইরি চাষ করে। তার জমিদখলের ক্ষমতা আছে, ধান ফলানোর সামর্থ্য আছে। এত টাকা কী করে গণি মিয়া? ঘরবাড়ি, জমিজমা, ট্রলার, জাল বাড়ায়। বাড়াতে-বাড়াতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে—নিজস্ব এবং একদম মনের মতো। হাঁটতে-হাঁটতে ওর হাসি পায়। ককুইনা- আর সিলিকাবালু -ভরা সমুদ্রতটে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। এখন জোয়ার। উঁচু ঢেউয়ের মাথা সবুজ দেখায়—বাত্তি তরমুজের রঙ অনেকটা। সাগরকলমীতে ছেয়ে আছে বালিয়াড়ির ধার। মালেক তোফাজ্জলের তরমুজ-খেতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রচুর তরমুজ হয়েছে, এখনো তোলার সময় হয় নি। হালকা রঙ মিলিয়ে গেলে তোফাজ্জল তরমুজ কাটবে। ফসল তোলার কাজ ওর ভালো লাগে। এই সময় এসে পড়লে ও কখনো কখনো মনের আনন্দে ওদের কাজ করে দেয়। হাফিজের গুছি পেঁয়াজ তোলার সময় হলেই ও মালেককে খবর পাঠাবে। একজন কামলা হলেই পেঁয়াজ তোলা হয়। মালেক সাহায্য করলে ওর আর কামলার খরচ হয় না। পেঁয়াজের মৌসুমের এখনো অনেক বাকি। হাফিজ মিয়া বেড়াঝোপের শুকনো পাতা সংগ্রহ করছিল জ্বালানির জন্যে। ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

—ক্যা আছেন, মালেক ভাই?

—বালা। তুঁই?

—আঁরার আর কী? কোনোমতো উগ্যা দিন প্যাট ভরি খাইতে পাইল্যে আল্লাহ্‌র কাছে হাজার সোকর করি।

হাফিজের ভাঙা চোয়ালে খোঁচা দাড়ি। হাতের রগ বড়ো বেশি প্রকট।

—উকুইন্যা হুকনা পাতা ন নিলে ভাত রান্ধা ন হইব। যাই, বউ আবার বইয়ে থাকিব।

আঁটিকরা শুকনো পাতা মাথায় উঠিয়ে ও চলে গেলে মালেক ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

গত বছর ঢাকা থেকে একদল লোক এসেছিল হেলিকপটারে করে। তারা দিনভর দ্বীপের মাটিপাথর, গাছপালা, শামুক, ঝিনুক কত কী যে পরীক্ষা করেছে—কিছুই বাদ দেয় নি। মালেক ওদের বোঁচকাবুঁচকি টেনে সারাদিন সঙ্গে ছিল। অসীম কৌতূহল এবং বিস্ময়ে দেখেছে সবকিছু। চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন—এটা প্রবালদ্বীপ। নামটা বড়ো সুন্দর। ও যখন একলা থাকে তখন প্রবালদ্বীপ বলে। অন্যদের সামনে বললে ওরা হাসে। ওরা জিনজিরা ছাড়া কিছু বলে না—ওরা বোঝে জিনজিরা মাছ আর শুঁটকির ব্যবসায়কেন্দ্র। শুধু ওর কাছেই এই দ্বীপের জন্ম, বেড়ে-ওঠা, টিকে-থাকা ইত্যাদি বিশাল ভাবনা। ও ভাবতেই পারে না এই অথই জলরাশির মধ্যে কেমন করে এমন একটা ভূখণ্ড গড়ে উঠল! কখনোই পানির নীচে ডুবে যায় না এই দ্বীপ। আসার সময় মুড়ি কিনে এনেছিল, ঠোঙা খুলে তাই চিবোয়। একটু পর ও পানির খুব কাছাকাছি যাবে, দেখবে ঘাসফুলের মতো ছোট্ট প্রবালকীট। শুঙগুলো বারবার খোলে আর বোঁজে। কী যে মায়াময় দৃশ্য! চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, প্রবালকীট অগভীর পানিতে শিলা, গাছের গুঁড়ি, শামুক-ঝিনুকের খোল বা এমনি পানি থেকে ক্যালসিয়ম গ্রহণ করে, এবং তা অনবরত পানিতে ছেড়ে প্রবাল তৈরি করে। ক্যালসিয়ম কী? মাঝে-মাঝে নিজের ওপর বিরক্ত হয়। সব সময় স্মৃতি এত তাজা থাকে কেন? কোনো নতুন শব্দ পেলে মগজে গেঁথে যায়। ওর আবার সেই কথাগুলো মনে আসে—ক্যালসিয়ম ছাড়তে-ছাড়তে যখন প্রবাল গড়ে উঠতে থাকে, তখন মৌমাছির চাক, গাছের ডালপালা এবং জীবজন্তুর মাথার মগজের মতো বেড়ে ওঠে। এ সবই তো ওর জীবনের অভিজ্ঞতা। ও তো দেখেছে। সেই দশ বছর বয়স থেকে দেখা শুরু, যখন বাবার সঙ্গে আসত। কিন্তু দেখা ফুরোয় না, ফুরোতে দিতেও চায় না। জলের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়, লতাগুল্মে আর শ্যাওলায় পা রাখে। এগুলো নাকি পানি পরিষ্কার করে। প্রকৃতির সব বস্তুই আপন-আপন কাজ করে। শুধু গণি মিয়ারাই একা বেড়ে উঠতে চায়—সুখ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি নিয়ে, অন্য দশজনের কলজে মাড়িয়ে।

মুড়ি খাওয়া শেষ। ঠোঙাটা পানিতে ভাসিয়ে দিলে স্রোতের মাথায় নিমেষে হারিয়ে যায়। লতাগুল্মের মাথা বাতাসে নড়ে। সূর্য ডুবে গেছে। বালুর ওপর হাঁটতে দারুণ লাগে। সাগরের কল্লোল দু কানের ভেতর উন্দাম হয়ে উঠছে। সিলিকাবালু আর ককুইনায় ভরা বেলাভূমি বাড়তে-বাড়তে দিগন্তের কাছে চলে যায়। ও নিজেও যেতে চায়। কিন্তু যেতে পারবে কি? একলা বেড়ে-ওঠার বাসনাভরা গণি মিয়ারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওরা সংখ্যায় কম কিন্তু ওদের বিশাল বপু, দৈত্যের মতো হিংস্র। আসলে, জেলেপাড়ার লোকগুলো এক হলে গণি মিয়ার মতো দশজনকে হটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কেউ এক হতে চায় না। সবাই চায় নিজে বড়ো হতে। জেলেপাড়ার উন্নতি কেউ ভাবেও না, বোঝেও না। ও একলা কষ্ট পায় এবং সবার কাছে বোকা বলে চিহ্নিত হয়। ও কেন সবার জন্যে ভাবে? নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পায় না। আদিগন্ত সমুদ্রের নীলাভ জলরাশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। যত্ত সব বাজে ভাবনা। ও নিজের ভেতর শক্তি অর্জনের চেষ্টায় দীর্ঘ পদক্ষেপে বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। কখনো কখনো এইসব ভাবনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে, পারে না। মাটির জন্যে, মানুষের জন্যে ভালোবাসা প্রবল হয়ে ওঠে। অনেক দূর হেঁটে যাওয়ার পর নিজেকে ধমক দেয়—এত কিছু ভালো না মালেক। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকো। পারি না যে! ও চিৎকার করে বলে। কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে-ভেসে যায়। এক-একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় বালুর ওপর অসংখ্য আলোর দানা ছড়িয়ে পড়ে। এই একটা মজার খেলা। প্রথমে ও ভয় পেত, কাছে যেত না। এখন ভয় উবেছে। চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে জেনেছে যে এগুলো ফসফরাস। কী সুন্দর নামটা। দানাগুলো তো নেভেই না, বরং পা দিয়ে মাড়ালে একটা থেকে অনেক কটা হয়ে জ্বলতে থাকে। টেকনাফ, শাহপরি দ্বীপ, সেনট মার্টিন হল সাগরভূমি। মানুষগুলো আলোর দানা, জ্বলতেই থাকে—জ্বলতেই থাকে। মালেক ফিরে আসে তমিজের চায়ের দোকানে। বেশ রাত হয়েছে। ফুটু কাঠের বেনচিতে ঘুমিয়ে, তমিজের হিসেবে মনোযোগ।

—মিয়া, তোঁয়ার লাই বই আছি।

—উগ্যা দিন দেরি করি ঘুমাইলে কী হয়?

মালেক মৃদু হাসে।

—খারাপ কথা না কইয়ো মিয়া। আঁরে জ্বালাই খাইলা।

মালেক হঠাৎ করে তমিজের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

—আরে মিয়া, কী কর? কী কর?

তমিজ পা গুটিয়ে নেয়।

—আপনার পায়ের ধুলা নিলাম তমিজ ভাই। আপনে জায়গা ন দিলে আঁই কি জিনজিরাত আইতে পাইত্তাম?

—হ, তোঁয়ার কি থাকনর জায়গার অভাব আছে না? তুঁই তো গাছতলায় কত থাকিত পার।

দুজনে হো-হো করে হাসে। সে হাসিতে ঘুম ভেঙে যায় ফুটুর। উঠে বসে চোখ রগড়ায়। মালেক ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

—সাবর ঘুম ভাইঙে না? চা দে রে ফুটু। চা গিলিয়ারে হুতি পড়ি।

চুলোয় কয়লা নিভে ছাই। ফুটু নড়ে না। এখন আবার কাঠ জ্বালানো হাঙ্গামা। তমিজ মিয়াও সেটা

বোঝে। তাড়াতাড়ি বলে, দুআ বিসকুট বেশি খ। ব্যানে চা গিলো।

—ঠিক আছে, তাই দ্যান।

মালেক কোমরের গামছা খুলে কাঠের বেনচের ওপর বিছিয়ে নেয়। তমিজ টাকা-পয়সা ট্যাঁকে গোঁজে, ফুটু ঝাঁপ বন্ধ করে। মালেকের বুকে তোলপাড়, মানুষের সামান্য ভালোবাসা পেলে ও অভিভূত হয়ে যায়। ও জানে এতটা বাড়াবাড়ি বাজে—বিগলিত হওয়া অর্থহীন, তবু ও নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বাইরে কুক্কা ডাকে, জোয়ার এবং ভাঁটার সময় পাখিটা ডাকে। চকচকে মেরুন গায়ের রঙ, গলার কাছে কালো পোঁচ, দেখতে বাহারি। তমিজ আর ফুটু চলে গেলে ও দরজা বন্ধ করে কুপি নেভায়, সমুদ্রের চাইতেও বিশাল অন্ধকারের ঢেউ ওকে গ্রাস করে। ও অনুভব করে মগজে গণি মিয়ার খোঁচা, এখানে আসার পর থেকে গণি মিয়া মাথায় চড়াও হয়েছে, ইচ্ছে করলেও নামানো যাচ্ছে না। আসলে ওর চারপাশে হাজার হাজার গণি মিয়া। সেনট মার্টিনের একজন গণি মিয়াকে সাগরে ফেলে দিলে কী হবে? আরো তো লক্ষ গণি মিয়া আকাশ ছোঁয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কাঠের বেনচে চিত হয়ে শুয়ে মালেক হো-হো করে হাসতে-হাসতে উঠে বসে—হাসতে-হাসতে চোখে জল আসে। জেলেপাড়ায় ওর চারপাশের ভাত-খেতে-না পাওয়া মানুষ-গুলো বুকের ভেতর গণি মিয়া হবার স্বপ্ন পোষে। এর শেকড় এত বেশি গভীরে যে টেনে ওপড়ানো যায় না। ও কাদের নিয়ে এগুবে? সেনট মার্টিনের গণি মিয়ার গর্দানের চর্বি চটকে দিলেই কি জেলেপাড়ায় সুদিন আসবে? ও আবার শুয়ে পড়ে। মাথার নীচে বালিশ নেই, ঘুম আসতে চায় না, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতা ভারি ঠেকে—জোর করে বুজে থাকলেও কষ্ট হয়। আসলে এসব কিছুই নয়—এভাবেই ও কত রাত কাটিয়েছে, এমন-কি বালির ওপর, গাছের নীচেও। এখন মনে বিষ-পিঁপড়ে—মগজে চোরাকাঁটা—শরীরে হাঙর, ঘুম আসবে কেন? ও দরজা খুলে বাইরে আসে। কখনো সময় আসে যখন নিজেকে পেষণ করলে নষ্ট আনন্দ টগবগায়। মালেকের এখন তেমন সময়।

[ক্রমশ

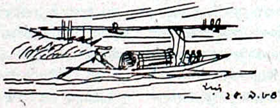

ইন্দিরা গান্ধী—এখনকার ভাবনা

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অ্যাগাথা ক্রিসটির এক অতি বিখ্যাত ডিটেকটিভ-কাহিনীর শেষপর্বে, রহস্যের আবরণ পরতে-পরতে যখন খুলতে থাকে, তখন দেখা যায়, নিহত ব্যক্তির যত সহ-যাত্রী, একট্রেন-বোঝাই লোক, এমন কি ট্রেনের যারা কর্মচারী তারা সুদ্ধ, প্রায় সবাই মিলে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার তদন্ত এখন চলছে। সে অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কারা জড়িত, যথাসময়ে হয়তো জানা যাবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে, একটা নৈতিক দায়িত্ববোধ, একটা পাপবোধ ব্যাপক-ভাবে দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশের অনুভব করা উচিত —এইরকম একটা ধারণা অনেকেই পোষণ করছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত নয়।

মৃত্যু কখনো-কখনো বড়ো কঠিন তিরস্কার হয়ে আসে। এই মৃত্যুও যেন গোটা দেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই অতি-পরিচিত ইংরেজি ছড়ার ভাষায় জিজ্ঞেস করছে, "হু কিলড কক রবিন?" আততায়ীর এই অস্ত্রের কামারশালায় কার হিংসার আগুন জ্বলছিল? সে অস্ত্র শানানো হয়েছে কোন্ মতাদর্শের কঠিন পাথরে ঘষে? "Not on thy Sole but on thy Soul, harsh Jew, thou mak'st thy knife keen". রাজা দ্বিতীয় হেনরি কাউকে বলেন নি, "টমাস বেকেটকে খুন করে এসো," তবু গিরজায় হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে কশাঘাত খেতে হয়েছিল। আমরাও যদি সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্যে নতজানু হয়ে থাকি, ঠিকই করেছি।

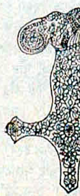

শোকের কারণ আছে, গভীর অনুশোচনারও কারণ আছে। সভ্য, সামাজিক জীবনযাপনের যে শিক্ষা আমরা বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চয় করে আসছি, তার মূল্য বারে-বারে আমাদের নতুন করে শিখতে হচ্ছে। যেমন নিজের সঙ্গে তেমনি আর-পাঁচজনের সঙ্গেও মানিয়ে নিয়ে মানুষকে সমাজে বাস করতে হয়। ব্যক্তি-পরিবার এবং গোষ্ঠী-গত স্বার্থবুদ্ধি, লোভ, হিংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তি মানুষ কোনো দিন জয় করতে পারবে, এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছে আরও বিবিধ বালাই, তত্ত্বগত, মতাদর্শগত প্রাধান্যলিপ্সা। তা ছাড়া, সভ্যতার অগ্রগতি নিজের নিয়মেই জন্ম দিয়েছে নানা রকমের চিত্তবিকারের। তবু মানুষের সান্নিধ্যেই মানুষকে বাস করতে হবে, বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে। এ সবই অতি পুরাতন কথা।

অনুশোচনা এইজন্যে যে, আবার একবার আমরা, কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির তাগিদে, কেউ অন্ধ আক্রোশের বশে, কেউ উদাসীনতায়, কেউ অজ্ঞানতায় ধৈর্য আর সহনশীলতার মনোভাব দূরে ঠেলে দিয়েছি। আবার একজনকে সেজন্যে প্রাণ দিতে হল।

ইন্দিরা কী করতে পারতেন

এত বড়ো একটা দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী, এত বৃহৎ এবং বিমিশ্র এক জনসমষ্টির যিনি নেতা এবং সর্বোচ্চ প্রশাসক, তাঁকে অনিবার্যভাবেই পরস্পরবিরোধী অসংখ্য স্বার্থান্বেষণের সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে নিজের আসন পাততে হয়। অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে কথা ধার করে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মেলাতে হয় পোড়ো বাড়ির ভাঙা জানলাটাকে। একমাত্র তেমন ব্যক্তির পক্ষেই এ দায়িত্ব পালন সম্ভব, যিনি নিজে পোড়ো বাড়িও নন, ঝোড়ো হাওয়াও নন। সেই দিক থেকে ইন্দিরা গান্ধীর একটা বিশেষ সুবিধে এই ছিল যে, পারিবারিক সূত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষার গুণে তিনি দেশের সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের চিন্তাকে স্থাপন করতে পারতেন। দেশের লোকেরও তাঁর কাছে সেই প্রত্যাশাই ছিল। সে প্রত্যাশা তিনি সর্বাংশে পূরণ করতে পেরেছিলেন কি না, সে কথা আলাদা। দেশের অখণ্ডতা, নানা বিরোধের মধ্যে জাতীয় সংহতির যে সাধনা, তার পরিপন্থী একটি শক্তির হাতে ইন্দিরা গান্ধী প্রাণ দিলেন। এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই ঘটনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত অবধারিত নয় যে, তিনি যা-যা করেছিলেন, কিংবা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তার সবই সেই জাতীয় সংহতির সাধনার অনুকূল ছিল।

ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে—স্টেটসম্যান এবং পলিটিশিয়ান। এ দুয়ের পার্থক্য বোঝাবার জন্যে বাঙলায়ও দুটি শব্দের ব্যবহার কখনো-কখনো দেখা যায় : রাষ্ট্রনীতিক এবং রাজনীতিক। ভারতের মতো দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনি যদি নিছক রাজনীতিকই থেকে যান, তা হলে দেশের পক্ষে সেটা সমূহ বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। চৌধুরী চরণ সিং-এর প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ এত কম ছিল যে সে বিপদ দেখা দিতে-দিতেই মিলিয়ে গেল। ইংরেজিতে একটা মজার ছড়া আছে। কে যেন স্নানের টবে করে সমুদ্রযাত্রা করেছিল। বলা বাহুল্য তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বেশি দূর এগোতে পারে নি। ইফ দ টাব হ্যাড বীন স্ট্রংগার, মাই টেল হ্যাড বীন লংগার।

ইন্দিরা গান্ধী নিছক রাজনীতিক ছিলেন না। আবার, ইংরেজিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যে আরেকটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়—এলডার স্টেটসম্যান—তিনি তাও ছিলেন না। এলডার স্টেটসম্যানের প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা থাকে না, এবং নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক স্বার্থও থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর দুই-ই থাকে। তবু তাঁকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয় সমগ্র দেশের প্রতি আনুগত্যকে। এ হল যা হওয়া উচিত, তার কথা। বাস্তবে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি প্রায়ই ঘটে। ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় কখনো ঘটে নি কি? যদি না ঘটে থাকে, তাঁর সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের অভিযোগ প্রায় সর্বাংশে ভ্রান্ত, অশ্রদ্ধেয়, এমন কি ক্ষতিকর বলে মানতে হয়। তার কারণ, তাঁর ঘোষিত নীতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয়, তাঁর কর্মক্ষমতা সম্পর্কেও ততটা নয়, তাঁর রাজনৈতিক "অভিসন্ধি" সম্পর্কেই বিরোধী রাজনীতিকদের আপত্তি ছিল সবচাইতে জোরালো।

প্রতিপক্ষ প্রয়োজন

বিরোধী রাজনীতিকদের এবং খবরের কাগজের "অপপ্রচারের" জন্যেই হোক, কিংবা যুক্তিসংগত কারণেই হোক, এই ধারণা ব্যাপক হয়েছিল যে ইন্দিরা গান্ধী নিজের, এবং নিজের পরিবারের রাজনৈতিক স্বার্থকে শুধু দেশের স্বার্থ নয়, নিজের দলের রাজনৈতিক স্বার্থেরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। বিপথগামী আততায়ীর হাতে মৃত্যু সে ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে না। যদি তার মধ্যে সত্য কিছু থেকে থাকে—তাঁর মৃত্যুর আগেও ছিল, পরেও আছে। তাঁর অবলম্বিত নীতি, তাঁর কার্যপ্রণালীর মধ্যে এমন কিছু যদি থেকে থাকে যা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, তবে সে নীতি তাঁর মৃত্যুর পরেও ক্ষতিকর। যদি দেখা যায়, তাঁর প্রতি বিরোধিতার প্রয়োজন ছিল, তবে, একই কারণ দেখা দিলে তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রতিও বিরোধিতার প্রয়োজন হবে।

আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার স্বীকৃত। দেশনেত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রথম শোকের ধাক্কায় জনচিত্তে যদি বিরোধীদের প্রতি বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এমন কি যদি দেখা যায় ক্ষণিক আবেগের বশে অনেক সাধারণ মানুষ বিরোধী রাজনীতিকেই সে মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছেন, তা নিয়ে অনুযোগ করা বৃথা। সম্ভব বটে, রাজনৈতিক বিরোধিতা কখনো-কখনো ব্যক্তিগত আক্রোশের স্তরে নেমে আসছিল। এও সম্ভব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা-জনিত অসাফল্যের দায় কোনো-কোনো বিরোধী নেতা একান্তভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর কাঁধে চাপিয়ে যে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, কতকাংশে তাও দায়ী তাঁর ওপর যে দৈহিক আক্রমণ নেমে এল, তার জন্যে। কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক বিরোধিতা অবাঞ্ছিত, রাজনৈতিক বিরোধিতাই জাতীয় অগ্রগতির পথের কাঁটা, রাজনৈতিক বিরোধিতাই ইন্দিরা গান্ধীর যাবতীয় সাধু প্রচেষ্টাকে পদে-পদে প্রতিহত করেছে, এ-জাতীয় মনোভাব শুধু ভ্রান্ত নয়, আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকরও বটে। ভাবনার কথা, শিক্ষাদীক্ষায় যাঁরা অগ্রগণ্য, মানসিক অভ্যাসে যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেচনাকে দেশব্যাপী আবেগের জোয়ারের মধ্যেও স্থির রাখতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যেত, তাঁরাও অনেকে, যেন মনে হয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধিতার অবলুপ্তিই কাম্য বলে মনে করছেন। অবশ্য, লোকসভায় বিরোধী-পক্ষের মারাত্মক শক্তিহানিতে দুশ্চিন্তার কারণ অনেকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কোনো বিদগ্ধ মহল থেকে এমন কথা শোনা যাচ্ছে যাতে মনে হতে পারে—আমাদের দেশে পক্ষে যা-কিছু ভালো ইন্দিরা গান্ধীই করতে চেয়েছিলেন, বিরোধীদের একমাত্র কাজ ছিল ভালো কাজে বাধা দেওয়া। এই অবস্থায় বিরোধী-পক্ষ যত ক্ষীণবল হয়, সরকার যত শক্তিশালী হয়, ততই দেশের মঙ্গল—এরকম একটা সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

অথচ মুখ ফুটে তাঁরাও বলছেন না, আমরা চাই বিরোধী-পক্ষ বেমালুম বিদায় হোক। এ কথা বলা, আর গণতন্ত্রের মৃত্যু কামনা, একই। তাই এমন কথা বড়ো নিন্দের। বরং বলা যাক, বিরোধীরা থাকুন, কিন্তু তাঁরা যেন বিরোধিতা না করেন। সরকারের ভুলত্রুটি হলে অবশ্যই দেখিয়ে দেবেন, কিন্তু, পররাষ্ট্র বিষয়েই হোক আর আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রেই হোক, সরকারকেই বুজুর্গ বলে মানবেন। ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় তাঁরা তা করেন নি বলেই দেশের আজ এই দুরবস্থা, তাই দিকে-দিকে বিভেদ আর বিশৃঙ্খলা আর হিংস্রতা, তাই ইন্দিরা গান্ধীকে আমরা অকালে হারালাম। এবার কি ওঁদের সম্বিৎ ফিরবে?

কী পেরেছেন কী পারেন নি

ভবিষ্যতের কথা একটু পরে, প্রথমে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের দিকে তাকানো যাক।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, যাকে আজকাল তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়, তার অন্তর্গত অন্যান্য দেশের তুলনায়, আমাদের দেশের সাফল্য নানা দিক থেকে কৃতিত্বপূর্ণ। আর্থিক বুনিয়াদ আমাদের যথেষ্ট মজবুত, এবং বাইরে থেকে গৃহীত ঋণ সত্ত্বেও বলা যায়, বহুলাংশে স্বনির্ভর। নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনদের সংখ্যা এখনও ভয়াবহ, তবু শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্তর সংখ্যাও বিপুল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োগকুশলী আমাদের যত আছেন, বিশ্বে আর কোনো দেশের ভাণ্ডারে তত আছেন কিনা সন্দেহ। আমাদের উচ্চতর বিচারবিভাগ এখনও স্বাধীন এবং প্রাণবন্ত। আমাদের জাতীয় জীবনে সশস্ত্রবাহিনীসমূহ এখনও অসামরিক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাবহ। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের অবসানে আমাদের দেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এই তার মোটামুটি বর্ণনা। অবশ্য, বলা বাহুল্য, এর সমস্ত কৃতিত্বটুকুই ইন্দিরা গান্ধীর প্রাপ্য নয়। যে ভারত তিনি হাতে পেয়েছিলেন, হাজার সমস্যা সত্ত্বেও তার গণতন্ত্র এবং তার অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুতই ছিল। তার শাসনযন্ত্রও মোটামুটি কর্মক্ষমই ছিল। তবু, মানতে হয়, ইন্দিরা গান্ধীর হাতে "ভারত"-নামক চালু কারবার নানা দিক থেকে অগ্রগতি করেছে।

আবার, তাঁরই আমলে কয়েক ধরনের গুরুতর দুর্বলতার লক্ষণও রাষ্ট্রদেহে আমরা লক্ষ করেছি, এবং লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়েছি। যাঁরা বলেন সেসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে বিরোধীদের কার্যকলাপ, তাঁদের দূরদৃষ্টি এবং দেশপ্রেমের অভাবই দায়ী, তাঁদের সঙ্গে একমত হতে গেলে ধরে নিতে হয়—আমাদের স্মৃতিই শুধু মিথ্যাবাদী নয়, সমসাময়িক ঘটনাবলীর যে বিবরণ সংবাদপত্র ইত্যাদিতে রক্ষিত আছে তাও মিথ্যা। প্রধানত

দুটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দুশ্চিন্তার দিকে লক্ষ করা যাক। তার একটি জাতীয় সংহতি সম্পর্কিত, অপরটি গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

ইন্দিরা ও জাতীয় সংহতি

এ বিষয়ে সবাই একমত, দেশের সংহতি ইন্দিরা গান্ধী মজবুত করে যেতে পারেন নি। কেন পারেন নি, কার দোষে পারেন নি, তাই নিয়ে মতভেদ। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে, আর-সব রাজনৈতিক দল তথা গোষ্ঠীই দেশের সংহতি রক্ষা করা যে অত্যন্ত দরকার, সে কথা জোর গলায় প্রচার করেছেন। দুঃখের বিষয়, সর্বদা তাঁরা সবাই সংহতির অনুকূলে তাঁদের কার্যধারা পরিচালিত করেন নি। কোনো-না-কোনো সময়ে, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে, কোনো বিশেষ সম্প্রদায় অথবা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-ভাবনা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে নি কিংবা অপরের সে রকম কোনো প্রচেষ্টায় সহায়তা করে নি,—এমন কোনো রাজনৈতিক দল অথবা গোষ্ঠী এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। তবু যাঁরা বলেন, দেশের সংহতিরক্ষায় কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল সর্বাধিক, তাঁরা ঠিকই বলেন। কংগ্রেস জন্ম-সূত্রে জাতীয় ঐক্য তথা সংহতির প্রধান ধারক এবং বাহক। কংগ্রেসের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, সে আত্মা ভারতের জাতীয় সংহতির চেতনার প্রতীক। কাজেই, এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক : ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে?

ইন্দিরা ও কংগ্রেস

মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাঠামোই এত বড়ো একটা দেশের সংহতি বজায় রাখতে পারে না। তার জন্যে আরও যা না হলেই চলে না তা হল সারা দেশে পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক দল। মোহনদাস গান্ধীর কংগ্রেস ছিল সেইরকম দল। ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস কেমন ছিল? ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নয়, কংগ্রেসের নেত্রীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি কী জবাব দিতেন?

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের কোনো সাংগঠনিক নির্বাচন হয় নি ১৯৭২-এর পর। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি—ওয়ারকিং কমিটি—এই দুটি ছিল দলের নীতি-নির্ধারক সর্বোচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই দুটির অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল? এত বড়ো ঐতিহ্য-সম্পন্ন, এত বছর ধরে ভারতশাসনের ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেস নামক যে প্রতিষ্ঠান, তারই বা কী হাল করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী? কংগ্রেসের হাই কমানড বলতে কাকে বোঝাত? এইসব প্রশ্নের উত্তর থেকেই স্পষ্ট হবে, জাতীয় সংহতি সাধনের একটি প্রধান উপায় কেন সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

আরও মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস মানে শুধু তার নেত্রী নন, শুধু হাইকমানড নয়, এমনকি অল ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটি এবং ওয়ারকিং কমিটিও নয়, কংগ্রেস মানে সারা দেশের অন্ধিতে-সন্ধিতে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে-থাকা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা—ব্লক কংগ্রেস, জেলা কংগ্রেস, রাজ্য অথবা প্রদেশ কংগ্রেস প্রভৃতি। কংগ্রেসের নেত্রী যদি নিজ দলের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতেন, তা হলে এইসব প্রতিষ্ঠান, যা একদা প্রাণবন্ত ছিল, প্রাণহীন কাঠের পুতুলে পরিণত হত না।

ইন্দিরা গান্ধী যদি বুঝতেন গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দেশকে ঐক্যবন্ধ রাখবার কাজে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কত মূল্যবান, কংগ্রেসকে এমন দুর্বল করে ফেলতেন না যাতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি-টুকু পর্যন্ত তার না থাকে। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রি-সভা যেন তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যাতে তাঁদের একমাত্র ভরসা এবং একমাত্র ভয় বলতে তিনিই হন—এই অবস্থাই যদি ইন্দিরা গান্ধী চেয়ে থাকেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি জেনেশুনে কংগ্রেসকে জলাঞ্জলি দিয়ে গেছেন।

আশা করি এ প্রশ্ন কেউ করবেন না—তা হলে গত নির্বাচনে কংগ্রেস কী করে এমনভাবে জিতল? রাজ-নৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস যদি দুর্দশার চরমেই পেঁছে থাকে, তবে নির্বাচনী সাফল্যের চূড়ায় উঠল কিসের জোরে? খানিকটা জোর এখনও অবশিষ্ট আছে 'কংগ্রেস'—এই নামে। তাতে অকস্মাৎ বিপুল বলসঞ্চার করেছিলেন শ্রীরাজীব গান্ধী। থেকে-থেকে কংগ্রেসে তেমনি জোর সঞ্চার করতেন ইন্দিরা গান্ধী। একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, বিদ্যুৎ সঞ্চার করে মরা ব্যাঙকে তিনি হঠাৎ দারুণ অস্থির করে তুলতেন। কিন্তু প্রাণের ধর্ম আলাদা। জীবিত প্রাণীর দেহের কোষে-কোষে তা

নিজের শক্তিতেই নিজে সক্রিয় থাকে। যে কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধী রেখে গেলেন তার মধ্যে সেই প্রাণশক্তি কোথায়?

ঠিক কথা, যে কংগ্রেস তিনি হাতে পেয়েছিলেন তার প্রাণশক্তি আগে থেকেই দ্রুত কমতে আরম্ভ করেছিল। দীর্ঘকাল একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করার পর কংগ্রেস ভাবতে আরম্ভ করেছিল—সংগঠনের শক্তি বুঝি মোটরগাড়ির ইনজিনে পেট্রল ঢালার মতো ওপর থেকেই ঢেলে দেওয়া যায়। আসলে রাজনৈতিক সংগঠনকে নিজের শক্তি নিজেকেই সংগ্রহ করতে হয় একেবারে নীচে থেকে। সরকারি ক্ষমতা হাতে থাকলে এই শক্তিসংগ্রহের কাজে কিছু-কিছু সুবিধে হয় ঠিকই, আবার সেই সঙ্গে সত্যি-কারের শক্তির উৎসটা যে কোথায় সে বিষয়ে ভ্রান্তিরও সৃষ্টি হতে পারে। কংগ্রেসের তাই হয়েছিল। তা যদি না হত, কংগ্রেসের পুরোনো সংগঠনটা ইন্দিরা গান্ধীর এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত না।

কিন্তু তার পরে কী হল। পুরনো কংগ্রেসের ভস্মাবশেষ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো নতুন কংগ্রেস কি প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করল? হায়, ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে আর মর্মে-মর্মে কে বেশি টের পেয়েছিলেন যে তা হয় নি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁকেই আক্ষেপ করে বলতে শোনা গেছে, "আমি একা আর সারা দেশে কংগ্রেসকে কত ঠেকা দিয়ে-দিয়ে বেড়াব?"

অক্ষম কংগ্রেস

বিরোধীদের রাজনৈতিক অক্ষমতা এখন অনেকেরই কৌতুকের কারণ। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস যে কতদূর অক্ষম হয়ে পড়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁরা আদৌ রাজি নন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হতে পারে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবল একটা যৌবনের জোয়ার, তার তলাতেও সেই মূলগত দুর্বলতা এখনও বিদ্যমান। দেশের যুবশক্তির যত বড়ো একটা অংশ যে বিপুল উদ্যমে নির্বাচনে জেতাবার জন্যে কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা দেখে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভয় পাবারই কথা। এটা একটা ঘটনাই বটে। শ্রীরাজীব গান্ধী, যেন মনে হয়, ভারতীয় রাজনীতিতে যৌবনের জয়যাত্রারই অগ্রদূত। তবে, মনে রাখা দরকার, ইন্দিরা গান্ধীও যুবশক্তিকে আকর্ষণ করে-ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-নামক রাজনৈতিক সংগঠনটি তাতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি।

নির্বাচনে জেতাই যদি একটি রাজনৈতিক দল তার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তা হলে দেখা যায়—সেই একটিমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার ক্ষমতাও তার ক্রমশ কমে আসছে। ইন্দিরা গান্ধী নিজের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটতে দেখেছিলেন, বেঁচে থাকলে অষ্টম লোক-সভার নির্বাচনে কী দেখতেন কে জানে। যদিও বা শেষের দিকে এসে তিনি বুঝতে আরম্ভ করে থাকেন রাজনৈতিক জীবনে সত্যিকারের এবং দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের জন্যে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তাঁর নিজের পক্ষে আবার নতুন করে 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

কী কারণে শক্তিশালী মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন ইন্দিরা গান্ধী অবাঞ্ছিত মনে করতেন, কেন তিনি চাই-তেন রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস নেতারা, মুখ্যমন্ত্রীরা সাংগঠনিক শক্তির ওপর না দাঁড়িয়ে একান্তভাবে তাঁরই মুখাপেক্ষা করে থাকুন, তার পূর্ণতর মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভার যোগ্যতরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা অনু-মানের ভিত্তিতে শুধু এইটুকুই মাত্র বলতে পারি—সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি সন্ধিক্ষণের—যখন নিজের শক্তিতে তাঁকে কংগ্রেস সংগঠনের শক্তিকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করতে হয়েছিল, সেই সংকটকালের—তিক্ত অভিজ্ঞতাই অন্তত কতকাংশে তার জন্যে দায়ী।

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ইন্দিরা গান্ধী যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। মানুষের জীবনের এই এক ট্র্যাজিক কৌতুক। আমরা যা চাই না তা নয়, যা চাই তাই যখন সত্য হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনই দেখি অকল্যাণের আসল মূর্তি। ইন্দিরা গান্ধী দেখলেন শুধু কংগ্রেস-নামক প্রতিষ্ঠানই নয়, ভারত-নামক দেশও নানানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে। তিনি বোধহয় ভেবে দেখেন নি, ভারতের ঐক্যের একটা শক্তি নিহিত ছিল কংগ্রেসের মধ্যে।

১৯৮৩-র মার্চে কলকাতার সাপ্তাহিক সানডে-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীরাজীব গান্ধী বললেন, "গত দশ কি পনেরো বছরে (কংগ্রেস) দল আর দল হিসেবে কাজ করছে না। নীচের স্তরের পদাধিকারীদের, ব্লক-সভাপতি-

দের, জেলা-সভাপতিদের দায়িত্ব আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, দলের গণতান্ত্রিক কর্মতৎপরতা আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।"

যদি বলা যায়, কংগ্রেসের এই দশার জন্যে দোষের ভাগী ইন্দিরা গান্ধী নন, কংগ্রেস নিজেই ; যদি বলা যায়, তেমন সক্ষম উপযুক্ত ব্যক্তি সংগঠনে ছিলেন না, তারই ফলে সব দায়িত্ব এবং সব ক্ষমতা দলনেত্রীকে নিজের হাতে নিতে হয়েছিল, তা হলে বলতেই হয়, নেতৃপদে যিনি আসীন, দলের এই অবস্থাও, তাঁরই ব্যর্থতারই পরিচায়ক। যদি বলা যায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না, তাই প্রধানমন্ত্রী অভিভাবকের মতো তাঁদের চোখে-চোখে রাখতে বাধ্য হতেন, তাহলে প্রশ্ন করতেই হয়, সে কেমন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজ্যস্তরে যার মধ্যে থেকে নিজের জোরে মুখ্যমন্ত্রী হবার মতো নেতা উঠে আসেন না?

দেশের ঐক্য-সাধনে এবং সংরক্ষণে কংগ্রেসের অনন্য ভূমিকা ছিল বলেই তার এই শতবর্ষপূর্তির বছরে তার সামূহিক অধঃপতনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হল।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে যে প্রশ্নটি বড়ো হয়ে ওঠে সেটি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত। এবারকার লোকসভার নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের শুধু শক্তিহীনতাই নয়, এমন গুরুতর মর্যাদাহানি ঘটেছে যে তার ফলে ব্যাপকভাবে এরকম ধারণা জন্মাতে পারে—শাসকশক্তির অপ্রতিহত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই বুঝি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট বিধান। এমনকি, স্বাধীন বিচারব্যবস্থাও, মনে হতে পারে, বিপুল জনমতের জয়যাত্রার পথে অবাঞ্ছিত বাধাস্বরূপ। ভয়ের কারণ এই যে, শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক বিধানই প্রকৃত গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে অক্ষম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তথা রীতিপ্রকরণকে সযত্নে রক্ষা করা কর্তব্য, এবং সে কর্তব্যের সাধন সদাজাগ্রত জনমতের দ্বারাই সম্ভব। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে শুধুমাত্র জাতীয় সংহতিই দুর্বল হয় নি, গুরুতর আঘাত এসেছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে, এবং যেসব নাগরিক অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ, তার ওপরেও।

এ অভিযোগ যথার্থ নয় যে, ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরতান্ত্রিক-মনোভাবাপন্ন ছিলেন। স্বৈরতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ জোরজবরদস্তি, দমনপীড়ন। সে ধরনের শাসনপদ্ধতির প্রতি তাঁর কোনো ঐকান্তিক পক্ষপাত ছিল না, বরং মনে হয় দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই তিনি চলতে চাইতেন, না হলে পিছিয়ে যেতেন। যেমন পিছিয়ে গিয়েছিলেন ইমারজেন্সির শাসন থেকে। কিন্তু এ কথাও ঠিক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণুতা ছিল অত্যধিক। ইমারজেন্সির সময়ে এই অসহিষ্ণুতা, আইনের বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল, তখনই হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসন অনেকটা স্বৈরতন্ত্রের কাছাকাছি গিয়ে পড়ল, তখনই হয়তো তিনিও উপলব্ধি করলেন—রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে আইনের ঘোড়ায় সওয়ার করে দিলে তার পরিণাম কী হতে পারে।

অসহিষ্ণুতাও দুর্বলতারই একটা ধর্ম। তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো সামর্থ্য কংগ্রেসের মধ্যে তিনি অবশিষ্ট রাখেন নি। যে কংগ্রেস তাঁকে বই জানে না, সে কংগ্রেস তাঁর আঁচল ছেড়ে রাজনৈতিক লড়াই করতে এগিয়ে যাবে, এমন জোর নিজের মধ্যে থেকে সে কোথায় পাবে? কাজেই সে লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়ে তার প্রশাসনযন্ত্রকেই এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আবাল্য তিনি গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় লালিত, নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদির ধারণার পিছুটান সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে বোধহয় শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল না। ইমারজেন্সির অবসান হল। তিনিও বাঁচলেন, দেশও বাঁচল।

কেন ভাবনা

ভবিষ্যতের ভাবনা এইজন্যে যে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দেশের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বলতে যা-কিছু, তা আজ হৃতশক্তি হতমান। শুধু তাই নয় ; তিনি স্বয়ং মানুষের মনশ্চক্ষে আজ জাতীয় কল্যাণ, এবং জাতীয় সংহতির উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যোদ্ধা। অথচ, তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার পরেও এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জাতীয় সংহতি নির্ভর করে, শেষ পর্যন্ত, শক্তিশালী প্রাণবান জাতীয় চেতনার ওপর,

এবং জাতীয় চেতনার প্রসারে এবং সংরক্ষণে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য। কংগ্রেস একদা ছিল তেমনি এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বাহ্যত আজও আছে। কিন্তু তার অন্তরের শক্তিতে বিপুল ঘাটতি। যে পথে ইন্দিরা গান্ধী চলেছিলেন সে পথ পরিত্যাগ না করলে কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্ব (কার্যত আবার সেই এক-জন) তাঁদের দল বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রাখবেন না।

দ্বিতীয়ত, সুস্থ সবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করবার কোনো তাগিদ শাসকদল অনুভব করবেন না, যদি না তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত থাকে, অর্থাৎ তাঁদের দল সুস্থ সবল প্রাণবান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় জীবনে গভীর এবং ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান থাকে।

ভাবনা এই, কংগ্রেস কি নবজন্ম লাভ করবে, না ইন্দিরা গান্ধী তাকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন সেখান থেকে সে মৃত্যুর দিকেই আরও এগিয়ে যাবে?

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

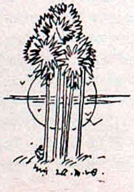

৫

বিদায়, কলকাতা!

বিদায়, কলকাতা!

না, একথা বলবার বা বোঝবার মতো তখনও আমার বয়স হয় নি। কোথাও একটা যাচ্ছি। একেবারে চাটি-বাটি উঠিয়ে। এটা নিশ্চয় বুঝেছিলাম। তাতে ছিল যাওয়ার আনন্দ।

কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার বিষাদ? ছিল কি? মনে পড়ে না।

কেন থাকবে? বাবা মা দাদা দিদি। ঠাকুর্দা কাকারা। প্রিয়জনেরা সবাই সঙ্গে যাচ্ছে। থেকে যাচ্ছে বটে নীচের তলার জ্যাঠাইমা। মালুদা পুলিনদা ছোটুদা গোপালদা। বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাই। কী দরকার জ্যাঠামশাইয়ের নিজের হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়ার? নিজে পিঠে করে কয়লার বস্তা বয়ে আনার? জ্যাঠাইমা তো আরেকটু নরম হলেই পারেন? মোহনদা? মোহনদা থাকল। আর তার মুখের পান।

ঢোলগোবিন্দ-র এসব ভাববার কথা নয়। নাকি তার হয়ে আমিই এসব ভাবছি।

ছোটোদের মনগুলো কিন্তু অদ্ভুত। মুখ ফুটে না বললেও অনেক কিছুই তারা বোঝে। বুঝুক না বুঝুক, টের পায়। বড়োরা সেসব ধরতেই পারে না।

ইস্টিশান। শেয়ালদা। সন্ধে গড়িয়ে গেছে। দাঁড়ানো রেলগাড়ি। কামরার মধ্যে উপুড়-করা গোটা সংসার।

সারাদিন ধকল গেছে খুব। গোছগাছ। বাঁধাছাঁদা। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে-ঘুরে দেখা। 'যা এখান থেকে', 'ডেঁপো ছেলেটাকে নিয়ে যাও তো'—এমনিভাবে তাড়া খেয়ে-খেয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। ফেলে-দেওয়া পুরনো ক্যালেন্ডার, সিগারেটের খালি প্যাকেট, বাস-ট্রামের টিকিট, ছেঁড়াখোঁড়া তাস, শিশিবোতলের ছিপি, ছাপা ছবি—ঢোলগোবিন্দ তুলে বেছে দেখে সবার অলক্ষ্যে কোন্‌টা তার নিজের কাছে রেখে দেওয়া দরকার।

ফলে গাড়ি যখন ছাড়ল তার আগেই বুকের কাছে ব্যাঙের আধুলির মতন একটা পুঁটুলি দুহাতে আঁকড়ে ধরে ঢোলগোবিন্দ তখন ঘুমিয়ে ঢোল।

গাড়ির দুলুনিতে ঘুমটা হয়েছিল বেশ গাঢ়। তাই মাঝরাত্তিরে মা যখন তাকে ঝাঁকিয়ে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তার বেশ কিছুক্ষণ লেগে গিয়েছিল কোথায় সে আছে সেটা বুঝতে।

পরক্ষণেই কানের পরদায় এসে ঘা দিয়েছিল একটা ভয়তরাসে গুম-গুম শব্দ। মা বলেছিলেন, এই হল সাড়া ব্রিজ। ট্রেন এখন পদ্মার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

বলে আমাদের হাতে-হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা করে তামার পয়সা। নে, জয়-মা-কালী বলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দে।

জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলাম বাইরে। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ব্রিজের বড়ো-বড়ো থাম্বাগুলো জানলার গরাদ ভেঙে পালানো আলোগুলোকে পাকড়ে উলটোমুখে ছুটে পালাচ্ছিল। সেই সঙ্গে সমানে গাড়ির চাকায় গুম-গুম শব্দ।

তার মধ্যে আমাদের ছুঁড়ে-দেওয়া পয়সাগুলো সোঁ-সোঁ শব্দে কারা যেন হুশ করে টেনে নিচ্ছিল।

রাত্তিরটা ছিল কেমন যেন পৈশাচিক।

তারপর আস্তে-আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুতেই আমার আর ঘুম আসছিল না। চোখ খুলতে পারছিলাম না ভয়ে। এমন অন্ধকার আমি জীবনে দেখি নি। যেখানে যাচ্ছি এমনি অন্ধকার কি সেখানেও? আমি ভয় পাব।

ভয়তরাসে সেই অন্ধকার ঢোলগোবিন্দর বন্ধ-করা চোখের ওপর হাত দিয়ে চাপড়ে-চাপড়ে এক সময়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

একরকমের পাতলা ঘুম আছে যাতে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে-জুড়ে কাঁথা সেলাইয়ের মতো স্বপ্ন দেখায়।

ঢোলগোবিন্দ দেখে—

চীনেম্যানদের পাড়ায়—চীনেম্যান? চীনেম্যান আবার কী? ওই যে গো, মাথায় টুপি দিয়ে পিঠে রেশমি কাপড়ের বস্তা নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ফেরি করে বেড়ায়—ছেলের দল যাদের দেখলেই চ্যাং-চুং-চীনেম্যান বলে খ্যাপায়—সাহেব অথচ সাহেব নয়—কুতকুতে চোখ—হ্যাঁ গো...

সেই চীনেম্যানদের পাড়ায় মস্ত এক বাড়ি। মস্ত বলতে? তিনতলা। চারতলা। নাকি তার চেয়েও উঁচু?

ঢোলগোবিন্দর স্বপ্নে সব কেমন ভাসা-ভাসা। সব-কিছুরই একটা উড়ু-উড়ু ভাব। লেপ করতে এসে ধুনুরিরা টোয়াঙ-টোয়াঙ শব্দ তুলে যখন তুলো ধোনে, তখন যেমন পেঁজা তুলা তাদের মাথার ওপর ফুরফুর করে ওড়ে, ঢোলগোবিন্দর স্বপ্নগুলোতে তেমনি ছাড়া-ছাড়া একটু ফুরফুরে ভাব।

আর সেই চীনেপাড়ার বড়ো একটা বাড়ির জলের পাইপ বেয়ে হুইসেল বাজাতে-বাজাতে হুড়মুড় করে নেমে পালাচ্ছে, ওরা কারা?

পরনে খাঁকির উর্দি। পট্টিবাঁধা পায়ে বুট। কোমরে মোটা চামড়ার বেলট। মাথায় টুপি।

আরে দুর, ও তো আমার বাবা। আর উনি দীনেশ জ্যাঠামশাই। দুজনেই ঢ্যাঙা। বাবা অনেক ছিপছিপে। জ্যাঠামশাইয়ের গা-টা আরেকটু ভারি। দুজনেরই মাথায় কোঁকড়া চুল। সোজা সিঁথি! ধবধবে গায়ের রঙ। খাঁকির উরদি পরলে ট্যাঁশফিরিঙ্গির মতো দেখায়।

বাবা ছোটো দারোগা। দীনেশ জ্যাঠামশাই বড়ো দারোগা। কোমরে কারো পিস্তল নেই। পুলিশ তো নয়। আবগারির লোক।

কী যেন নাম? মীনা পেশোয়ারি। ডাকসাইটে স্মাগলার। বাড়ি কী? যেন ঝকঝকে প্রাসাদ। দেয়াল-গুলো ফাঁপা। তার মধ্যে থাকে চোরাই আফিঙ চরস আর সোনার মোহর।

ঢোলগোবিন্দ তার স্বপ্নে মীনা পেশোয়ারিকে দেখে। ঢোলা পাজামা, ঢোলা পানজাবি, মাথায় ছোট্ট শিরপ্যাঁচ পাগড়ি। নেবুতলার গলির মোড়ে আগা-খাঁ নামের যে কাবুলিরা থাকে, যেন তাদেরই একজন।

দেয়ালে হাত বুলোতেই তার আঙুলের ডগায় (কী মোটা-মোটা আঙুল রে, বাবা) উঠে এসেছে তাড়া-তাড়া নোটের পেটমোটা বানডিল।

হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে বাছাধন এবার বাঁচতে চাইছে।

টাকা? কাকে টাকা দেখাচ্ছে মীনা পেশোয়ারি?

নীচে খৈনি মুখে দিয়ে অপেক্ষা করছে লাঠিহাতে এক ডজন আবগারি পুলিশ।

হুইসেলে ফুঁ দেবার আগেই মীনা পেশোয়ারির হাতে ঝিকিয়ে উঠেছে পিস্তল। পেছনে দরজা বন্ধ। পালাবার একটাই রাস্তা। বারান্দা থেকে লাফিয়ে জলের

পাইপটা ধরে ফেলা। তারপর রাস্তায় নেমে চোঁ-চাঁ দৌড়।

হুঁ। এমনি কড়া মানুষ হল গিয়ে ঢোলগোবিন্দর বাপ ক্ষিতীশ মুখুজ্যে আর জ্যাঠামশাই দীনেশ সেনগুপ্ত। আবগারিতে থেকেও জীবনে এক কানাকড়িও ঘুষ নেয় নি। সোজা কথা?

স্বপ্নটা হুবহু এইরকম ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে সে কি আজকের কথা?

বলে ভোরের স্বপ্ন সকালেই মনে থাকে না, তার আবার ষাট বছর আগে দেখা স্বপ্ন। ধ্যুত!

মা যখন ঝাঁকিয়ে নড়া ধরে তুলে দিলেন ট্রেন তখন সবে থেমেছে।

প্ল্যাটফরমের ওপর ডাঁই-করা লটবহর।

স্টেশনের নাম সান্তাহার জংশন।

তখন রাত ফরসা হয় নি। ল্যামপোসটে চিমনিতে ঢাকা তেল ফুরিয়ে আসা কেরোসিনের নিবু-নিবু আলো।

স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়ে চলে যেতে ঢোলগোবিন্দর চোখে পড়ল, রেললাইনের অনেক উঁচুতে একটা ওভারব্রিজ মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে পৃথিবীর হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে শূন্যে আড় হয়ে শুয়ে আছে।

পরে এই স্টেশনের ধারেই ঢোলগোবিন্দ আবিষ্কার করেছিল সার-সার এমন সব লোহার খাঁচা, যার মধ্যে আড়কাঠির দল ধলভূম সিংভূম মানভূম থেকে কালো-কোলো মানুষদের ফুসলে এনে জন্তুজানোয়ারের মতন গাদাবন্দী করে রাখত। তারপর লোহার শিক লাগানো মালগাড়িতে চাপিয়ে চা-বাগানের কুলিকামিন করার জন্যে তাদের কাউকে পাঠাত তরাইতে, কাউকে আসামের জঙ্গলে।

কিন্তু আসল কথা সেটা নয়।

আদত কথা হল এই যে, সান্তাহার জংশনে একগাদা লটবহরের মধ্যে মা-র আঁচল ধরে শীতে জবুস্থবু হয়ে বসে কোলের ছেলে ঢোলগোবিন্দ দেখেছিল তার জীবনে রাত পুইয়ে সেই প্রথম সকাল হতে।

লোক না, জন না। গাড়ি না, ঘোড়া না। আমাদের স্বস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুম ভেঙে শীতের কুয়াশা ভেদ করে ইস্টিশানে কেউই তখনও পেঁছে উঠতে পারে নি।

ভাগ্যিস।

নইলে অমন স্বর্গীয়ভাবে সকাল হতে জীবনে আর কখনও কি দেখতে পেতাম? মনে হয় না।

রাত্তিরে যে অন্ধকার দেখে ঢোলগোবিন্দ ভয় পেয়েছিল, সে অন্ধকারও তার জীবনে সেই প্রথম। নেবুতলার গলিতে তেমন অন্ধকার কোনোদিনই সে দেখে নি। গ্যাস আর বিজলির আলোয় রাত সেখানে দিন হয়ে থাকত।

চায়ের কড়া লিকারে একটু-একটু করে দুধ ঢাললে যেমন হয়, চোখের সামনে তেমনি করে বদলে যাচ্ছিল অন্ধকারের রঙ। যেন এতক্ষণ কাগজে কালি চলকে পড়েছিল, ব্লটিঙ পেপার দিয়ে কেউ তা শুষে নিচ্ছে।

মাথার ওপর আকাশ যে এত বড়ো হয়, ঢোলগোবিন্দ তাও কি ছাই জানত? আকাশ দেখেছে সে বড়ো জোর দোতলার চাতাল থেকে। যেন জ্যামিতির চতুর্ভুজ কোনো নকশা।

রাত ফরসা হওয়ার পর সূর্য ওঠার সম্ভাবনায় ডানদিকে লোকোশেডের মাথার ওপর লাজুক আকাশের গাল যখন সবে লাল হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই লোকজন নিয়ে হই-হই করতে-করতে আমাদের নিতে এসে গেলেন দীনেশ জ্যাঠামশাই।

যাচ্ছি নওগাঁয়।

পরে ভূগোলের বইতে পড়েছি—সান্তাহার পেরোলেই বগুড়া জেলা ছেড়ে রাজশাহীতে পা দেওয়া।

সেটা ছিল ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। নতুন বছরে নতুন জায়গায়।

জেলা বদলে ছুটে চলেছে মাথায় ছাত্রিবিহীন এক-ঘোড়ার আর দু-চাকার টমটম। দাদার 'হাসিখুশি'র পাতা থেকে উঠে আসা সেই 'এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে।' কোলের মধ্যে মা-র দুহাঁটু আঁকড়ে বসে আছি।

দুপাশে তাকিয়ে সব গিলছি। আকাশে মেঘের খেলা। ধু-ধু করছে মাঠ। আঁটি-আঁটি খড়। মাটির বাড়ি। ডোবাপুকুর। রাস্তার ধারে শিশিরে ভেজা ঘাস। বড়ো-বড়ো রেন্ট্রিগাছ। টেলিগ্রাফের তারে বসা ল্যাজ-ঝোলা পাখি।

স্থানীয় কেউ মা-কে সব চেনাতে-চেনাতে যাচ্ছিল।

এই হল পার-নওগাঁ। ছোট্ট বসতি। এবার আসবে ব্রিজ। এই হল যমুনা নদী। দেখবেন এর কী চেহারা হয় বর্ষায়।

ব্রিজের ওপর টমটমের টগবগে চাকার আবার সেই গুম-গুম আওয়াজ।

নীচে নেমে ডানহাতে পোস্টাপিস। রাস্তা চলে গেছে সোজা। বাঁদিকে অবিনাশবাবুর সোডাকল। সরকারি হাসপাতাল ছাড়িয়ে ডান-হাতে দেখছেন মস্ত পাঁচিল। এই হচ্ছে গাঁজা-গোলা। বছরের একটা সময় পুড়িয়ে নষ্ট করা হবে বাড়তি গাঁজা। গন্ধে সারা শহরের লোক তখন নাকে কাপড় চাপা দেবে আর খকখক করে কাশবে।

তারপর এস-ডি-ও-র বাঙলো, পেছনে নদী।

এই হচ্ছে ট্রেজারি। বারান্দায় অষ্টপ্রহর বন্দুক হাতে সেনট্রি। সন্ধেবেলায় ওর ধারকাছ দিয়ে যেই যাক, অমনি চ্যালেনজ করে হেঁকে উঠবে—হুকামদার! সঙ্গে-সঙ্গে যদি না বলেন, 'ফ্রেনড' গুলি মেরে আপনাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। অমন কত ঘটেছে।

বাঁয়ে দেখুন মুনসেফবাবুর বাঙলো। মাঠের পেছনে কালীবাড়ি। পাবলিক লাইব্রেরিও ওখানে।

এই যে কে-ডি হাইস্কুল। ছোটোকাকাবাবু এই ইস্কুলেই ভর্তি হবেন।

আর যে সামনাসামনি উঁচু দেয়াল দেখছেন, ওটা জেলখানা। ওর পেছনে দারোগাবাবুর বাসা।

ইস্কুলের পাশ দিয়ে বাঁদিকে এবার পশ্চিমমুখো সোজা রাস্তা। মোড়ে মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে ডানদিকে উকিলপাড়ার রাস্তা। বলিহারের রাজবাড়িও ওই রাস্তায়।

টমটমের দোলানি। ঘোড়ার গলায় টুঙ-টাঙ। টুঙ-টাঙ।

মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আর এই তো এসে গেলাম, সোনা।

মেসবাড়ির ঠিক পরেরটাই আমাদের কোয়ার্টার। সামনে লম্বা তারের বেড়াটা পেরিয়ে সদর রাস্তা। তারপর সরকারি পুকুর। পুকুর আর রাস্তার মাঝখানে তে-কাঠির মতো উঁচু-উঁচু লোহার বীম পুঁতে গদাম-গদাম শব্দে পিটিয়ে মাটিতে সেঁধিয়ে দিচ্ছে লম্বা-লম্বা পাইপ। ওখানে টিউবকল হবে।

মেসবাড়ির এ-কোণে থাকেন দীনেশ জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাই ইনসপেকটার তো। বিরাট বড়ো-বড়ো ঘর। ভেতরের উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘর। সবই বড়ো মাপের।

বাবা সাব-ইনসপেকটর। আমাদের কোয়ার্টারগুলো জোড়া-জোড়া। ইঁদারার আধখানা এদিকে, আধখানা ওদিকে।

গাড়ির পেছনে কাটা ঝিল। সবদিক সমান গভীর নয়। উত্তর-দিকটাতে খেলার মাঠে যাবার একটা সরু আলরাস্তা। শীতের দিনে ওদিকটাতে জল থাকে না। নীচে নেমে লুকোচুরি খেলা যায়। খিড়কির দিকটাতে তাবৎ বাড়ির ময়লা ফেলার জায়গা।

জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী মা-র চেয়ে ছোটো বলে কাকিমা বলতাম। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। ভারি সুন্দর মুখশ্রী। একহারা গড়ন। মা-র সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। ছায়ার মতন মা-র সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন।

ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। আজ আর আমাদের বাসায় উনুন জ্বলবে না। সকালে চা-পর্ব দিয়ে শুরু করে জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুবেলা ধুমধড়াক্কা খাওয়া। কাকিমা-র এইটুকুনি মেয়ে মঞ্জু। কী মিষ্টি দেখতে। তার ওপর হালকা। তাকে কোলে নেবার জন্যে আমাতে আর দাদাতে কী টানাটানি।

জ্যাঠামশাইরা সকালে খেতেন পেলেটি-র পাঁউরুটি। আঃ, যেমনি গন্ধ তেমনি সুতার। কেটে খোলা হল নতুন থিন-অ্যারারুটের টিন। নীচু হয়ে সেই টিনে নাক লাগিয়ে আমরা বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম।

এক অজানা নতুন জগতে যেন সেই প্রথম পা দিলাম।

কোয়ার্টারে আমাদের ছোটো-ছোটো তিনটে ঘর। যাটের কোলে মাথাগুনতিতে লোক আমরা খুব কম নই। বাবা-মা। ঠাকুর্দা। মেজোকাকার তখনও বিয়ে হয় নি। সেজোকাকা ছোটোকাকা দাদা-দিদি আমি।

গোছগাছের বড়ো একটা কিছু ছিল না। পায়াগুলোর নীচে ইঁট দিয়ে উঁচু করে ঘরে-ঘরে কয়েকটা তক্তাপোশ ফেলে তার তলায় টিনের ট্রাঙ্ক রেখে ঘরের জায়গা বাঁচানো। বাইরের ঘরে মা-বাবার বিয়ের খাট। বাবার সরকারি টেবিল আর একটা চেয়ার। কাঠের একটা বেনচি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে দরজা-জানলায় পরদা টাঙানোর রেওয়াজ তো দূরের কথা, বাড়িতে শাড়ির নীচে

শেমিজ কিংবা ব্লাউজ পরারও চল ছিল না। মঞ্জুর মা, কাকিমা অবশ্য পরতেন। কাকিমার দেশ ছিল বরিশাল। জ্যাঠামশাইদের ঢাকার সোনারঙ। ওঁরা সব শিক্ষিত বড়ো-ঘরের মানুষ। জ্যাঠামশাইয়ের বোন বুলুপিসিমা গ্র্যাজুয়েট তো ছিলেনই, ল পাশও করেছিলেন। করলে কী হবে, মাস্টারি বা ওকালতি কিছুই তাঁর জীবনে করা হয় নি। বয়স্ক বাবা, অসুস্থ ভাই, ভাইপো, ভাইঝি—এদের সামলাতে-সামলাতেই একদিন বুড়ো হয়ে গেলেন। জীবনে বিয়ে করাও আর হয়ে উঠল না।

দেয়ালে ফটো বলতে গোড়ায় শুধু ছিল সেরেস্তাদার থাকার সময় পেছনে দাঁড়ানো ঠাকুর্দা আর হাকিম আমলাদের নিয়ে একমাত্র গ্রুপফটো। পরে অবশ্য এই গ্রুপ-ফটোর সংখ্যা একটা দুটো করে বাড়তে থাকে। দেয়ালের বাকি সবই ছিল হয় ঠাকুরদেবতাদের ছবি, নয় রঙ-বেরঙের ছাপা ক্যালেনডার।

বাবার একটা দুর্বলতার কথা এইসূত্রে বলে নিই।

এক সময়ে বেআইনি আর বেকানুন কিসিমের লোকেরা সবাই জেনে গিয়েছিল যে, ক্ষিতীশবাবু ঘুষের কারবারে নেই। টাকাপয়সার রাস্তায় গেলে সুবিধে করা যাবে না। সুতরাং তারা কিছুদিন বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল নগদনারায়ণের বদলে ঘুরিয়ে কিছু করা যায় কিনা। তাতে হয়তো অজান্তেও ফাঁদে পা পড়তে পারে।

বাবার নাক ছিল বেশ লম্বা। হাজার চাপাচুপি দিলেও ঘুষের নামগন্ধ থাকলে ঠিক তিনি ধরে ফেলতেন। এসব ব্যাপারে বাবার সাংঘাতিক রকমের শুচি-বাই বাড়ির আর কেউ খুব একটা পছন্দ করত না। আদর করে কিংবা খাতির করে কেউ পুকুরের পাকা রুই, বাগানের তরকারি কিংবা দোকানের দইমিষ্টি পাঠালে—সেটাকেও ঘুষ বলে ধরে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরত পাঠাতে হবে? এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? আরে বাপু, টাকা তো নয়। বাবার অসাক্ষাতে এসব কথা যখন হয় মা-ও সায় না দিয়ে পারেন না।

অতই যদি হবে, এই যে নতুন বছরের ডাইরি-ক্যালেনডার আর ছাপ-মারা রকমারি উপহারগুলোর জন্যে উনি যে হা-পিত্যেশ হয়ে বসে থাকেন, কেউ দিয়ে গেলে আহ্লাদে আটখানা হন—তাতে বুঝি কোনো দোষ হয় না।

বাবার এই ছেলেমানুষিতে আমি আর দাদা বেশ মজা পাই।

হ্যাঁ, কথাটা হচ্ছিল দেয়াল সাজানোর ব্যাপারে। দেয়ালে গোড়ায় ছিল একটাই গ্রুপ-ফটো। সবেধন-নীলমণি হলেও ফটোটার মধ্যে একটা মজা ছিল। ফটোর লোকগুলো দু-সারিতে দাঁড়িয়ে বা বসে। একজন সাহেব আর চোখে পাঁসনেওয়ালা দু-একজন বাদে বাকি সবাইকে অবিকল একরকম দেখতে। মুখে চাপদাড়ি, টেরিহীন চুল, গায়ে একরঙা আচকান (ফটোতে সবই কুচকুচে কালো), পাশের দিকে বোতাম। কেউ একটু লম্বা, কেউ একটু বেঁটে, তফাত এই যা। দেখিয়ে না দিলে গ্রুপ থেকে ঠাকুরদাকে খুঁজে বার করা রীতিমত শক্ত ছিল।

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি ফটো এসে দেয়ালে ঠাঁই নিল। হাসি-হাসি মুখে মঞ্জুকে কোলে করে আছেন কাকিমা। দীনেশ জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী।

কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে অমন একটা ফটো এসে কেন আমাদের দেয়াল জুড়ল তার কারণটা পরে বলছি।

এদিকে নওগাঁয় পা দিয়ে প্রথমেই বাবার সম্বন্ধে লোকজনেরা এসে যা বলল শুনে আমরা তাজ্জব।

আমাদের নিয়ে আসার কিছুদিন আগেই বাবা নওগাঁয় এসে কাজে জয়েন করেছিলেন। এই একা থাকার সময় 'শীতবসন্ত' না কী একটা নাটকে যেন বাবা গান গেয়েছিলেন আর 'অলীকবাবু' গোছের প্রহসনে করেছিলেন কোনো একটা কমিক রোল।

আমরা যখন গিয়েছি তখনও শহরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে বাবার গান আর অভিনয়ের কথা।

আমরা বাড়ির লোকেরা কিন্তু এই শোনা কথায় কখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। বাড়িতে একটু-আধটু গুনগুন করলেও থিয়েটারের স্টেজে উঠে গলা ছেড়ে বাবা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গাইছেন, এ তো ভাবাই যায় না।

আর তার চেয়েও অবিশ্বাস্য কমিক রোলে বাবার অভিনয়।

বাড়িতে আমরা বাবাকে যমের মতো ভয় করতাম। বাবার ছিল টানা নাক। মুখ চোখও ভালো। ঘন কোঁকড়া চুল। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো ফরসা। একটু লালচে। দাদা-দিদিও বাবার রঙ পায় নি। আমার মা কালো। আমিও কালো। বাবা আমাকে ডাকতেন 'কালো' বলে।

কিন্তু বাবা যে স্টেজে উঠে কমিক রোল করে মানুষকে হাসিয়েছেন! না, মরে গেলেও বাড়িতে আমরা কেউ এটা বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। তা ছাড়া আর দ্বিতীয়বার কখনও স্টেজে উঠে বাবা সেটা আমাদের সামনে প্রমাণ করেও দেখান নি।

হ্যাঁ, তবে একটা কথা। আমার দাদা কিন্তু যেমন ভালো গান গাইতেন, মানুষকে হাসাবারও ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার ভাইপো জন্মাবার পর দাদাকে প্রায় দেখে নি বললেই চলে। তবুও গান গাইতে আর মানুষকে হাসাতে পারে। একে কি বলা যাবে বংশগতি? অথচ তা থেকে ছিটকে গিয়েছি আমি আর দিদি। তবু তো দিদি দেখতে ভালো ছিল।

সে যাই হোক, ছেলেবেলার সেই দিনগুলো ভারি আনন্দে কেটেছিল।

সেসব কথা মনে পড়লে ইচ্ছে করে আবার তেমনি ছোটো হয়ে যাই। তবে একা নয়। তেমনি সবাইকে নিয়ে।

[ক্রমশ

হৃদয়ে রজনী

সুধাংশু ঘোষ

এক

যদি ড্রাইভার তারাপদ ওই মোক্ষম মুহূর্তে গাড়িটাকে দারুণ দক্ষতায় বাঁ দিকে ছ ইঞ্চি সরিয়ে নিতে না পারত, বিশাল ভারি ট্রাকটার সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হত, দুমড়ে মুচড়ে থেঁতলে যেত এই গাড়ি, তাহলে একদম মরে যাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। একদম মরে গেলে, মৃত্যুর ঠিক আগের খণ্ডমুহূর্তে এই জগৎসংসারের কী পেতেন নিখিলরঞ্জন? তিনি একা কেন, গাড়ির অন্যদেরও দুর্ঘটনায় মৃত্যুই প্রায় অবধারিত ছিল। তারাই বা কী পেত, হুঁশ চলে যাবার ঠিক আগে?

তাঁর পাশে হৈমন্তী। আস্ত। ভেঙেচুরে যান নি। কেবল চার-পাঁচ সেকেন্ড একটা আতঙ্কের ঝাঁকানি লেগেছে মনে। সামনের সীটে সুবিনয় আর তারাপদ, কমবেশি অশোভন শব্দ খসাচ্ছিল মুখ থেকে, ট্রাকের ড্রাইভারকে গালাগালি দিচ্ছিল।

ট্রাকটা খুব উঁচু আর ভারি, মালবোঝাই। সামনের দিক থেকে আসছিল রাস্তা কাঁপিয়ে, ধুলো উড়িয়ে। একটুও বেগ না কমিয়ে একটা বাসকে ওভারটেক করতে গেল বেপরোয়া। বাসখানা থেমে যাত্রী তুলছিল। বাসের পাশ কাটানোর সময় ট্রাকটা নিখিলরঞ্জনদের গাড়ির প্রায় মুখোমুখি। বাঁচিয়ে দিল তারাপদ। নিমেষে গাড়িটা বাঁদিকে সরিয়ে নিল ছ ইঞ্চি। বাতাসের জোর ঝাপটা লাগিয়ে ট্রাকটা উধাও।

তারাপদর দক্ষতা কাজে না লাগলে, মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে, বেহুঁশ হতে-হতে এই জগৎসংসারের শেষ কী পেতেন নিখিলরঞ্জন? কিছু দেখতে পেতেন না। সামনেটা প্রায় ঢেকে ছোটোখাটো একটা পাহাড়ের মতন ট্রাকখানা তেড়ে এলে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। চোখ খোলা থাকলেও তেমন সুবিধে হত না। সময়টা উত্তীর্ণসন্ধ্যা। লোডশেডিং চলছিল। গভীর রজনী না হলেও বেশ অন্ধকার। ট্রাকের তীব্র হেডলাইট দুটো জ্বালা ছিল। চোখ খোলা থাকলেও ধাঁধিয়ে যেত। তাহলে তিনি শেষ কী পেতেন? গন্ধ। অনেক জিনিসের অদ্ভুত একটা মিশ্র গন্ধ। বেঁচে গেছেন বলে অধ্যক্ষের এই নতুন গাড়ির পিছনের সীটে বসে সেই গন্ধটা এখনো পাচ্ছেন, একটানা। শুধু বাতাস কমলে-বাড়লে, দিক বদলালে, গন্ধটা ঈষৎ বদলে যাচ্ছে।

দু রকমের ফুল দেখেছিলেন। গোলাপ আর রজনীগন্ধা। তার গন্ধ। মস্ত দুটো বাকসে সন্দেশ। বাকস দুটো রঙিন সুতো দিয়ে জড়ানো। গুনে দেখেন নি, বলা বাহুল্য, তবে অন্তত পঞ্চাশটা সন্দেশ হবে। তার গন্ধ। নতুন তাঁতের ধুতি, গরদের পানজাবি, সিলকের চাদর ভাঁজ করা রয়েছে। তাদের গন্ধ। পেট্রল, মোবিলের গন্ধ ছাড়াও অধ্যক্ষের এই নতুন গাড়ির একটা আলাদা গন্ধ। তাঁরা গাড়িতে ওঠার আগে তারাপদ সম্ভবত সিগারেট খেয়েছিল। তার গন্ধ। এত জিনিসের গন্ধের এক অদ্ভুত মিশেল। তারাপদ দক্ষ হাতে না বাঁচালে আজ কেবল এটুকুই পেতেন নিখিলরঞ্জন মৃত্যুর আগে।

অবশ্য হুঁশ চলে যাবার আগে, যত অল্পক্ষণের জন্য হোক, নিশ্চয়ই ভয়ংকর যন্ত্রণা পেতেন। ওই যন্ত্রণাবোধের সময় কি গন্ধটা পাওয়া সম্ভব ছিল? তা সম্ভব না হলে এই জগৎসংসারের শেষ কী পেতেন নিখিলরঞ্জন? শুধু খানিক মারাত্মক যন্ত্রণা?

এই জাতের যাচ্ছেতাই ভাবনা নিখিলরঞ্জনের মাথায় কিলবিলিয়ে উঠছিল কারণ চিরকালই তাঁর অনুভবে দারুণ ধার, আর সম্প্রতি তিনি ষাট পেরিয়েছেন, প্রায়শই শুনতে পান 'সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি'।

বত্রিশ বছর নিখিলরঞ্জন কলেজটায় কাজ করেছেন ঠিকই, তবু আজ সভায় মধ্যমণি হয়ে বসতে তাঁর তীব্র অনিচ্ছা ছিল। তিনি নিঃসন্দেহ, বেশ কয়েকজন অধ্যাপক —যাঁরা নিজের স্বার্থে ছাড়া এক ইঞ্চি নড়েন না—তাঁকে মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁরাও গাল ফুলিয়ে সভায় বক্তিমে করলেন, নিখিলরঞ্জনকে বললেন পরম সুহৃদ। মিথ্যে কথা বৃষ্টির মতন ঝরবে জানতেন। তাই তাঁকে নিয়ে সভা করায় তাঁর এত আপত্তি। এড়াতে অবশ্য পারেন নি। এমন অধ্যাপকও অনেকে আছেন যাঁদের কথা না মেনে পারেন না। যেমন সুবিনয়, তুষার, যারা একদা তাঁর ছাত্র ছিল, পরে সহকর্মী। এদের 'না' বলে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব।

সুতরাং আজ বিদায়সংবর্ধনাসভা হল। সাড়ে তিনটের বদলে শুরু হল চারটেয়, চলল সন্ধে অব্দি। শুরু থেকে কেবল পাখা ঘুরছিল, সন্ধে হয়ে আসতে আলো জেলে দেওয়া হল। তখন পাওয়ার-কাট হয় নি। তখন গোলাপ, রজনীগন্ধা, ধুতি, পানজাবি, চাদর, সন্দেশের বাক্স—যে জিনিসগুলো আজ উপহার পেয়েছেন—উজ্জ্বল আলোয় বড়ো চোখে লাগছিল, তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল, খানিকটা লজ্জা।

নিখিলরঞ্জনের ক্লাসে খারাপ ছেলেমেয়েরাও চুপ করে থাকত, গোলমাল করত না। এটা কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়। যেসব অধ্যাপকের আন্তরিকতা ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে, তাঁদের ক্লাসে তারা শান্ত হয়েই থাকে। অথচ কোনো-কোনো অধ্যাপকের তা ভালো লাগে না। তেমন একজন নিখিলরঞ্জনের ক্লাসে গোলমাল করার উশকানি দিতে একঝাঁক খারাপ ছেলেমেয়েকে দোকানে নিয়ে গিয়ে ছাট-মাংসের চপ খাইয়েছিলেন। তিনিই আজ সভায় বললেন, নিখিলরঞ্জনের মতন প্রিয়জন তাঁর বেশি নেই। অবসর নেবার পর নিঃসঙ্গ কর্মহীন জীবনে নিখিলরঞ্জন যেন তাঁর প্রিয় সুহৃদদের মনে রাখেন।

এই জাতের সভায় বিদায়ী ব্যক্তিটির মন বড়ো বিষণ্ণ থাকে। কিন্তু আজ নিখিলরঞ্জনকে ওই অধ্যাপকের কথা শুনতে-শুনতে প্রচুর কসরত করে চাপা হাসি আরো চাপতে হয়েছিল। তাঁর নিজের বিদায়ী ভাষণের সময় তিনি ওই অধ্যাপকের মন্তব্য স্মরণ করে বলেছিলেন, অবসর নেবার পর তিনি কর্মহীনতার আলস্যে অথবা নিঃসঙ্গতায় মোটেই ভুগবেন না। চাকরির চাহিদা মেটাতে তিনি এতকাল জীবনের সমান আকর্ষক অন্যান্য দিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছিলেন। এবার সেগুলো পুরো খুলে দেবেন। তাঁর কাজের অভাব হবে না, সঙ্গীর অভাব হবে না।

বুড়ো বয়েসে একঘর লোকের মাঝখানে কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসা, চোখ ভিজে ওঠা বড়ো লজ্জার ব্যাপার। সেসব চাপা দেবার জন্য এবং যে-অধ্যাপক ছেলেমেয়েদের ছাটমাংসের চপ খাইয়েছিলেন তাঁর মন্তব্য ভুলতে না পারায়, বড়ো গলায় বলেছিলেন বটে তিনি অবসরের একঘেয়েমিতে ভুগবেন না, কিন্তু এখন বাড়ির কাছাকাছি এসে নিখিলরঞ্জন কেমন এক শূন্যতার স্বাদ পাচ্ছিলেন। শুধু মনের শূন্যতা নয়, শরীরও অবশ লাগছিল। সত্যি, কী আছে তাঁর সময় কাটাবার? স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতন মানুষের যা থাকবার কথা তা আছে। অজস্র বই আছে। একবারও পড়তে পারেন নি অথচ পড়বার খুব ইচ্ছে এমন বইও জমিয়ে রেখেছেন প্রচুর। তবে তাঁর সন্দেহ তিনি ঠিক তেমন পড়ুয়া নন

যিনি কেবল বই সংগী করে তৃপ্ত থাকতে পারেন। তা ছাড়া ইদানীং চোখ কাহিল। একটানা পড়তে কষ্ট।

অন্য যে সংগী, হৈমন্তী, তিনি আমূল বদলে গেছেন গত কয়েক বছরে। একটিই সন্তান, একটি মেয়ে। হৈমন্তীর ইচ্ছেমতন তার পুরনো ধাঁচের নাম, জনা। তার মা-বাবার চোখে তার মতন সুন্দর দ্বিতীয় নেই। পড়াশোনায় সে নিখিলরঞ্জনের থেকেও ভালো। কিন্তু জনার বয়েস এখন ছাব্বিশ। যার বয়েস ছাব্বিশ তার তো মা-বাবার সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরে নিজের মহলের আলাদা একটা বৃত্ত তৈরি হয়ে যাবেই। বছর দুই আগে রিসরচ করবার জন্য বিদেশে গিয়েছে জনা। একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রিসরচ করতে এদেশের একটি অবাঙালি ছেলেও গিয়েছে। জনা তার শেষ চিঠিতে জানিয়েছে, ওরা এখন স্বামী-স্ত্রী, ওরা বিয়ে করেছে কাগজে সই করে।

মেয়ে এখানে থাকতেই বদল শুরু হয়েছিল হৈমন্তীর। জনার শেষ চিঠি পাবার পর হৈমন্তী একে-বারে অন্য মানুষ। পুরোপুরি ডুবে গেছেন নিজের মধ্যে। জনা লিখেছে, ওরা দেশে ফিরলে মা-বাবার যেমন খুশি বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানে ওরা রাজি। কিন্তু দেশে ফিরতে এখনো তো অন্তত দেড় বছর। ততদিন, ততদিন অপেক্ষা করবার অবকাশ যদি না মেলে হৈমন্তীর, নিখিলরঞ্জনের!

আজ তাঁর সংগে সভায় যেতে চান নি হৈমন্তী। সুবিনয় জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। অত মানুষের মাঝখানে চুপচাপ বসে ছিলেন, একটাও কথা বলেন নি। বেশ অশোভন। এখন গাড়ির সামনের সীট থেকে সুবিনয় ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কলেজে গিয়ে আপনার খুব খারাপ লাগল, বউদি?

হৈমন্তীর মুখ থেকে একটিমাত্র একমাত্রিক শব্দ খসল, না।

উপহার-পাওয়া জিনিসগুলো সযত্নে গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে এল সুবিনয়। অন্যান্য জিনিস ছাড়াও একটি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত মানপত্র ছিল। সেটাকে টাঙিয়ে দিল বসার ঘরের দেয়ালে। সুবিনয় একটু চা খেয়ে যাবে কিনা হৈমন্তী জানতে চাইলেন। চা না খেয়েই সুবিনয় চলে গেল অধ্যক্ষের গাড়ি নিয়ে। সভায় একবার কফি, একবার চা খেয়েছে। আর খাবে না।

বিকেল-সন্ধের মধ্যে নিখিলরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম হৈমন্তী কথা বললেন, তুমি কি একটু চা খাবে?

তুমি খাবে?

না।

তাহলে আর দরকার নেই।

আগেকার দিন হলে হৈমন্তী এর পর বলতেন, আমি না-ই বা খেলাম। আমি তো তোমার মতন চা ভালোবাসি না। তোমাকে এক কাপ করে দিই। এখন হৈমন্তী শাড়ি বদলাতে না গিয়ে নিখিলরঞ্জনের দু-হাত দূরের চেয়ারটায় বসলেন চুপচাপ। নিখিলরঞ্জন ঘরে ঢুকেই হয়তো বা ক্লান্তিতে বসে পড়েছিলেন দরজার সব থেকে কাছের চেয়ারটায়। দুজনের সামনের দেয়ালে জনার একটি আলোকচিত্র। পুরীর সমুদ্রতীরে বসে তিন বছরের মেয়ে দুহাতে আধভেজা বালি মেখে হাসছে। ছবিটা নিখিল-রঞ্জনই তুলেছিলেন নিজের ক্যামেরায়। ছবিটার দিকে অনিবার্য চোখ পড়ায় দুজনেরই মনে হল, ওই আধভেজা বালি কবেই শুকিয়ে ঝরে গেছে ছোটো দুখানা মেলে-ধরা হাত থেকে। যার হাত তার বয়েস ছাব্বিশ পূর্ণ হল এই বৈশাখে।

শেষ বৈশাখের বাতাসের একটা ঝাপটা এল। তেমন জোরালো নয়। কোনো শব্দ হল না। ক্যালেনডারের ওপরের পাতাটি সামান্য উড়ল মাত্র। ঘরে যথেষ্ট আসবাব, দেয়াল-তাকে, কাচের আলমারিতে, টেবিলে থরে-থরে বই। তবু নিখিলরঞ্জন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, সারা ঘরে হা-হা করে উঠল শূন্যতা।

দুই

পাখির ডানার মতন ভুরু নয়, গোঁফ। ভুরু খুব মোটা। টিয়ে-ঠোঁট নাক। লম্বাটে মুখ। মাথায় প্রচুর চুল, তবে ছোটো করে ছাঁটা। হাতে গড়গড়ার নল। সোজা হয়ে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট দশ ইনচি। নিশীথরঞ্জন, পিতৃদেব নিখিলরঞ্জনের। সফল ব্যবসায়ী। এগারো মাঝির বিশাল এক বজরার মালিক। সিঁড়ে লাগত বজরায় উঠতে-নামতে। টিন আর অ্যাসবেসটস বোঝাই করে নিয়ে যেত সেই বাণিজ্যতরী এক গঞ্জ থেকে অন্য গঞ্জে।

একবার অভাবনীয় বন্যা। নদীর পাড় ভেসে গেল। পাড় ভেসে হু-হু করে জল এসে গেল ধানখেতে। এক বিকেল আর রাতের মধ্যে ধানখেত দেড়মানুষ জলের তলায়। চারপাশ থেকে মাটি কেটে তুলে নিয়ে টিলা বানিয়ে তার ওপর ঘরবাড়ি করেছিল গ্রামের মানুষ। ফলে প্রত্যেকটি বাড়ি ঘিরে একটা করে গড়খাই, দুর্গ ঘিরে যেমন পরিখা। এমনিতে সারা বছর গড়খাইতে জল থাকে। সেবারে নদীর পাড় ভাসিয়ে, ধানখেত ডুবিয়ে বন্যার জল এসে নামল গড়খাইতে। টিলাগুলো উঁচু বলে কোনো বাড়ির ভেতরে অবশ্য জল ঢুকল না। এক-একটা টিলা ঘোলা জলের সমুদ্রে জেগে রইল এক-একটা দ্বীপের মতন।

নিশীথরঞ্জনের বাড়ির দক্ষিণে নদী, প্রায় সিকি মাইল দূরে। তাঁর বাণিজ্যতরী নদী থেকে ওই সিকি মাইল দূরত্ব পেরিয়ে কোনো দিন বাড়ির খুব কাছে আসতে পারে নি, কারণ মাঝখানে ধানখেত। সেবারের বন্যায় ধানখেতগুলো দেড়মানুষ জলের তলায় ডুবে গেলে নিশীথরঞ্জন তাঁর বিশাল বজরা এনে ভিড়িয়েছিলেন একেবারে বাড়ির কোলে।

তখনো ভালো করে আলো ফোটে নি। বাড়িতে কাজ করে যে-স্ত্রীলোকটি, সে মসৃণ কাঠের পাটার ওপর আছড়ে-আছড়ে কাপড় কাচছিল। মাথার ওপর তুলে পাটায় আছড়ে কাপড় কাচলে অংগে ঢেউ খেলে যায়। মানুষজনকে সেই ঢেউ দেখাতে চায় না যুবতীটি। ভোর হওয়ার আগে, যখন লোকজন ঘর থেকে বেরোয় নি, সে মেহনতের কাজটা সেরে নিচ্ছিল নিজের অংগের আলোড়ন আবছা অন্ধকারে ঢেকে। মাত্র কয়েক হাত তফাতে নিশীথরঞ্জনের বজরা নোঙর করা ছিল। অল্প গরম নোংরা সোডার জল ছিটকে গিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল বজরার গলুইয়ের একপাশ।

ঠিক সেই সময় নিশীথরঞ্জন একটা স্বপ্ন দেখ-ছিলেন। মধ্যরাতে শুতে যাওয়ার অভ্যেস। রোদ না উঠলে বিছানা ছাড়েন না। সেদিন ভোরের আগের ঘুমের মধ্যে তিনি এমন এক স্বপ্ন দেখলেন যা তাঁকে দারুণ ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলল। স্বপ্ন তো কত অদ্ভুত রকমের। নিশীথরঞ্জনের সেদিনের স্বপ্নটা বড়োই বিচিত্র। স্বপ্নে তাঁর বাণিজ্যতরী নাকি ভেসে এসে থামে তাঁর গভীর দৃষ্টির সীমায়। তিনি স্পষ্ট কয়েকটা কথা শুনতে পান। বুঝতে পারেন, সেই অভিমানী কণ্ঠস্বর তাঁর বাণিজ্যতরীর। স্বপ্নের বাণিজ্যতরী বলছিল, তোরা এভাবে আমায় অপমান করলি! নোংরা সোডার জল ছেটালি আমার গায়! আমি আর তোদের কাছে থাকব না।

ঝাঁকানি খেয়ে নিশীথরঞ্জন জেগে উঠে প্রথমে কেবল নিজের হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি টের পেলেন। তারপর পুবের আকাশে দেখলেন ঈষৎ আলোর আভাস। ভাব-লেন, সময়টাকে ভোরবেলা বলা যায় এবং ভোরবেলার স্বপ্ন প্রায়শই সত্যি হয়। তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল, বিশেষত ওপরের ঠোঁট। সংগে-সংগে তাঁর পাখির ডানার মতন গোঁফের দুই প্রান্তও কাঁপল দু-তিনবার।

এসব হয়েছিল শ্রাবণের মাঝামাঝি। ভাদ্রের শেষের দিকে, কোনো-কোনো জায়গায় আশ্বিনের শুরুতে বন্যার জল নেমে গিয়েছিল। শীতের সময় সারারাত শিশিরে ভিজেও সারাদিনের কড়া রোদ্দুরে খেতখামার আবার খটখটে। নদীর জল পাড়ের পাঁচ ফুট নীচেয়। পৌষ মাসে নিশীথরঞ্জন বজরা মেরামত করালেন। মেরামতের কাজ শেষ হলে পুরু করে আলকাতরা মাখালেন বজরার সর্বাংগে, গলুইতে তেল-সিঁদুর, ফুল, ধূপের ধোঁয়া। নিশীথরঞ্জনের বুকের ধুকপুকুনি আগেই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, এখন বজরার তোয়াজ-টোয়াজ করে ভাবলেন, ভোরের স্বপ্ন সব সময় সত্যি হবে এমন কোনো কথা নেই।

এত কিছু করলেন, দুর্ভাবনা থেকেও মুক্তি পেলেন বলা যায়, অথচ পরের চৈত্রের এক ঝড়ের রাত্তিরে বাণিজ্য-তরী ডুবে গেল বাড়ির বেশ কাছেই। বজরাতেই ছিলেন নিশীথরঞ্জন। গড়গড়ার নল আলতো ধরে বসে থাকার অবস্থা ছিল না। মাঝিদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়ের সংগে তাদের লড়াই দেখছিলেন, কখনো বা গলা চিরে চেঁচিয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সেই রাতে ঝড়ের গর্জন পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে পেঁছে দেবার জন্য নদীর জলের ঘূর্ণি পাতালে নেমে যাচ্ছিল। সেইসব ঘূর্ণির সংগে বিশাল বজরাও নেমে গেল পাতালে।

অমন বজরা ডুবে গেল, কিন্তু এগারো জন মাঝি, নিশীথরঞ্জন নিজে, তাঁর কাজ-টাজ করার একটি লোক—এই তেরো জনের কারো মৃত্যু হল না জলে ডুবে। এমন মজা, বজরা ডুবে যাবার পরই ঝড়ের দাপট কমে এল, নদী কিছুটা শান্ত।

প্রথমে বুঝতে পারা যায় নি যে সবাই কাছে-দূরে পাড়ে উঠেছে। সেই রাত্তিরটার গায়েও আলকাতরা মাখানো ছিল। তেরো জনের নদীর পাড়ে এক জায়গায় জড়ো হতে সময় লেগেছিল ঘণ্টাখানেক।

দশদিন ধরে অনেক লোক লাগিয়ে প্রচুর কসরত করে মারাত্মকভাবে জখম বাণিজ্যতরী টেনে তোলা হয়েছিল নদীর পাড়ে। টিন-অ্যাসবেসটস বেশির ভাগই ভেসে গিয়েছিল। এই দুর্ঘটনায় ব্যাবসার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। নিশীথরঞ্জনের। বজরা আর কোনোদিন জলে ভাসে নি। হয়তো মেরামত করে ভাসাবার বাসনা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি, কারণ ওই দুর্ঘটনার পরে নিশীথরঞ্জন বেঁচে ছিলেন মাত্র আট মাস।

জমিজমার প্রতি নিশীথরঞ্জনের তেমন আকর্ষণ ছিল না. ব্যাবসা নিয়েই মেতে ছিলেন। বিপত্নীক হয়েছিলেন মধ্যযৌবনে. ছেলে থাকত কলকাতার কলেজের ছাত্রাবাসে, নিজে বজরায়ই কাটাতেন মাসের পর মাস. ঘুরতেন গঞ্জ থেকে গঞ্জে। ব্যাবসায় ঘা খাওয়ার পর যে-আটমাস বেঁচে ছিলেন. ঠাট বজায় রাখবার জন্য যেটুকু জমি ছিল বেচে দিচ্ছিলেন। বেশি দিন বাঁচলেন না বলে অল্প কিছু জমি থেকে গিয়েছিল।

নিশীথরঞ্জনের মৃত্যুর পর কত বছর কাটল. তাঁর বাণিজ্যতরীর কঙ্কাল কিন্তু রয়েই গেল নদীর পাড়ে। দুর্ঘটনার পর যেখানে টেনে তোলা হয়েছিল সেখান থেকে সরে যায় নি. কারণ সেবারের মতন বন্যা আর হয় নি। নদীর ওপর দিয়ে ঝোড়ো বাতাস অবশ্য বয়ে এসেছে ঝড়ের ঋতুতে, বজরার ভাঙা টুকরো উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে খানিক তফাতে। নদীর পাড়ে ফাঁকায় প্রায় সব সময়েই তো বাতাসের জোর ঝাপটা. বজরার ফাটা কাঠের পাঁজরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে-যেতে কখনো নরম, কখনো ধারালো শিশ দিয়ে যায়। কখনো পাখিরা ঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে ফাঁকফোকর দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে যায়, কখনো সাপের খোলসের এক প্রান্ত কাঠের খাঁজে আটকে গিয়ে উড়তে থাকে ঘুড়ির লেজের মতন, অথবা মন্দিরের চুড়োয় বাঁধা বাঁশের ডগায় নিশানের মতন। তখন অবশ্য পাখিরা সব উধাও। বাচ্চাদের ভয় দেখানো হয়, বজরার মধ্যে ডাকাতরা লুকিয়ে আছে। কেউ বজরার কাঠ ভেঙে নিয়ে যায় না। সংস্কার হয়তো। নদীর তীরে বাস, সবাইকে নৌকো ভাসাতে হয় জলে। রোদ বৃষ্টি ঝড় ছাড়া আর কেউ ক্ষতি করে না বাতিল বাণিজ্যতরীর।

তিন

চাকরি থেকে অবসর নেবার পর নিখিলরঞ্জন আশ্বিনের শেষে চলে এলেন গ্রামের বাড়িতে।

এত বছরের শহরবাস, হলই বা ভাড়া-করা ফ্ল্যাট, একটি-একটি করে কত জিনিস জড়ো হয়েছিল। তার প্রত্যেকটি প্রাত্যহিক প্রয়োজনে না লাগলেও জড়িয়ে গিয়েছিল জীবনে। বইয়ের সংগ্রহ বাড়তে-বাড়তে একটা ছোটোখাটো গ্রন্থাগারের আদল নিয়েছিল। এসব গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসতে খুবই ঝামেলা হল। উপায় তো নেই। এত কালের পুরনো সংসার মহানগর থেকে গ্রামের বাড়িতে তুলে আনা যতই কঠিন হোক, কাজটা সারতে হল। চাকরি ছাড়ার পর, গ্রামে নিজের বাড়ি থাকতে শহরের ফ্ল্যাটের জন্য মাসে-মাসে অতগুলো টাকা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। জনা দেশে থাকলে তবু অন্যরকম ভাবা যেত।

নিখিলরঞ্জন একটা তত্ত্বকথা মাঝে-মাঝেই বলেন। এটা তাঁর একটা প্রিয় থিওরি। কোনো মানুষ সারা জীবন শুধু গ্রামে বাস করলে, অথবা আগাগোড়া কেবল শহরে থাকলে মনের দিক দিয়ে ভোঁতা হয়ে যায়। শৈশব যদি গ্রামে কাটে, তারপর লাগে বড়ো শহরের আঁচ, একমাত্র তাহলেই অনুভবের ধার বাড়ে। কাজের চাকায় ঘোরার দিন ফুরোবার পর আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারলে বৃত্তটি পূর্ণ হয়।

এমন গালভরা তত্ত্বকথা তাঁর মনে আসার কারণ তিনি নিজে তাঁর তত্ত্বের একটি দৃষ্টান্ত। তাঁর থিওরি অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসের ওপর যে, শহরের আঁচ গ্রামের গায়ে তেমন লাগে না, শহরের বিষ গ্রামে ছড়ায় না।

আশ্বিনের শেষে নিজের বাড়ির বারান্দা থেকে নিখিলরঞ্জন প্রথমেই দক্ষিণে নদীর দিকে তাকালেন। এত দূর থেকেও বজরার কঙ্কাল দেখতে পেলেন অস্পষ্ট। নদীর উঁচু পাড়ে একটা ছোটো একতলা পোড়োবাড়ির মতন। নিখিলরঞ্জনের চোখ তৃপ্ত হল।

বাড়ি থেকে নদী সিকি মাইলের বেশি নয়। আগেকার দিনে নদীর তীর অব্দি যেতে-আসতে স্রেফ মেঠো পথে হাঁটতে হত। বছর চার হল উঁচু রাস্তা হয়েছে। নিখিলরঞ্জন রোজ বিকেলে নদীর তীরে বেড়াতে শুরু করলেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে, জ্যোৎস্না থাকলে, এক-একদিন ফিরতে সন্ধে হয়ে যাচ্ছিল।

পরপর দুদিন ওইরকম দেরি হওয়ায় হৈমন্তী তাঁর আপত্তি জানালেন—অতটা পথ আবছা অন্ধকারে হেঁটে আসা ভালো নয়।

নিখিলরঞ্জনের যুক্তি হল, ডাক্তার তাঁকে রোজ ঘণ্টাখানেক হাঁটতে বলেছেন। বেড়াবার ভালো সময় ভোরবেলা আর শেষ-বিকেল, যখন রোদ মরে যায়। তাঁর ভোরবেলা বিছানা ছাড়ার অভ্যেস নেই। চাঁদের আলোয়, এমনকি শুধু তারার আলোয় উঁচু রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরলে কোনোরকম বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।

হৈমন্তীর তবু মন্তব্য, বাড়ির বাগানের সামনে অতটা খোলা জায়গা। ওখানেই তো পায়চারি করা যায়।

যুক্তিহীন আবেগের প্রতি প্রশ্রয় প্রার্থনার ভঙ্গিতে নিখিলরঞ্জন বললেন, ডাঙায় টেনে তোলা নৌকোটা রোজ একবার ছুঁয়ে আসতে ইচ্ছে হয়, বুড়ি ছোঁয়ার মতন। তা না পারলে মনে হয়, বিশেষত যখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, একটা দিন মিথ্যেই চলে গেল। যদি বাঁকা করে না হাস তো একটা কথা বলি। এখানকার চাষীদের মুখে একটা কথা শুনেছ তো? ওরা বলে, সাঙাত। আমার কেন যেন মনে হয়, ভাঙা নৌকোটা জীবনের সাঙাত। ওটা যদি জলে ভাসত, জীবন চলত পুরোদমে। আমার জীবন তো আর পুরোদমে চলছে না। তাই ওটাকে বড়ো আপন লাগে।

মাঝে-মাঝে এমন কাব্য করে একটানা কথা বলা নিখিলরঞ্জনের চিরকালের স্বভাব। হৈমন্তীর ভালোই জানা আছে। বাঁকা করে হাসলেন না। চুপ করে গেলেন। কারণ. কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ঠিকানাবদলের খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জনাকে। এখনো অবশ্য গ্রামের ঠিকানায় জনার কোনো চিঠি আসে নি। সময় হয় নি হয়তো চিঠি আসবার। নিখিলরঞ্জন পেনসন পান না। তবে ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদ আসে মাসে-মাসে। সামান্য কিছু জমি এখনো আছে। প্রসন্ন নামের এক ভাগচাষী সেখানে ফসল ফলায়, নিখিলরঞ্জনকে ফসলের ভাগ দেয়। এভাবে চলে যাচ্ছে ভালোই। খাওয়া-দাওয়া আগের থেকে একটু অন্যরকম হলেও খারাপ বলা যায় না। একটা কেবল খুচরো অসুবিধে। পছন্দমতন চা পাওয়া যায় না। বাজারের দোকান থেকে কেনা দামি প্যাকেটের চা-ও তেমন তাজা নয়।

এভাবেই চলবে শেষ দিন পর্যন্ত। শেষ দিনের আগে জনা ফিরে এলে কি দিনযাপনের এই নকশা একটু বদলে যাবে?

এখানকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন নিখিলরঞ্জন, তৃপ্তই বলা যায়। আচমকা একটা ঘা খেলেন দু মাস যেতে না যেতে। বাড়ির বেশ কাছে ধানকাটা নিয়ে দুই দলে হাঙ্গামা, রক্তারক্তি। প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল, দু-চারজন খুন হবে। সাংঘাতিক জখম হলেও মরল না অবশ্য কেউ। হাঙ্গামার সঙ্গে নিখিলরঞ্জনের কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবু তাঁর মন খানিকটা তেঁতো হল।

কে জমির আসল মালিক, কে ভাগচাষী আর কে খেতমজুর, কে ফসলের কতটা ভাগ পাবে, চাষী বীজ-কীটনাশক ইত্যাদি দিলে ফসলের ভাগ কেমন হবে—এ ধরনের প্রশ্নে সম্প্রতি কয়েক বছর চাষবাস যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, নিখিলরঞ্জন তা জানতেন না এমন নয়। তবে এসব নিয়ে তাঁর চোখের সামনে কাটাকাটি, রক্তারক্তি এর আগে হয় নি। অঘ্রানে ধানের ধানপাতার সোনারঙ। তার ওপর ছিটকে আসা রক্তবিন্দু দেখবার জন্য তৈরি ছিলেন না নিখিলরঞ্জন।

ধানকাটা নিয়ে হাঙ্গামার এক সপ্তাহের মধ্যে একজনের গোলার ধান লুট হল, এক চাষীর বাড়ির খড়ের চালে কারা আগুন লাগাল। একজনের একটা দুধেল গাই মাঠে ঘাস খাচ্ছিল। সন্ধেয় তাকে গোয়ালে আনবার সময় দেখা গেল, তার পিঠে তেরছা করে রামদার এক কোপ মেরে গেছে কেউ। গাইটার পিঠের ধানরঙ লোম রক্তে ভিজে আছে। মাছি বসছে তার ওপর। গাইটা মাছি ওড়াতে লেজ আছড়াচ্ছে ঘন-ঘন।

নদীতে কাছে-দূরে নৌকো ছিল। ছোটো নৌকো, বিশাল বজরা নয়। অঘ্রানে নদী শান্ত বলে ছোটো নৌকোও ঢেউয়ের চুড়োয় উঠে নাচ দেখাতে পারছিল না। দূরের নৌকো নেহাত ডিঙির মতন দেখাচ্ছিল। শেষ-বিকেলে হাওয়া ছিল অবশ্য এলোমেলো। নদীর পাড়ে পায়চারি করতে-করতে আজ এসব দেখতে ভালো লাগছিল না নিখিলরঞ্জনের। জলের ওপর দিয়ে, ধানখেতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাস বুকে টেনে নিয়ে অন্য

দিনের মতন মনে হচ্ছিল না এখানে চলে এসেছেন বলে দু-এক বছর বেশি বাঁচবেন। আজ বরং নদীর পাড়ে পশ্চিম দিকে অনেকটা হেঁটে গিয়ে কালচে পোড়া মাটিতে ঠিক সেই দুটো জায়গা খুঁজে দেখছিলেন যেখানে দশ বছরের ফারাকে তাঁর মা-বাবাকে পোড়ানো হয়েছিল।

পশ্চিমের ওই জায়গাটায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, মরা আলোয় সীসের রঙ ধরায় নিখিলরঞ্জন নদীর পাড় বরাবর ফিরছিলেন পূব দিকে। বজরার কঙ্কাল ছুঁয়ে উত্তর বাড়ির দিকে উঁচু রাস্তায় উঠবেন। বজরার পনেরো-কুড়ি হাত দূর থেকে মনে হল, লাল কাপড়ের দু-একটা ছেঁড়া চিলতে কাঠের খাঁজে সেঁটে গেছে কোনোভাবে, ঝুলছে। কয়েক পা এগিয়ে যেতে নিখিলরঞ্জনের জোর ঝাঁকানি লাগল। লাল কাপড় নয়, রক্ত। ফাটা কাঠ বেয়ে রক্তের ছড় নেমেছে।

পচা কাঠ ভেঙে-ভেঙে বজরার গায়ের নানা জায়গায় ফাঁক-ফোকর, জানলা-দরজা হয়ে আছে। একটা জানলায় চোখ রাখলেন নিখিলরঞ্জন। বাণিজ্যতরীর খোলের মধ্যে এদিকের কাঠের সঙ্গে লেপটে আছে একটি মেয়ের রক্তাক্ত লাশ। শাড়ি-জামা ছিঁড়ে ফালাফালা। প্রায় নগ্ন যুবতী-শরীর। এক নজরেই বোঝা যায়, ধর্ষিত হয়েছে, তারপর মরেছে ছুরির ঘায়।

এই বয়েসে লাফালাফি-দাপাদাপি অশোভন। তবু নিখিলরঞ্জন উঁচু রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে দৌড়চ্ছিলেন বলা যায়। উলটো দিক থেকে তিন-চারটি লোক আসছিল। অস্থির, বিভ্রান্ত তাদের হাঁটা এবং দৃষ্টি। নাম জানা নেই, তবে মুখ চেনা, লোকগুলো পশ্চিমপাড়ার চাষী। নিখিলরঞ্জন থামলেন। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে ফ্যাস-ফেসে গলায় বলতে পারলেন, বজরার মধ্যে একটা মেয়েকে কারা মেরে রেখে গেছে।

লোকগুলো শুধু একবার নিখিলরঞ্জনের দিকে বিহ্বল তাকিয়ে ছুটল বজরা লক্ষ্য করে। ওদের মধ্যে যার জোয়ান বয়েস তার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল। ওই শব্দটাকেই ডুকরে কেঁদে ওঠা বলে কিনা নিখিলরঞ্জন ঠিক বুঝতে পারলেন না। জখম অথবা খ্যাপা জন্তুজানোয়ারও ওই রকম শব্দ করে এক-এক সময়।

উঁচু রাস্তা থেকে নেমে পশ্চিম দিকে মেঠো পথে পা বাড়িয়ে নিখিলরঞ্জনের আচমকা খেয়াল হল, জনা আর বজরার মধ্যে যার লাশ সেই মেয়েটির কাছাকাছি বয়েস। দুজনেই বিবাহিতা। তবে বিবাহিতা জনাকে তিনি এখনো দেখেন নি।

এক যুগ পরে পশ্চিমপাড়ায় প্রসন্নর বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছোটোবেলায় গিয়েছেন ওর বাড়িতে। প্রসন্ন এখনো তাঁর সামান্য জমিটুকু চাষ করে। তাঁকে দেখে তটস্থ। ব্যস্ত হয়ে দাওয়ায় বসতে দিল। নিখিলরঞ্জনের কথা শুনে প্রসন্ন ঝিম মেরে রইল দশ সেকেন্ড। তারপর মুখ খুলল।—কী সংবাদ দেলেন কত্তা! অনন্তর ঘরসংসার তছনছ হয়ে গেল! কাল সন্ধে থেকে অনন্তর ছেলের বউটাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটার সব্বোনাশ হয়ে গেছে, পরানটাও নাই। যাদের আপনি দেখলেন তাদের মধ্যে ঢ্যাঙা জোয়ানটা অনন্তর ছেলে, কানাই। ওর মাথায় ফেট্টি দেখলেন না? ধানকাটা নিয়ে হাঙ্গামায় ওর মাথায় চোট লাগে।

দম নিয়ে প্রসন্ন আবার বলল, আপনি আসেন কত্তা। বাড়ি যান। আমার তাড়াতাড়ি ওইখানে যাওয়া দরকার। মনে হচ্ছে, কানাইয়ের সঙ্গে আর যাদের দেখলেন তারা পঞ্চায়েতের।

নিখিলরঞ্জন উঠছেন না দেখে প্রসন্ন বলল, আপনি তো খোঁজখবর রাখেন না। আপনাদের পূবপাড়ার যামিনী মজুমদারের বিস্তর জমি। চাষ করে অনন্ত মণ্ডল, বহুকাল থেকে, ভাগচাষী। এখন যামিনী মজুমদার প্রমাণ করতে চায় অনন্ত ভাগচাষী না, খেতমজুর। তাহলে আর ফসলের আধাআধি ভাগ দিতে হবে না। দু মাস আগে সদর থেকে আমলারা এসেছিল, পঞ্চায়েত ছিল,—প্রমাণ হয়ে গেছে যে অনন্ত বর্গাদার। কিন্তু মজুমদার তা মানছে না। এই নিয়ে সেদিনের হাঙ্গামা।

ছেলের বউয়ের ওপর হামলা কেন?

অনন্তর সব্বোনাশ করা, সেদিনের হাঙ্গামায় মজুমদারের যে হার হয়েছিল—এইভাবে তার বদলা নেওয়া।

কারা করল এমন কাজ!

পয়সা ঢাললে হন্যে কুকুর পাওয়া যায় কত্তা। আশপাশেই পাওয়া যায়। আপনি ওঠেন। আমি যাই নদীর পাড়ে। বজরাটার হাড়পাঁজরা তো আপনারই। এবার জ্বালাইয়ে দেন।

রাত্তিরে খেতে বসেছিলেন নিখিলরঞ্জন, কিন্তু খেতে পারলেন না। একখানা প্রিয় বই হাতে নিলেন দু-তিন বার, পড়া হল না, মন বসাতে পারলেন না। হৈমন্তী কাছাকাছি থাকছিলেন। সব শুনেছেন। এমনিতেই ইদানীং তিনি কথা কম বলেন, আজ তো বলবার মতন কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রাত বাড়ছিল। নদীর পাড়ে কোনো আলোর নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই পুলিস এসেছিল, লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ নিখিলরঞ্জনের কাছেও আসবে। কারণ তিনিই প্রথম লাশ দেখেছিলেন।

মুখে কিছু দিতে পারলেন না, অথচ চারদিক চুপচাপ হয়ে গেলে একটা অদ্ভুত আবদার করলেন নিখিলরঞ্জন।—সেই গানটা একবার করবে, মন্তি?

হৈমন্তীর ভালোই জানা আছে নিখিলরঞ্জনের স্বভাব। এখন কয়েক দিন তাঁর এবংবিধ ছেলেমানুষি চলবে। হৈমন্তী কথা বললেন না, মুখ তুলে সোজাসুজি তাকালেন না।

সেই গানটা গাইবে একবার? 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে'।

আমার গলায় কি আর গান আছে? তোমার মেয়ে তো কত ভালো গান করে। ফিরে আসুক, তার মুখে গান শুনো।

হৈমন্তীর শেষ মন্তব্যটায় ঈষৎ অভিমানের তাপ।

রাত আরো গভীর হলে বিছানায় যেতে হল। ঘুম এল না দুজনের কারো। নিখিলরঞ্জন অস্থির, হৈমন্তীর নড়াচড়া নেই। মধ্যরাত পার হয়ে যাওয়ার দু-আড়াই ঘন্টা পরে নিখিলরঞ্জন খানিকক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন একটা স্বপ্ন।

মাঝরাত্তিরে নির্জন নদীর পাড়ে নিখিলরঞ্জন দাঁড়িয়ে। পায়ের তলায় সরু পথ। তার দুপাশে শিশির-ভেজা ঘাস। হাওয়ায় হিম। নদীর ওপর দিয়ে, অঘ্রানের ধানখেতের ওপর দিয়ে জ্যোৎস্নার দুধ বয়ে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার দুধের সাদা জমিনে বটের ঝুরির মতন অনেকগুলো টকটকে লাল রক্তের ছড় নেমেছে বাতিল বজরার পাঁজর বেয়ে। নিখিলরঞ্জন একটা ফোকরে চোখ রেখে দেখলেন, ভেতরে কৃপণ আলো আর গাঢ় ছায়ার বিচিত্র কাটাকুটি। তার মধ্যে একটি মৃতদেহ, অবিকৃত। জামাকাপড় পরা আছে ঠিকঠাক, শুয়ে আছে চিত হয়ে। নিখিলরঞ্জন মুখের দিকে ভালো করে নজর করলেন। তাঁর নিজেরই মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ও শব্দবিদ্যা

পবিত্র সরকার

১

১৯০৯ সালে 'শব্দতত্ত্ব' নামে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই বেরোয়। তাতে যেসব প্রবন্ধ ছিল সেগুলিতে আলোচিত হয়েছে প্রথমত, বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বা ফোনোলজি : বাংলা স্বরধ্বনি 'অ' এবং 'এ'-র উচ্চারণ ; দ্বিতীয়ত, বাংলা পদগঠন বা মরফোলজি সম্বন্ধে তালিকা এবং ইতিহাসগত আলোচনা ; অর্থাৎ বাংলা বহুবচন, কৃৎ ও তদ্ধিত, সম্বন্ধে কার ইত্যাদির উদ্ভব এবং বিবর্তন, শব্দদ্বৈতের এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের বেশ বড়ো তালিকা ; উপসর্গ, বিশেষ্য, তির্যক্ কারক ইত্যাদির আলোচনা। তৃতীয়ত ছিল তখনকার একটি বিশেষ সরকারি ভাষানীতির সমালোচনা, 'ভাষাবিচ্ছেদ' প্রবন্ধে। চতুর্থত, কিছু বাংলা শব্দ —'পহুঁ', 'নিছনি' ইত্যাদির উদ্ভব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার।

অগ্রহায়ণ ১৩৪২-এ যখন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রণালীবদ্ধ আলোচনার বই 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৩৪৫) বেরিয়ে গেছে। লক্ষ করি যে, পরের দিকে ভাষার তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার গণ্ডি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রয়োগিক দিক নিয়ে ক্রমশ বেশি করে ভাবছেন। 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশকালে (১৯১৪) সাধুভাষা-চলিতভাষার মধ্যে কোন্‌টিকে বাঙালির লেখ্য-ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে—এই বৃহৎ বিতর্ক ছাড়াও, প্রতিশব্দ বা পরিভাষা, অনুবাদ, শুদ্ধ বানান এবং বানানের সংগত নীতি—এসব দিকে তাঁর ভাবনা বিস্তারিত হচ্ছে। অর্থাৎ থিয়োরি এবং প্র্যাকটিস, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ—দু দিক থেকেই ভাষার মর্মোদ্ধার এবং তার সমৃদ্ধিসাধন করায় তিনি মন দিয়েছেন। ফলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা এবং প্রয়াস একটি চমৎকার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম দিকে যদি তাঁকে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে পাই, পরে তাঁকে পাই ভাষার মানোন্নয়ন বা স্ট্যানডার্ডাইজেশনের প্রধান আন্দোলনকারী এবং প্রবক্তারূপে। মনে রাখতে হবে, 'শব্দতত্ত্ব'-এর প্রথম প্রকাশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যবর্তী একটি বছরে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হলেও বঙ্গভাষার প্রতি বীতরাগ হন নি। বরং রাজনৈতিক বিতণ্ডার মধ্য থেকে সরে এসে মাতৃভাষার প্রতি তীব্রতর আকর্ষণ নিয়ে তার রূপ, সংগঠন আর পরম্পরাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এ কাজে উত্তেজনার চেয়ে স্থিরবুদ্ধি বিচারের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু এই কাজই গভীরতর দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এবং এই ভাষাপ্রীতি অব্যাহত রেখে পরবর্তী কালে তিনি যে শুধু এ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে একে সমৃদ্ধ করবার কাজে ব্রতী হলেন তা নয়, আলোচক এবং গবেষক হিসেবেও নিজের শ্রম আর অভিনিবেশ যুক্ত করলেন এতে। সৃষ্টির আনন্দময় কাজের জন্য ভাষাসংগঠকের শ্রমসাধ্য কাজে অবহেলা করলেন না। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, কবি যে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন তা খানিকটা অসচেতনভাবে, তা ভাষার শক্তি যতটা বাড়ায় তার চেয়ে বাড়ায় সৌন্দর্য ; আর সজ্ঞান পরিকল্পনা নিয়ে শব্দশাস্ত্রী যে শব্দনির্মাণ, প্রতিশব্দউদ্ভাবন পরিভাষাসৃষ্টি করেন তা ভাষার শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। একটি ভাষাকে সমর্থ হয়ে উঠতে হলে শুধু সাহিত্যসৃষ্টির পুষ্পিত এলাকায় তাকে পরিবর্ধিত হলে চলবে না, মননশীল তথা তথ্যঋদ্ধ আলোচনাতে, বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রব্যবস্থা গণিত ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি বহুধা বিদ্যার যোগ্য বাহন তাকে হয়ে উঠতে হবে। তার জন্য দরকার নিরাবেগ, অর্থান্তরহীন, বিষয়বদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য। এই শব্দসৃষ্টির কাজে অন্য পাঁচজন অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতের চেয়ে বেশি উৎসাহ এবং অনেক বেশি ক্ষমতা নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন। এও কম দেশপ্রেমের কাজ নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'শব্দতত্ত্ব' আবার প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে। এই ১৩৯১-এর বৈশাখে বইটির স্বতন্ত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এটি ঠিক ১৯০৯-এর 'শব্দতত্ত্ব'ও নয়, আবার ১৩৪২ বা ১৩৪৯-এর বইও নয়। সদ্যঃপ্রয়াত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়—এই দুজন সংকলয়িতা দীর্ঘদিন ধরে অশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা, উক্তি, পত্রাংশকে একসঙ্গে গেঁথে, বিষয়-অনুযায়ী বিন্যাস করে, সব এক জায়গায় সাজিয়ে দিয়েছেন এ বইয়ে। ফলে এমন কথা হয়তো বলা যায় যে, 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামক পৃথক বইটি ছাড়া অন্যত্র যেখানে রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু বলেছেন বাংলা ভাষা সম্বন্ধে—সমস্তই এ বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বড়ো সামান্য কাজ নয়। শুধু তাই নয়। এঁরা প্রায় একশ পৃষ্ঠার বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় আর নির্ঘণ্টও প্রস্তুত করেছেন।

আগেই বলেছি, 'বাংলা ভাষা পরিচয়' একটি প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ বই, তা এ বইয়ের মতো বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গের ও বিচিত্র উপলক্ষের প্রবন্ধসংকলন নয়। বর্তমান সংস্করণে আগের বইগুলির তুলনায় ভিন্ন প্রসঙ্গের লেখার আরো বেশি সংযোজন হওয়ায় বইটির বিষয়গত বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে গেছে, ফলে 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর তুলনায় এই নতুন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'কে খানিকটা অসংলগ্ন এবং বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। কিন্তু 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর তুলনায় 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর মাহাত্ম্য একদিক থেকে অনেক বেশি। প্রথমত, 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ 'শব্দতত্ত্ব'-এর অনেক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ফলে 'শব্দতত্ত্ব'-তেই ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রাথমিক সূত্রগুলি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর বাইরেও রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা কতটা বিস্তারিত হয়েছিল তারও সাক্ষ্য এই নতুন বইটিতে সংগৃহীত হয়েছে। ফলে এই 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'কে অবলম্বন করেই শব্দশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথকে আরেকবার বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

২

পৃথিবীর খুব কম ভাষাতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভালপমেনট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৯২৬)-এর দুই খণ্ডের মতো ভাষার বিস্তারিত এবং তথ্যবিশ্লেষণবহুল ইতিহাস লেখা হয়েছে। এই ও ডি বি এল গ্রন্থের ভূমিকায় সুনীতিকুমার লিখেছেন, "...the first Bengali with a scientific insight to attack the problems of language was the poet Rabindranath Tagore ; and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern Western philologists." 'শব্দতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের মন্তব্য—"These

papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them." (*ODBL*, Preface, xvi পৃষ্ঠা)।

প্রাথমিক পাঠে এই দুটি উদ্ধৃতিকেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালির জন্মগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতার প্রকাশ বলে মনে হতে পারে। বস্তুতপক্ষে সুনীতিকুমার তাঁর বক্তব্যকে এখানে বা অন্যত্র কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি, ফলে ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য কোথায় তার কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারের ইংরেজি বা বাংলা লেখায় কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূলবস্তুকে তিনি কোথাও কোথাও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন—'জীবনদেবতা'-সংক্রান্ত প্রবন্ধে বা 'বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক ইংরেজি বক্তৃতামালায় যেমন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণও আছে তাঁর, যেমন আছে বিচ্ছিন্ন লেখায় লনডনে বা পারস্যে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-প্রসঙ্গ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানী কেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিকে ভাষাবিজ্ঞানী-রূপেও অত্যন্ত সম্ভ্রমযোগ্য বলে মনে করেন, তার কোনো বিশদ বিবৃতি সুনীতিকুমারের কাছ থেকে পাই না বলেই তাঁর ঐ দুটি মন্তব্যের বিশ্বাস্যতা সম্বন্ধে আমাদের প্রারম্ভেই সংশয় জাগে। সংশয়ের কারণ একাধিক। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' তাঁর গ্রন্থসমবায়ের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কম পঠিত বই—শব্দতত্ত্বে সাহিত্যবিলাসী বাঙালির আগ্রহের চেয়ে ভীতি বেশি আছে। দ্বিতীয়ত, সুনীতিকুমারের কথা বিশ্বাস করতে গিয়ে এই দ্বিধার মধ্যে আমরা দুলতে থাকি যে, 'হ্যাঁ, মানলাম মস্ত বড়ো কবি, কিন্তু তাই বলেই যে মস্ত বড়ো ভাষাতাত্ত্বিকও হবেন তা কী করে সম্ভব? সুনীতিকুমার নিশ্চয়ই কবির গৌরবের খানিকটা অংশ ভাষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথকে ধার দিয়ে এমন কথা বলেছেন।'

কিন্তু যখন দেখি, জারমান কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মতো প্রায় সমসাময়িক জারমান ভাষাবিজ্ঞানী কার্ল ব্রুগমানের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থ এলিমেনটস অব দ্য কমপারেটিভ গ্রামার অব দ্য ইনডো-জারমানিক ল্যাঙ্গুয়েজ বইটিও তিনি অত্যন্ত খুঁটিয়ে, মারজিনে পেনসিলে নোট করে পড়েন, যত্ন করে পড়েন ও ডি বি এল (তাঁর 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় শিলং-এ এই বইয়েরই দুটি খণ্ড নিয়ে গিয়েছিল পড়তে, তা পাঠকদের মনে পড়বে), মনিয়ের উইলিয়ামসের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান পড়েন শব্দের নীচে বারবার দাগ দিয়ে, মারজিনে বাংলা পরিভাষা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে; এবং সেই সঙ্গে একই রকম আয়াস আর অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েন তখনকার সব পুরনো বাংলা টেকসট—রামায়ণ, চণ্ডীদাসপদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পড়েন বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' ব্যাকরণ, 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' নামে ছন্দের উদাহরণ-গ্রন্থ, ফ্রাংকফুর্টার-এর পালি ব্যাকরণ,—এসব বইয়ের বিবরণ সংকলয়িতারা নতুন 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এর ৪৪২-৪৪ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন—তখন বুঝি ভাষাবিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল কেবল আনাড়ির শৌখিন জিজ্ঞাসায় পর্যবসিত হয় নি। বিষয়টির জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে। এ আগ্রহ একদিনের নয়—ব্রুগমানের বইটির মুদ্রণ-বৎসর ১৮৮৮, পালি ব্যাকরণটির ১৮৮৩, আর ও বি ডি এল-এর ১৯২৬। 'শব্দতত্ত্ব' বইয়েই দেখি সমালোচনা করছেন বীমসের (স্যার জন বীমস) বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে। এ বইয়েই প্রমাণ আছে তিনি তন্ন-তন্ন করে পড়েছেন রামমোহন থেকে শুরু করে আরো অনেকের বাংলা ব্যাকরণ। ড. হোয়েনর্লি-র এ কমপারেটিভ গ্রামার অব দ্য গৌড়িয়ান ল্যাঙ্গুয়েজস-ও তাঁর পড়তে বাকি নেই। 'বাংলা বহুবচন' নামক প্রবন্ধটির শেষে যখন এই বাক্য পড়ি যে, "দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্ সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল"—তখন খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর জিজ্ঞাসার বিস্তৃতি, তাঁর আগ্রহের গভীরতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর যৌবনকালের ভাষাশিক্ষার উৎসাহের কথা, সংস্কৃত-পালি-ফরাসি-জারমান ভাষায় তাঁর অনুবাদ সন্ধিৎসা আর পাঠপিপাসার সংবাদ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা, ছড়া সম্বন্ধে তাঁর সংগ্রহসহিষ্ণুতার তথ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অসংখ্য অধিবেশনে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার রেকর্ড, ১৯১৮ নাগাদ অধ্যাপক জে. ডি. অ্যানডারসনের সঙ্গে তাঁর বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দবিষয়ক আলোচনাও স্মরণে আসে। তখন এ কথাই ফুটে ওঠে যে, একজন মনস্ক, পরিশ্রমী আর তীক্ষ্ণধী ভাষাবিজ্ঞানীর যা যা প্রস্তুতি দরকার, সবই রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেছেন। তখন এই ক্ষেত্রে তাঁর বোনাফাইডি অধিকার সম্বন্ধে সংশয় নিরস্ত হয়।

৩

সংশয় নিরস্ত না হয় হল, কিন্তু কতখানি মূল্য রবীন্দ্রনাথের ওই 'গবেষণা'র? কতখানি সংগত সুনীতিকুমারের ওই প্রশংসা? এই কথার উত্তর খুঁজতে গিয়ে বর্তমান লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক সমস্ত রচনাকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়। প্রথম ভাগে আছে তাঁর বাংলা উচ্চারণ বা ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ—'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ', 'টা টো টে'। অন্যভাগে তাঁর বাকি সমস্ত রচনা।

শুধু ঐতিহাসিকভাবে আগে লেখা হয়েছে বলে (১২৯২ থেকে ১২৯৯-এর মধ্যে) এ রচনা ক-টিকে আলাদা করি নি। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ আকারে 'বালক' আর 'সাধনা' পত্রিকার জন্য এই কটি প্রবন্ধ লিখছেন ওই সাত-আট বছরে। লক্ষ করতে হবে, পরবর্তী প্রবন্ধ 'বাংলা বহুবচন' প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় ছ বছর ব্যবধানে। মাঝখানে এই ছ বছরের ফাঁক বিষয়ের দূরত্বও তৈরি করছে। ১২৯৯ পর্যন্ত যেখানে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল মূলত বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে বা উচ্চারণে, সেখানে ১৩০৫ থেকে তাঁর আগ্রহ রূপতত্ত্ব (মরফোলজি)-এর দিকে সঞ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৩০৫ থেকে যেসব প্রবন্ধ লিখছেন শব্দতত্ত্ব বিষয়ে, সেগুলিতে তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়নের সংবাদ আসছে, তিনি উল্লেখ করছেন তুলসীদাসের প্রয়োগ, মেওয়ারি কাব্যের বিভক্তি, কাশ্মীরি ষষ্ঠীর রূপের। তাঁর লেখায় তুলনামূলক তথ্য—বাংলার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষার—অহরহ উঠে আসছে। অ্যাকাডেমিক পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার পরিচয় ক্রমশ জেগে উঠছে। অথচ ওই আগের ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ কয়টিতে কোনো গ্রন্থের উল্লেখ নেই, নেই অন্য ভাষার তুলনাত্মক তথ্য বা সংবাদ (ইংরেজির সঙ্গে সামান্য তুলনা বাদ দিলে)। পাণ্ডিত্য কোথাও নেই, কেবল সহজভাবে ভাষার উচ্চারণ-প্রণালীর রহস্যের অনুসন্ধান আছে।

এ থেকে সন্দেহ হয়, বীমস, গ্রিয়রসন বা হোয়েরনলি-র বই পড়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলা উচ্চারণের, বিশেষত স্বরধ্বনির উচ্চারণের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল, এবং নিজে বিচার-বিবেচনা করে সে সম্বন্ধে কিছু অনুমান আর সিদ্ধান্তও তিনি তৈরি করেছিলেন। এমন হওয়া সম্ভব যে, প্রবন্ধগুলির মূল সূত্রগুলিতে তিনি আগেই পৌঁছেছিলেন।

এ কথা যে সত্য, তার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই রেখে গিয়েছেন। প্রথমবার বিলেতে লনডন য়ুনিভারসিটি কলেজে পড়বার সময় লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও রবীন্দ্রনাধ বাংলা শব্দতত্ত্ব বিষয়ে যে আলোচনা করতেন, তার উদ্ভব বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানাচ্ছেন, "ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে।...কিন্তু আমার গর্ব টিঁকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম।" ('জীবনস্মৃতি', "লোকেন পালিত" অধ্যায়)।

'শব্দতত্ত্ব'-এর প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ'-এ এই "কাজ"-এর পদ্ধতি ও পরিণাম সম্বন্ধে বিবৃতিটিও লক্ষ করা যাক—"আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এইসকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম।" কিন্তু এ প্রবন্ধ লেখার (১২৯২/১৮৮৫) বছর দুই আগে তাঁর পুরনো নোটগুলি ওই বাক্সে সন্ধান করতে গিয়ে দেখেন একটি বালিকা সেই "হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"

এই বিবরণগুলি থেকে অন্তত এ হিসেবটা পাই যে,

বাংলায় ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাজকর্ম —"নিয়ম বাহির করিবার" এবং "নিয়ম ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম" খোঁজবার চেষ্টা—তাঁর লনডন প্রবাসকালেই অর্থাৎ ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০-র মধ্যেই ঘটেছিল। এই প্রবন্ধগুলি সেই প্রাক্তন, কিন্তু ঘটনাচক্রে হারিয়ে-যাওয়া সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করেই রচিত। এগুলি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং মৌলিক উদ্ভাবন। এ সম্বন্ধে আরো বেশি করে নিশ্চিত হই এই থেকে যে, এসব নিবন্ধে অন্য কোনো গ্রন্থ বা সূত্র বা ভাষার উল্লেখ নেই। কোনো 'অথরিটি কোট' করছেন না রবীন্দ্রনাথ, অন্য কোনো ভাষা থেকে তুলনা বা বিরোধাত্মক উদাহরণ তুলছেন না। তোলা সম্ভবও নয়, কারণ যেসব বই থেকে তা তোলার কথা, সেগুলির অধিকাংশ ওই সময়ে প্রকাশিতই হয় নি।

৪

সময়ক্রমের এই বিষয়টা বুঝে নেবার পর যে প্রশ্নটি ভাষাবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে আমাকে বিস্মিত এবং আন্দোলিত করে তা হল, ভাষার ধ্বনির নিয়ম আর ব্যতিক্রমের সূত্র উদ্ধারের উপলক্ষ যাই হোক (বিদেশিনীকে বাংলা শেখানো), কিন্তু এর 'মডেল' কোথায় পেলেন রবীন্দ্রনাথ? কোন্ ব্যক্তি, কোন্ গ্রন্থ তাঁকে বলে দিল যে ভাষার ধ্বনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারসূত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঐতিহাসিকভাবে যে ধ্বনির পরিবর্তন হয় তা তখন সকলেই জেনে ফেলছে, কারণ ঠিক ওই সময়ে ইয়োরোপে, বিশেষত জারমানিতে ঐতিহাসিক ধ্বনিবিজ্ঞানেরই বিপুল প্রতিপত্তি। জারমানিতে 'য়ুংগ্রামাটিকের' বা 'চ্যাংড়া বৈয়াকরণের দল' বলে যাদের বর্ষীয়ান গুরুরা উত্ত্যক্ত হয়ে বিদ্রূপ করছেন তাঁরা—কারল ভেরনের, হেরমান পাউল, কারল অসটফ, কারল ব্রুগমান, এডুয়ার্ড জিফারস প্রভৃতির সম্প্রদায় পরিষ্কার স্লোগান দিচ্ছেন যে, ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মে ব্যতিক্রমহীনতাই হল মূল লক্ষণ। যেখানে ব্যতিক্রম আছে বলে মনে হবে, সেখানে ভালো করে সন্ধান করো, তারও একটা নিয়ম বেরিয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথ তার কতটা খবর লনডনে রাখতেন জানি না, কিছু না রাখাই সম্ভব। কিন্তু যদি ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন-বিষয়ে এই শোরগোল ইয়োরোপ ভূখণ্ড এবং ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে তাঁর কানে পোঁছেও থাকে, রবীন্দ্রনাথ যে-নিয়ম খুঁজছেন সে নিয়মের চরিত্র যে য়ুংগ্রামাটিকেরদের নিয়মের চরিত্র থেকে আলাদা, তা আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। ওই তরুণ বৈয়াকরণের দল ধ্বনিপরিবর্তনের যে নিয়মের কথা বলছেন তা ডায়াক্রনিক বা ঐতিহাসিক নিয়ম—তা কালব্যবধানে প্রযুক্ত হয়। আগে এই চেহারা ছিল শব্দটির, পরে ধ্বনিগুলি বদলে গিয়ে এই চেহারা দাঁড়াল—অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ আর পরিবর্তিত শব্দটির মধ্যে একটি কালব্যবধান থাকে। আরো একটা কথা এই যে, যে-ভাষায় বা যে-উপভাষায় ওই কালক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তাতে আগের শব্দটি বাতিল হয়ে পরিবর্তিত নতুন শব্দটিই চালু হয়ে যায়। যেমন শিষ্ট চলিত বাংলায় স্বরসংগতির (বা আধুনিক ভাষায় স্বরধ্বনির উচ্চতাসাম্যের) নিয়মে জুতা>জুতো হবার পর, অন্তত এই উপভাষায় 'জুতা' কথাটি বর্জিত ও বাতিল, অথবা 'প্রাচীনতর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। স্বরসংগতির এই নিয়মটি একটি কালক্রমিক নিয়ম বা ডায়াক্রনিক রুল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের বিধি এবং ব্যতিক্রম খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক নিয়ম খুঁজছেন না, খুঁজছেন চালু, ব্যাবহারিক নিয়ম, যাকে আজকের ভাষায় বলা হয় সিনক্রনিক রুল। এই নিয়মে (পরিবর্তনের) আগেকার বা পরেকার রূপ বলে কিছু থাকে না, কিন্তু তুলনা করতে হয় দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে—যার একটিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কারণটি হাজির আছে, অন্যটিতে নেই। ফলে অন্যটিতে পরিবর্তন ঘটে নি। ধরা যাক, বাংলা 'অত' [অতো] আর 'অতি' [ওতি]। এখানে বানান যেমনই হোক, অত-তে যেখানে 'অ' উচ্চারণ পাচ্ছি, সেখানে 'অতি'তে ওই একই স্বরধ্বনিকে পাচ্ছি 'ও' হিসেবে। এই ব্যত্যয় কেন ঘটল? রবীন্দ্রনাথেরই সূত্র অনুসারে, পরে 'ই' থাকায় 'অ' 'ও' হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সূত্রই সুনীতিকুমার-সহ সকলে গ্রহণ করেছেন।

লক্ষ করি, এখানে কালান্তরের ধ্বনিপরিবর্তন নয়, উচ্চারণে বা ধ্বনিপ্রতিবেশে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটছে। এগুলি সিনক্রোনিক বা এককালিক (অর্থাৎ ব্যাবহারিক) ধ্বনিপরিবর্তন, এবং রবীন্দ্রনাথ ওই কটি প্রবন্ধে ভাষার এই সিনক্রোনিক ধ্বনিপরিবর্তনেরই বেশ কিছু সূত্র নির্ণয় করেছেন। একথাও ঠিক যে, তার সঙ্গে

ঐতিহাসিক ধ্বনিপরিবর্তনের দৃষ্টান্তও তিনি মিশিয়ে ফেলেছেন।

ব্যাবহারিক ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করছেন বিদেশীর চোখে নিজের ভাষার দিকে তাকিয়ে একজন বাঙালি, এর মধ্যে বিস্ময়ের কী আছে—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিস্ময়ের কথা হল, ব্যাবহারিক ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র যে এভাবে নির্ধারণ করা যায়, ভাষার মধ্যে চালু নিয়ম-ব্যতিক্রম যে সচল ভাষার দৃষ্টান্তের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করা যায়, এ কথাটা ১৮৮০ সালে তো দূরের কথা, গোটা উনবিংশ শতাব্দীকালের মধ্যে কেউ বলে নি। ১৯০৬ সালের পর জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সময় ফের্দিনান্দ দ সোশ্যুর সর্বপ্রথম এমন একটা কথা বলেন যে, ভাষা-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে ভাষার সচল তথা বর্তমান রূপের (সিনক্রনিক রূপের) আলোচনাকে পৃথক করে আনা দরকার। কিন্তু ক্লাসনোট থেকে অকালমৃত দ সোশ্যুরের ছাত্ররা তাঁর শিক্ষাকে ভিত্তি করে যে বইটি প্রস্তুত করে—Course de linguistique générale, তা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত হয় নি। আর দ সোশ্যুরের আগে জারমান ভিলহেলম ফন হুমবোলট খানিকটা এ ধরনের কথা বললেও, তাঁর তত্ত্ব তাঁর সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ প্রচার লাভ করে নি। তাহলে স্পষ্ট কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে, পৃথিবীর কোনো প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার সিনক্রনিক অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলবার প্রায় তিন যুগ আগে ইংলন্ডে পাঠরত তরুণ এক বাঙালি কবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ বিষয়ে চর্চাই শুরু করে দিয়েছেন এবং অসাধারণ পর্যবেক্ষণের ফলে বেশ কিছু নিয়মও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এরকম নিয়ম যে ভাষার চালু রূপের মধ্যে থেকেও উদ্ধার করা যায়, সে কথা বলা হয়েছে আরো পরে। যখন এই লেখাগুলি অনেক পরে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে (১৮৫৫-১৮৯২) তখনও পৃথিবী এ সম্বন্ধে ভাবতেই শুরু করে নি। পৃথিবী মানে পাশ্চাত্ত্যদেশ। ভারতবর্ষে অবশ্য খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই ভাষার ব্যাবহারিক নিয়ম-বিশ্লেষণের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে পাণিনির ব্যাকরণে। কিন্তু পাণিনিও লনডনে রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছে ছিল না, ছিল দুটি বাংলা অভিধান মাত্র।

ফলে রবীন্দ্রনাথের এই কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসামান্য এবং এ কথাটার প্রচার হওয়া দরকার। এর তুলনায় তাঁর অন্য প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব কম নয়, কিন্তু সেগুলি নিপুণ পর্যবেক্ষণের এবং বহু অধ্যয়নের ফল হলেও উল্লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে অন্তর্দৃষ্টির যে পরিচয় আছে, বাকি প্রবন্ধগুলিতে তা নেই। কবির শব্দসচেতন প্রজ্ঞার সঙ্গে গবেষণা মিলেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকায়। প্রতিশব্দ আর পরিভাষা—যা শেষদিকে তাঁর মনোযোগের বেশ বড়ো একটা অংশ দখল করেছে—তাতেও তাঁর অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতার প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার নিজের মনে হয়, এই শব্দগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাবহারিকতার চেয়ে কবিত্বের সৌন্দর্য বেশি প্রকট হয়েছে। ফলে 'কৃষ্টি' সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি এখন আমাদের তত সংগত মনে হয় না। তা ছাড়া, মাফল্‌ড্‌-এর বাংলা যখন তিনি 'অনুতন্ন' করেন, কিংবা গোয়িঙ ফার-এর বাংলা করেন 'অত্যন্তীন' বা সাইড রোড-এর 'অনুরথ্যা', তখন কবিত্বের সংক্রমণ ঘটে, যা সহজ ও চালু ইংরেজি শব্দ, তার জায়গায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রেজিস্টারের প্রতিশব্দ গ্রহণ করা হয়েছে দেখতে পাই। তবু তাঁর বহু প্রতিশব্দই আমরা গ্রহণ করেছি, যেমন নন-রেসিডেনট 'অনাবাসিক', আনএকসপেকটেড 'অনপেক্ষিত', অ্যাপাথি 'অনীহা' অলটারনেটিভ 'অনুকল্প', অ্যাসোসিয়েশন 'অনুষঙ্গ', অ্যাকসিডেনটাল 'আপতিক' ইত্যাদি। বানান সম্বন্ধেও তাঁর মতামতে আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ সায় থাকে।

৫

তাঁর সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে রবীন্দ্রনাথ সব সময় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, সেটা লক্ষ করা কঠিন নয়। তাঁর কালের প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানীরাও তা পারেন নি। যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ধ্বনি' কথাটার জায়গায় 'বর্ণ' লিখছেন (এখনও স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে এই বিভ্রান্তি চোখে পড়ে), ঠিক সেই সময় ইয়োরোপে হেরমান পাউলের মতো ধ্বনিবিজ্ঞানীরাও ধ্বনি বোঝাতে গিয়ে লেটারস কথাটি ব্যবহার করছেন। 'বর্ণ' হল লেখার একক, ধ্বনি উচ্চারণের, এবং উচ্চারণের বিবৃতি দেবার সময় বর্ণ কথাটা ব্যবহার করা উচিত নয়—এই সচেতনতা ইয়োরোপেও এসেছে অনেক পরে। শান্তিনিকেতনে অনু-

ষ্ঠিত ত্রিংশ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে পঠিত ইংরাজি প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের ধ্বনির নিয়ম-বর্ণনাকে আরো সুশৃঙ্খল এবং সুবিন্যস্ত করা যায়। যে নিয়মগুলি তাঁর কাছে অসংলগ্ন মনে হয়েছে, যেমন 'অ' 'ও' হওয়ার নিয়মে পরেকার 'ই' 'উ'-র উপস্থিতির জন্য তিনি একটি নিয়ম করেছেন, আরেকটি নিয়ম করেছেন 'ক্ষ'-এর উপস্থিতির জন্য। পরে আমরা বুঝতে পারি, ক্ষ, জ্ঞ, য-ফলা ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপ—সবগুলিতেই একটা অপিনিহিত 'ই'-র উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাই অ-কে ও-তে পরিণত করেছে, পরে ওই 'ই' নিজে লুপ্ত হয়েছে।

পদতত্ত্ব বা মরফোলজি-তে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা খুবই মূল্যবান। সর্বত্র তাঁর অনুমান নির্ভুল না হলেও আমাদের ভাষার ইতিহাসরচনায় তাঁর ইঙ্গিতগুলি বিশেষ কার্যকর হয়েছে। বিশেষ করে প্রত্যয়ের আলোচনা যে-কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষাবিজ্ঞানী বা শব্দশাস্ত্রী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু তিনি যে আমাদের ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা, তার ইতিহাস এবং ব্যবহারপ্রক্রিয়া যে তাঁর অসামান্য অন্তর্লোকনে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, এবং এ কাজে সমস্ত পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর স্থান যে একজন পুরোধার—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

৬

এই সংকলনের দুই সংকলয়িতা শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহকারিত্বে তাঁদের কাজ যেভাবে সম্পন্ন করেছেন তা এক হিসেবে আদর্শস্থানীয়। ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যদু-যাবতীয় ইতস্তত রচনা এবং প্রাসঙ্গিক পত্রাংশ তাঁরা একটি আধারে আশ্রিত করেছেন, এবং একজন ছাত্র বা গবেষকের কাছে সেটাই একটা বিশাল প্রাপ্তি। শুধু তাই নয়, তাঁরা গ্রন্থপরিচয়ে প্রত্যেকটি রচনার মুদ্রণ-তথ্য দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মূল রচনায় প্রাসঙ্গিক অংশ-বিশেষ তুলে দিয়েছেন—'কৃষ্টি', 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ' ইত্যাদি পরিভাষা বিষয়ে বিদ্রূপকীর্ণ 'তাসের দেশ' নাটকের অংশ যেমন—, একই প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন রচনার ক্রস-রেফারেনস দিয়েছেন সর্বত্র। কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ছবি ছাপানোয় বইটির সৌকর্য বেড়েছে। 'রামায়ণ' এবং মনিয়ের উইলিয়ামসের অভিধানে রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বলিখিত ও রেখাঙ্কিত পৃষ্ঠার ছবিও এই অভাবনীয় ব্যক্তির অতিসচল চিত্ত ও হস্তের গতিবিধি আমাদের সামনে তুলে ধরে। পাদটীকায় রচনায় উল্লিখিত ব্যক্তির পরিচয়ও সংকলয়িতারা দিয়েছেন। পাদটীকার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা লক্ষ করি। কোন্‌টা রবীন্দ্রনাথের নিজের যোগ করা পাদটীকা, আর কোন্‌টি সংকলয়িতাদের, তা সব সময় স্পষ্ট হয় নি। যেমন ৯১ পৃষ্ঠায় ১-সংখ্যক পাদটীকাটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু সংকলয়িতাদের দেওয়া পাদটীকা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় নি।

আরেকটি কথা। যদিও সংকলয়িতারা বিনয়বশত নিজেদের সম্পাদক বলেন নি, তবু সুযোগ্য সম্পাদনার পরিচয় তাঁরা সর্বত্রই রেখেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রবন্ধ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেসব বই ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির সম্যক পরিচয় তাঁরা দিলে ভালো করতেন। যেমন 'বাংলা বহুবচন' প্রবন্ধে কেলগ সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়ারসন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, ডাকতার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণের কথা আছে। সে বইগুলির পূর্ণ পরিচয় পাদটীকায় থাকলে ভালো হত। এখনও এশিয়াটিক সোসাইটি বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বইগুলি পাওয়া যেতে পারে। জন বীমসের বাংলা ব্যাকরণটির নাম এবং বিবরণও অপেক্ষিত ছিল।

এ ছাড়া, 'ছন্দ' বইটিতে অধ্যাপক রিচার্ডসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিশদ পত্রালাপ আছে তাতেও বাংলা ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। সেগুলির নির্বাচিত অংশ এ সংকলনে স্থান পেলে ভালো হত।

তবু 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' একটি আদর্শ সংকলনগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। উপরের যৎসামান্য দু-একটি ত্রুটি এ বইয়ের অসামান্য গুরুত্ব এবং সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে শিথিল করার মতো শক্তি রাখে না।

বাংলা শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংকলয়িতা পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সুবিমল লাহিড়ী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ৭০০০১৭। পঁয়ত্রিশ টাকা।

গ্রন্থসমালোচনা

সাহিত্যের কারুকর্মে ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যবহার

বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার—দিলওয়ার হোসেন। বাংলা একাডেমী : ঢাকা। একশত টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাঙালির ইতিহাসচর্চার দৈন্যের কথা বলেছিলেন। নিজে কিছু-কিছু ঐতিহাসিক বিষয়ের গবেষণাকর্মের সূত্রপাত করেছিলেন ওই পত্রিকাতেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্যেই বলতে পারি, প্রকৃত ইতিহাসপাঠে আমাদের উৎসাহের অভাব ছিল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে, এমনকি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, ইতিহাস আর আখ্যায়িকা একই অর্থে প্রযুক্ত হত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে ইতিহাসচর্চার আগ্রহই জাগিয়ে দেন নি—তিনি তাঁর পত্রিকায় ইতিহাস-ঘটিত ঘটনাচিত্র বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের একটি সংজ্ঞাও দিয়েছিলেন। "যে গ্রন্থে জনসমাজের বা কোন ব্যক্তি বা রাজবিশেষের বা ঘটনাসমূহের নির্দিষ্ট-কালের সহিত অবিকল সত্য বর্ণনা লিখিত থাকে তাহার নাম ইতিহাস।" পরে ব্যাখ্যানসূত্রে তিনি যে কথা বলেছেন তাতে বুঝি, মিত্র থুকিডাইডিসের মতোই ইতিহাসকে অভিভাবকের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। অতীত আমাদের পথ দেখায়, অতীত আমাদের সাবধান করে—এগিয়ে চলার প্রেরণাও অতীত থেকে সংগ্রহ করি। এই ইতিহাসের বোধ যখন বাঙালির মধ্যে দেখা দিল তখনও কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মতো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। যে কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠা ইতিহাস-চর্চায় প্রয়োজন সে নিষ্ঠা আর শ্রম স্বীকারে পাওয়া গেল না বাঙালিকে। আবার যে কয়েকজন ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে এলেন তাঁদের ক্ষেত্রে লক্ষ করি ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব।

অন্যদিকে ইতিহাসপাঠের আগ্রহ জাগিয়ে রাখলেন বাঙলার ঔপন্যাসিকবৃন্দ। বাঙালি ঐতিহাসিক উপন্যাসিকবৃন্দের সৃষ্টিকর্মে দ্বিবিধ দায়িত্ব অঙ্গীকার করতে দেখি। এক, রসের জোগান দেওয়া ; দুই, ইতিহাসের পুনরুদ্ধার এবং মূল্যায়ন করা।

দিলওয়ার হোসেন দ্বিতীয় বস্তুটির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। বাঙলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার কী কারণে ঘটল, কেনই বা ঔপন্যাসিকবৃন্দ মুঘল ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বোধ করলেন—দিলওয়ার হোসেনের চর্চার বিষয় ছিল এই। আমরা যে সময়ে উনিশ শতকের উপন্যাসে ইতিহাসব্যবহারের বিচারবিশ্লেষণ করছি, সে সময়ে ইতিহাসচর্চা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। স্বভাবতই আমরা প্রলুব্ধ হই উনিশ শতকের সাহিত্য-বিচারে এই শতকের ধ্যানধারণা প্রয়োগ করতে। তাতে যে গলদ থেকে যায় তা বলাই বাহুল্য। দিলওয়ার হোসেন সেই গলদ থেকে মুক্ত থাকবার জন্যেই সেকালের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—কোথাও তিনি কিছু আরোপ করার চেষ্টা করেন নি। প্রসঙ্গত একালের ইতিহাসচর্চার নিরিখেও উপন্যাসগুলির মূল্যনির্ধারণে দিলওয়ার হোসেন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হোবার্ট কনটারের 'রোমানস অব হিস্টরি—ইনডিয়া' অবলম্বনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' লিখেছিলেন। কনটারের রোমানসের আশ্রয়ে ভূদেবও রোমানসই রচনা করেছেন। নানা কারণে এই বইটির গুরুত্ব দিতে হয়। কেউ-কেউ তো এই উপন্যাসটিকেই বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' পড়েই 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন—একথা বলেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটিতে ওয়ালটার স্কটের প্রভাব দেখতে পান নি, পেয়েছেন ভূদেবের প্রভাব। ভূদেবের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' স্কটের আইভ্যান-হো-র দ্বারা প্রভাবিত। দিলওয়ার হোসেন লক্ষ করেছেন ভূদেবের ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহারের বিশিষ্টতার দিকটি। কনটারের ইতিহাসকে (?) ভূদেব অনেক রদবদল করেছেন। এই রদবদলের খুঁটিনাটি বিবরণ চমৎকারভাবে দিলওয়ার হোসেন পর্যালোচনা করেছেন। ভূদেবের উপন্যাসে মারাঠাবীর শিবাজীর অভ্যুত্থান বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপিত। কনটারের কাহিনী নিছক রোমানস। ভূদেব রোমানসের আবহকে আরও বিস্তৃত করে দিয়েছেন স্বদেশচর্চার ভূমিতে মারাঠা-মুঘল দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে স্থাপন করে। দিলওয়ার হোসেনের আলোচনায় শিবাজী-রোসিনারার প্রেমচিত্রটিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ভূদেব যে জাতিধর্মের বিভেদ ভুলে গিয়ে এই প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে চিত্রিত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নরনারীর আবেগ-অনুভূতির প্রতিই মনোযোগী হয়েছিলেন। বন্দিনী রোসিনারা আর-এক নারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা। দিলওয়ার হোসেন 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'-এর বিচারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন বলে মনে করি। শিবাজীর সঙ্গে মধুসূদনের রাবণ-চরিত্রের তুলনা বড়োই দূরের ব্যাপার।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই মুঘল ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। জেমস টডের রাজ-

স্থানের ইতিহাস অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালি লেখকরা ইংরেজি কবিতাতে টডকে ইতিপূর্বেই আশ্রয় করেছিলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মুঘল ইতিহাসকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও টডের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। 'রাজপুতগরিমার' বিস্তার সেই সময় থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনায় ইতিবৃত্তকে গ্রহণ করলেন তখন তিনিও রাজপুতজাতির শৌর্যবীর্যের দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংগতভাবেই তিনি জগৎসিংহকে নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। দিলওয়ার হোসেন নিপুণ বিশ্লেষণে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে তাঁর ইতিহাসচর্চায় বাঙলার দুর্দশার জন্যে মুঘল সম্রাটদের দায়ী করেছিলেন। পাঠানরাজত্বের তিনি খুব প্রশংসাও করেছিলেন। সেই কারণে আমরা পেয়ে যাই ওসমান-আয়েষাকে। অপরদিকে জগৎসিংহের মতো বীরনায়ক বাঙালির মন কেড়ে নিয়েছিল সেদিন। মুঘল সেনাপতির চিত্রাঙ্কন-দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির বীরত্বের স্পৃহাকে কিছুটা তৃপ্তি দিতে পেরেছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মুঘল অন্তঃপুরকে উদ্‌ঘাটিত করলেন। মতিবিবি অনৈতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু মেহেরউন্নিসা-শের আফগান ঐতিহাসিক চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাপ্ত তথ্যকে কিছুটা কল্পনার সাহায্যে মুঘল রাজনীতির জটিল ইতিহাসনির্মাণে সদ্ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। দিলওয়ার হোসেন সেকালের আর একালের ইতিহাসবিদের বিশ্লেষণের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই নির্মিতির বিচার করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি কপালকুণ্ডলার উপন্যাসধর্ম নিয়ে কিছু নিবেদন করেছেন। এই বিচার লেখকের কাছে অত্যাবশ্যক ছিল কিনা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। লেখক মুঘল ইতিহাসের ব্যবহারের আলোচনা করতে গিয়ে উপন্যাসের নির্মাণকলার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন। ব্যাপকভাবে দেখলে অবশ্যই ইতিহাসব্যবহারের সঙ্গে উপন্যাসের কারুকর্মের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। কপালকুণ্ডলায় ইতিবৃত্তের ব্যবহার কেন ঘটল, সেই বিষয়ে দিলওয়ার হোসেনের বিশ্লেষণ খুব উজ্জ্বল নয়। তিনি যখন শিল্পঘটিত সমস্যাকে গ্রহণই করলেন তখন এই প্রশ্নটির মীমাংসাও তিনি করতে পারতেন।

মুঘল ইতিহাসের ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। দিলওয়ার হোসেন উপন্যাসবিচার-প্রসঙ্গে 'রাজসিংহ' রচনাকালে দেশকালপাত্রের রাজনীতি-সমাজনীতির বিশদ পরিচয় নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "জীবনে বহু বিতর্কিত সমস্যার শিল্প-রূপায়ণে বঙ্কিম ইতিহাসের প্রচ্ছদকে আশ্রয় করে অতীতচারী হয়েছিলেন। অনেকস্থানেই উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন সামাজিক বিকৃতি থেকে উত্তরণ।" দিলওয়ার সমকালীন শিক্ষিত বাঙালির 'জাতি'-চেতনা, ধর্মচেতনা এবং রাজনৈতিক মনোভাবের দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি রোমিলা থাপার, বিপনচন্দ্র ইত্যাদি ইতিহাসবিদ্‌দের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ধারাটির পরিচয় দিয়েছেন। ডি. ডি. কোশাম্বী-গোষ্ঠীর এই ঐতিহাসিকদের প্রতি দিলওয়ার হোসেনের সহমর্মিতাও লক্ষ করা যায়। দ্বিজাতিতত্ত্ব-সাম্প্রদায়িকতাবোধ-এর জন্ম সেই সময়ের পাশ্চাত্ত্য শাসকদের উদ্দেশ্যমূলকতার মধ্যেই নিহিত ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবোধও এইরকমই বিভেদবুদ্ধি থেকে গৃহীত। মুসলমানদের মধ্যেও এই-জাতীয় মনোভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এই বোধ থেকেই প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা—এ থেকেই মুসলমান শাসন সম্বন্ধে সংশয়প্রবণতা। অনিবার্যভাবেই রাজপুত-মারাঠা-শিখ বীরবৃন্দের প্রতি সপ্রশংস মনোভাবের জন্ম হয়। ইতিহাস-আলোচনাও সেই বিভেদবুদ্ধির আলোকেই সম্প্রসারিত হয়েছে। দিলওয়ার হোসেন আধুনিক ইতিহাসচিন্তার এই মানদণ্ডেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজসিংহের পটভূমি হয়ত মুঘল যুগ, রাজপুত, রূপনগর। কিন্তু এর মূল ভিত্তি 'বঙ্গদেশ', বর্তমান যুগ, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা আত্মচেতনারই নামান্তর।" বস্তুত, এই কারণেই অতীতও মূল্যবান হয়ে ওঠে। আমরা অতীতকে বর্তমানরূপেই পাই। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সবিস্তারে ইতিহাসব্যবহারের কারণগুলি বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাম্প্রদায়িকতাবোধ ছিল বলে মনে হয় না। 'রাজসিংহে'র উপসংহারে তিনি তাঁর বক্তব্য বুঝিয়েও বলেছেন। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এক্ষেত্রে অনাচ্ছন্ন ছিল বলেই মনে করি। দিলওয়ার হোসেনও সেই কথাই বলেছেন। মুঘল ইতিহাসের শৈল্পিক ব্যবহার এখানে দেখতে পাই। মুঘল ইতিহাসের নানা বাঁক। সেইসব বাঁকে জীবনের কোলাহল লক্ষ করেছেন শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' সেখান থেকে উঠে আসে জেবউন্নিসা, মবারক, দরিয়ার মতো চরিত্র। দিলওয়ার ইতিহাসবিদদের একটি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদ যখন কিছুটা হিন্দু-জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়েছিল, তখন বীরপূজাও জাতীয়তাবাদীদের সাধনার অন্যতম অঙ্গ ছিল। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বীরবৃন্দ জাতির চিত্ত অধিকার করে নিয়েছিল তখন। এই কারণেই রাজসিংহ ধর্মের রক্ষক, অসাধুর বিনাশকারীরূপে দেখা দেন। জিজিয়া করের প্রসঙ্গ এইজন্যেই অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে। আমাদের মনে হয়, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন তার মধ্যে যথার্থই একটা

জাতীয় জাগরণের ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকাতেই শিক্ষিত বাঙালির আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল। সে জাগরণ এখনকার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সামগ্রিক ছিল না।

রমেশচন্দ্র তাঁর চারটি উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসকে গ্রহণ করেছিলেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। সেজন্যেই চারটি উপন্যাসের সাধারণ নাম ছিল 'শতবর্ষ'। দিলওয়ার হোসেনের লেখায় এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি উল্লিখিত হল না। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে শিল্পগুণে কিছু খাটো, কিন্তু ইতিবৃত্তরচনায় তিনি সতর্ক। 'মাধবীকঙ্কণে' রমেশচন্দ্র আবার মুঘল ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন রোমান্সের রহস্যঘনিমা বিস্তারের জন্যে। ইতিহাসকে গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদের আদর্শকে এক মহান গৌরবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' উপন্যাসে। 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা'য় তিনিই দেখালেন জাতিবিরোধে কিভাবে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমকালীন বাঙলাদেশের শিক্ষিতজনের আকাঙ্ক্ষাকেই রমেশচন্দ্র চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। ইতিহাস থেকে তিনি সেই শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাফল্যের এইটি একটি কারণ। আশা করব, দিলওয়ার হোসেন এই দিকটি ভেবে দেখবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের বিস্তৃত বিশ্লেষণ গ্রন্থটির গৌরব। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য এবং সুজার ভাগ্যবিপর্যয় একই মাত্রায় উচ্চারিত হতে পারে। একথা কোনো-কোনো সমালোচক উল্লেখও করেছেন। বিল্বনের চরিত্রে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধ দৃষ্টিগোচর হয়—তা দিলওয়ার হোসেন লক্ষ করেছেন। এরকম চমৎকার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে পাই নি। ইতিহাসের আশ্রয়েই রবীন্দ্রভাবনা উঠে এল উদার মানবতার ক্ষেত্রে। দিলওয়ার উদাহরণযোগে তা দেখালেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্র পরিবর্তিত হল হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কিছু কল্পনাপ্রবণ ঔপন্যাসিকের দ্বারা। ঘটনার গুরুত্ব আগেই ছিল, এখন আরো বেড়ে গেল। রোমান্স কী পরিমাণে খেয়ালি কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে পারে, এইসব উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। অ্যাডভেনচারের মাদকতা, ডিটেকটিভ উপন্যাসের রহস্যকৌতূহল এ'দের রচনায় খুবই সুলভ। প্রেমের বিচিত্র গতি নির্ণয়ে লেখকবৃন্দ বাস্তবতার ন্যূনতম দাবিকেও মানেন নি। গল্পখোর পাঠক এগুলিকে সমাদর করেছিলেন সন্দেহ নেই। পরিশেষে তাঁরাও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে-কথা দিলওয়ার বলেছেন।

বাঙলা উপন্যাসে ইতিবৃত্তব্যবহারের দুই কোটি। দুই কোটিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লভ্য। এক কোটিতে 'দুর্গেশনন্দিনী', অন্য কোটিতে 'রাজসিংহ'। এক কোটিতে রোমান্সের সম্ভার, অন্য কোটিতে রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আদর্শবাদ—জাতীয়তাবাদ। এক কোটিতে ইতিহাসকে পাই গল্পরসের প্রয়োজনে, অন্য কোটিতে ইতিহাসকে পাই অভিভাবকরূপে। আবার এই দুই কোটির মেলবন্ধনের প্রয়াসও বঙ্কিমচন্দ্রেই লভ্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসেই সেই প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণের মধ্যে ঈষৎ ব্যবধান লক্ষ করেছিলেন, তা অমূলক নয়। মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার করে ঔপন্যাসিকবৃন্দ ইতিহাস আর উপন্যাসের যুগ্মবেণী রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁরা পরিশ্রম করেছেন। কখনও-কখনও মনের মতো গল্প পেয়েছেন (এইচ. বাটারফিল্ড দেখতে পেয়েছিলেন একটি তৈরি গল্পের ছাঁচ কত সহজে ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে পাওয়া যায়।) কখনও পছন্দমতো আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন। দিলওয়ার হোসেনের গ্রন্থে তারই স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বিজিতকুমার দত্ত

ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্প—কমল সরকার। যোগমায়া প্রকাশনী। ১৯৮৪। ৬০ টাকা।

বহুশ্রুত চিত্র সমালোচক লিওনিলো ভেনচুরি-কৃত 'হিসট্রি অব আর্ট ক্রিটিসিজম' গ্রন্থখানি যখন ১৯৩৬ সালে প্রথম ইংরাজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়, তখন এই ইতালীয় লেখকের নূতন চিন্তা সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভেনচুরির নানা নূতন কথার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, আমরা যদি কোনো একখানি চিত্রকে যথার্থ আর্ট বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর সেই চিত্রখানি সম্বন্ধে বলিতে পারি না যে, ইহার এই দিক ভালো এবং এই দিক মন্দ। তখন আমরা শুধু এই চিত্রকরের স্টাইলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু ভেনচুরির যে কথাটি তখন আর্টের ঐতিহাসিক মন দিয়া শুনিয়াছিলেন তাহা হইল এই যে, কোনো চিত্রের মহিমা বুঝিতে হইলে চিত্রকরের ব্যক্তিত্বটি বুঝিয়া লইতে হইবে। চার্লস মেরিয়ট-কৃত ভেনচুরির গ্রন্থের অনুবাদে মন্তব্যটি এইরূপ :

It is the personality of the artist which impresses eternal character upon the elements of taste, the so-called "rules of art."

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা পারসোনালিটির স্বরূপ বুঝিব কী করিয়া। আমরা অজন্তার চিত্রকরদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। অশোকস্তম্ভ কে নির্মাণ করিয়াছিল, জানি না। কালিদাস কেমন মানুষ

ছিলেন, জানি না। কিন্তু গ্রীক চিত্রকর, স্থপতি এবং ভাস্কর ফিডিয়াস সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ নই। আড়াই হাজার বছর পূর্বের এক শিল্পী যে পেরিক্লিসের বন্ধু ছিলেন, তাহা দুবিদিত। অ্যাক্রোপোলিসের জন্য তিনি এথেনার তিনটি মূর্তি গড়িয়াছিলেন, পারথিনানের ফ্রিজ তাঁহার কীর্তি। ওলিমপিয়ার জিউসের মূর্তি তাঁহার সৃষ্টি। কারাবাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। জিজ্ঞাসা করিতে পার—ফিডিয়াসের জীবনের এই ঘটনার সঙ্গে তাঁহার শিল্পের সম্পর্কে কী? 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। শিল্পীর জীবনের কতকগুলি ঘটনার মধ্যে শিল্পীর যথার্থ পরিচয় পাইব না, এ-কথা স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়—শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় তাঁহার শিল্পপ্রতিভার বিচারে অপরিহার্য। আবার ইহাও সত্য যে যখন কোনো শিল্পীর সৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে তখন সেই শিল্পীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়। ইউরোপে রেনেসাঁসের সময় হইতেই শিল্পীর জীবন সম্বন্ধে এই কৌতূহল গভীর হইয়া উঠে। ভাসারির 'লাইভস অব পেনটারস' (১৫৫০) গ্রন্থে দুইশত চিত্রকরের জীবনী পড়িয়া মনে হইয়াছে, ইতালির শিল্পীদের যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহাদের শিল্পকর্মের অন্দরে প্রবেশ লাভ করিলাম। কার্ডেন-লিখিত ভাসারির জীবনী (১৯১০) পড়িয়া বুঝিতে পারি কী নিষ্ঠা-এবং পরিশ্রম-সহকারে ভাসারি এই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা দা ভিনচির প্রতিভায় অভিভূত, তাঁহারা কেনেথ ক্লারক-লিখিত জীবনী পড়িতে আগ্রহী। জে. এ. সাইমনডসের মিকেলেনজোলোর জীবনী (১৮৯২) পড়িয়া মিকেলেনজোলোকে যেন নিবিড়ভাবে বুঝিতে পারি। হাডসনের 'স্যর জসুয়া রেনলডস : পারসোনাল স্টাডি' (১৯৫৮), পড়িয়া স্যর জসুয়াকে নূতন করিয়া পাইলাম।

কিন্তু আমাদের ভাসারি কই, কেনেথ ক্লারক কই, সাইমনডস কই, হাডসন কই? আমরা আমাদের লেখকদের জীবনী কোনোক্রমে লিখিয়াছি, শিল্পীদের জীবনী লিখি নাই। শুনিতে পাই, বাঙালি বড়ো আর্ট-পাগল মানুষ। কোনো আর্টিস্টের জীবনী লিখিয়া বাঙালি সেই পাগলামির পরিচয় দেয় নাই। আমরা সাহিত্যসাধকচরিতমালা লিখিয়াছি। শিল্পসাধকের জীবনসংবাদ লই নাই। আজ যদি কেহ ভারতের ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের ইতিহাস বা উহার সমালোচনার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বিভিন্ন শিল্পীর জন্ম-তারিখ বা মৃত্যুর তারিখ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইবে। বাঙলা ভাষায় এমন কোনো ডিকশনারি বা এনসাইক্লোপিডিয়া নাই যাহাতে এই বিষয়ে নির্ভর করিতে পারি।

বিখ্যাত ব্যঙ্গ-চিত্র-শিল্পী, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষক 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থখানি রচনা করিয়া আমাদের ভাষার একটি বড়ো অভাব দূর করিলেন। বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার গভীর আগ্রহ, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। গ্রন্থের ভূমিকায় কমলবাবু লিখিয়াছেন : "পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় শিল্পীদের কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া নেই। নেই কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও। এজন্যে জানার সুযোগ নেই আমাদের পূর্বসূরীদের। কি তাঁদের পরিচয়, অথবা শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকাই বা ছিল কেমন, উত্তরপুরুষের কাছে আজ তা অজ্ঞাত বিস্মৃত। জাতীয় সংস্কৃতির এই অভাব যখন উপলব্ধি করি তখনই শুরু হয় এই গ্রন্থের কাজ।" কমলবাবুর এই কাজ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সেই অভাব দূর করিয়াছে। বাঙালি যদি আর্ট-পাগল হন তাহা হইলে তাঁহারা সভা ডাকিয়া কমলবাবুর গলায় মালা পরাইয়া দিবেন।

কমলবাবুর এই গ্রন্থে বিভিন্ন শিল্পীর জীবন আর শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহা একজনের পক্ষে সংগ্রহ করা সাধারণত অসম্ভব। বহুজনের যৌথ গবেষণার ফলেই এই ধরনের একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া রচিত হইয়া থাকে। কমলবাবু এককভাবে এই কাজটি সুসম্পন্ন করিয়া আমাদের চমৎকৃত করিয়াছেন।

বিষয়বিন্যাসে গ্রন্থকার যে সুষ্ঠু প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বিদেশী শ্রেষ্ঠ এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রণালীর সঙ্গে তুলনীয়। প্রথমে পাইতেছি শিল্পীর জীবনকথা। এই জীবনকথার মধ্যেই শিল্পীর প্রতিভা সম্বন্ধে মূল বক্তব্য উপস্থিত। ইহার পর শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্র বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য একত্র করা হইয়াছে। কোনো চিত্র বা মূর্তি কোথায় রক্ষিত, তাহাও গ্রন্থকার বলিয়া দিয়াছেন। সর্বশেষে দেওয়া হইয়াছে শিল্পী এবং তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত রচনার তালিকা। ভারতীয় চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যের বিবলিওগ্রাফি আর ক্যাটালগের জন্য এই গ্রন্থ অপরিহার্য। এই বিষয়ে এত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের নাম ইতিপূর্বে কোথাও দেখি নাই। কোনো শিল্পী সম্বন্ধে কবে কোন্ পত্রিকায় কে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই সংবাদ সংগ্রহ করিতে যে কী পরিশ্রম করিতে হয় তাহা অনুমান করিতে পারি। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে 'রূপম' পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে জেমস কাজিনস একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা কয়জন মনে করিয়া রাখিয়াছি? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যে ১৩৩৩ সালের 'প্রবাসী'-র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রমোদকুমার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে বলিয়া দিবে? কমলবাবু বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুরাতন ইংরাজি পত্র-পত্রিকা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এই-সকল প্রবন্ধের সংবাদ দিয়াছেন।

ভারত-প্রবাসী বহু বিদেশী শিল্পী সম্বন্ধে বহু তথ্য কমলবাবু যত্নে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে উপস্থিত করিয়াছেন। জন লকউড কিপলিঙ, ওলিনটো গিলার্ডি, কোলসওয়ারদি গ্রানট, জন গ্রিফিথস, উইলিয়ম হেনরি জবিনস, চার্লস পোট, পারসি ব্রাউন, ই. বি. হ্যাভেল প্রমুখ সম্বন্ধে এত তথ্য একস্থানে ইতিপূর্বে দেখি নাই।

৩১২ জন চিত্রশিল্পী আর ভাস্কর, এবং ভারতে বাস করিয়াছেন এমন ১৮ জন ইউরোপীয় শিল্পী আর শিল্পশিক্ষকের জীবনী-সংবলিত এই বৃহৎ গ্রন্থখানি আমাদের দেশের আর্টের ঐতিহাসিক তথা সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। আশা করি আমাদের ললিতকলা একাডেমি এই অমূল্য গ্রন্থখানির একখানা ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ওযুধের জগৎ এক চক্রান্ত-শঠতা-মুনাফার জগৎ

মানুষের জন্য ওষুধ না, ওষুধের জন্য মানুষ—ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলানটারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, ডকুমেনটেশন সেনটার। দুই টাকা।

অনেক বই আছে যা পড়া শেষ হবার পর মনে হয়, এটি না বেরুলে কার কী ক্ষতি হত? আবার অল্প কিছু বই আছে যা পড়বার পর মনের মধ্যে গভীর ক্ষোভে প্রশ্ন জাগে : এ বই এতদিন বেরোয় নি কেন? আলোচ্য বইটি দ্বিতীয় জাতের।

'মানুষের জন্য ওষুধ না, ওষুধের জন্য মানুষ'—মাত্র ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট নিতান্ত কমদামি বইটি বহু মানুষকে ভাবাবে, বহু মানুষের ঘুম কেড়ে নেবে। ডাকতার, ফার্মাসিসট, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, প্রতিটি সমাজমনস্ক মানুষ, এমনকি প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে এই বইটির স্থান হওয়া উচিত।

ছোটো বই, কিন্তু তথ্যে ঠাসা। চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন ডাকতার অরুণ সেন (চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম), ডাকতার সুজিত দাশ, ডাকতার পীযূষকান্তি সরকার, এবং ডাকতার স্মরজিৎ জানা।

প্রথম প্রবন্ধ দুটি (ডাকতার অরুণ সেন এবং ডাকতার সুজিত দাশ) মূলত বইটির ভূমিকার কাজ করেছে। ডাকতার সেন জানিয়েছেন, আমাদের দেশে যতগুলি ওষুধের বিক্রি আর ব্যবহার হয়, তার বেশির-ভাগই অপ্রয়োজনীয়, অকেজো, এবং নিম্নমানের। এমনকি, বহু ওষুধ মুড়িমুড়কির মতো ব্যবহার হয়—যা স্পষ্টতই ক্ষতিকারক। ডাকতার দাশ তাঁর প্রবন্ধে 'থ্যালিডোমাইড' নামে কুখ্যাত ওষুধটি ইউরোপের মতো উন্নত আর শিক্ষিত মহাদেশে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং বহু মহিলা গর্ভকালে সেটি ব্যবহার করবার খেসারত হিসাবে বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দেন, তার কথা উল্লেখ করেছেন। ওই প্রবন্ধের সঙ্গে একটি 'থ্যালিডোমাইড শিশু'-র ছবি ছাপা হয়েছে—তার দুটি হাত নেই, আর পা দুটি নিতান্ত ছোটো, বিকলাঙ্গ এবং অকেজো। (এই মুহূর্তে মনে হল ঐ ছবিটিরই ব্লো-আপ বইটির দারুণ প্রচ্ছদ হতে পারত!)। ওই সঙ্গে তিনি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন—আমাদের দেশে তথাকথিত কাশির ওষুধ হিসেবে নানা একসপেকটোর্যানট ব্যবহার করা হচ্ছে—যেগুলির নাম আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের একটা কি দুটো ওষুধ কাজের, বাকিগুলো অকাজের। তদন্তে ধরা পড়েছে, ওষুধের প্রকৃত দাম যা হওয়া উচিত, গড়ে তার দ্বিগুণ দাম দিয়ে আমাদের কিনতে হয়—কিছু কিছু ওষুধ আছে যা একশ গুণ থেকে হাজার গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়।...একই ওষুধ বিশ রকম নামে এবং বিশ রকম দামে বিক্রি হচ্ছে, আমরা মুখ বুজে কিনছি।"

ডাকতার সেন আর ডাকতার দাশ যে প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলেছেন—ভারতবর্ষে ওষুধের রাজ্যে এই ব্যাপক, ভয়াবহ নৈরাজ্যের চিত্রটি আরও বিশদাকারে তুলে ধরেছেন ডাকতার পীযূষকান্তি সরকার আর ডাকতার স্মরজিৎ জানা তাঁদের অসাধারণ দুটি প্রবন্ধে। প্রথমবার বইটি পড়ে মনে হয়েছিল একাধিক জায়গায় তাঁদের বক্তব্য যেন 'ওভারল্যাপ' করেছে—অর্থাৎ একই কথা অনাবশ্যকভাবে দুজনেই বলেছেন। দ্বিতীয় পাঠে অবশ্য তা মনে হয় নি। বরং মনে হয়েছে, কিছু-কিছু একই বিষয়ের আলোচনায় পরস্পরের বক্তব্যে 'ডাভটেলিঙ' ঘটেছে—একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্যগুলি মোটামুটি এই :

এক। বহু ওষুধ যা বিদেশে (অর্থাৎ ওষুধপ্রস্তুতকারকদের নিজেদের দেশে) স্পষ্টতই ক্ষতিকারক প্রমাণিত হওয়ায় বাতিল হয়েছে, আমাদের দেশে (এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে) তার বহুল প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ছোটো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পরে বলছি।

দুই। আমাদের দেশে সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তরের অসম্পূর্ণতা এবং বহু ক্ষেত্রে অক্ষমতার কথা তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে, অন্যান্য উন্নত দেশে জাতীয় 'ফারমাকোপিয়া' (যে বইতে ব্যবহারযোগ্য ওষুধের তালিকা এবং গুণাগুণ বর্ণিত থাকে এবং প্রতি নতুন সংস্করণেই রিপোর্টের ভিত্তিতে

পুরোনো কিছু ওষুধ বাতিল বলে ঘোষিত হয় এবং নতুন কিছু ওষুধের নাম সংযোজিত হয়) প্রতি দু-তিন বছর অন্তর নতুন করে ছাপা হয়, অথচ আমাদের দেশে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর একবার মাত্র—১৯৬৬ সালে—সেটি ছাপা হয়েছে। তার পরে আর হয় নি।

তিন। কম দামে বুনিয়াদি ওষুধ (বাল্ক ড্রাগস) কিনে কিংবা ততোধিক কম দামে তৈরি করে সেগুলি বহু গুণ বেশি, এমন কি গলাকাটা দামে বিক্রি করার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে ইউরোপীয় হেক্‌স্‌ট কোম্পানি 'ব্যারলগান' নামে বিখ্যাত ওষুধটি প্রতি কিলোগ্রাম চব্বিশ হাজার টাকা দরে এদেশে বিক্রি করছিলেন। ভারত সরকার ১৯৮১ সালে এ ব্যাপারে তাঁদের প্রশ্ন করায়, তাঁরা জানালেন ওষুধটির উৎপাদনব্যয় আট হাজার টাকার মতো। অথচ পরে ভারত সরকার ব্যাপারটি আরও ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখলেন, সেটি উৎপাদনব্যয় কিলো-প্রতি ১৮১০ টাকার বেশি কিছুতেই হতে পারে না। (অর্থাৎ, ওই ওষুধটি বিক্রি করে লগ্নি মূলধনের উপর বিদেশী কোম্পানিটি লাভ করছিলেন এগারশ শতাংশ!)।

এই পরিসংখ্যানে পাঠকের চোখ কপালে উঠলে আমরা বলব—এহ বাহ্য। ঠিক এই মুহূর্তে সমালোচকের সামনে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজসেবী ডাকতার জাফরুল্লা চৌধুরি-র কিছু লেখা সামনে রয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে—"কতক ওষুধের ব্যবসায়ে লাভের হার ৭০৭৯ শতাংশ"! "৭ ডলার মূল্যের কাঁচামাল তৃতীয় বিশ্বে ২৭৫ ডলার দরে বিক্রি হয়"!

চার। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি তাঁদের বিভিন্ন ওষুধ 'জেনেরিক' (তথা কোনো ওষুধের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মূল নাম) নামের বদলে নিজেদের দেওয়া 'ট্রেড' নাম ব্যবহার করেন এবং প্রচার করেন। যেমন ধরুন, যে ওষুধের মূল জেনেরিক নাম 'প্যারাসেটামল',—সেটিই 'ক্রোসিন', 'ক্যালপল', 'পাইরিজেসিক' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে (এবং, বলা বাহুল্য, বেশি দামে) বিক্রি হয়। এই ব্যাপারটির তীব্র নিন্দা করেছেন লেখকরা।

তবে এ সম্পর্কে সমালোচকের একটি সামান্য ভিন্ন মত আছে। সেকথা পরে বলছি।

এবার আমার নিজস্ব কথা। আমি সেগুলিও ক্রমানুসারে সাজানোর চেষ্টা করি।

প্রথমত, বইটি সত্যিসত্যিই অতিশয় উঁচু মানের হয়েছে। সমস্ত সমাজমনস্ক মানুষেরই এটি অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়ত, বইটিতে বিদেশে বাতিল অথচ এদেশে খোলাখুলি ব্যবহার হচ্ছে এরকম কিছু ওষুধের কথা বলতে গিয়ে লেখকেরা 'অ্যানাবলিক স্টেরয়েড'-এর উল্লেখ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন—ওষুধপ্রস্তুতকারকদের নিজেদের দেশগুলিতে, ওই ওষুধের সঙ্গে দেওয়া কাগজে স্পষ্টভাবে শিশুদের জন্য ওটি ব্যবহার করতে একেবারে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওটি শিশুদের উপর প্রয়োগ করলে তাদের শরীরের বাড় কমে যেতে পারে এবং তারা বেঁটে হয়ে যেতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ওই ওষুধই এদেশে শিশুদের শরীরের 'বাড়' তথা 'গ্রোথ' বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে ডাকতারদের বহুল পরিমাণে উৎসাহিত করা হচ্ছিল।

এবার একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি। গত ১৯৮২ সালে ভারতীয় ফারমাসিউটিকাল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভায়—যেটিতে কয়েকজন দেশবিখ্যাত ওষুধ-বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন, সার্জারি এবং চোখের বিশেষজ্ঞসহ এই অধম জেনারেল প্র্যাকটিশনার সমালোচকও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—সেখানে ওই অ্যানাবলিক স্টেরয়েড-সহ অন্য কিছু বহুলপ্রচারিত ওষুধ সম্পর্কে ওই কারচুপির কথা সমালোচক বলেন। মনে আছে বক্তৃতাশেষে, অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, এই ব্যাপারটি তাঁদের একেবারেই জানা ছিল না। দেশবরেণ্য কিছু ডাকতাররাও এই সাংঘাতিক খবরটি জানতেন না—এই অপরিসীম অজ্ঞতা এমনকি নিতান্ত অজ্ঞ আমাকেও অবাক করেছিল সেদিন।

অবশ্য দোষ ঐ সত্যিকারের জ্ঞানী ডাকতারদের নয়। আসলে বহু ব্যাপারেই সাদা চামড়ার মানুষদের প্রতি একটি দাসসুলভ মনোভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। সেই হিসেবে সাদা চামড়ার লোকে যা বলে তাই-ই আমরা বিশ্বাস করি।

তৃতীয়ত, সাদা চামড়ার ওষুধ-ব্যবসায়ীরাও মূলত বেওসায়ী তারা নিজেদের দেশের মানুষদেরও সর্বদা রেয়াত করে না। এ প্রসঙ্গে 'ক্লোরামফেনিকল' নামে ওষুধটির কথা উল্লেখ করা যেত। বিখ্যাত বহুজাতিক পারক ডেভিস কোম্পানি এটি প্রথম তৈরি করেন এবং 'ক্লোরোমাইসেটিন' নাম দিয়ে বাজারে ছাড়েন। শুধুমাত্র ওই ওষুধটি থেকেই তাঁদের বহুশত কোটি টাকা লাভ হতে থাকে। ওষুধটি মূলত টাইফয়েড রোগ এবং খুব জটিল কিছু পেটের রোগ ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটির অতিরিক্ত ব্যবহারে কখনো-কখনো হাড়ের মজ্জার মধ্যে রক্তকণিকা তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সে অবস্থায় রোগী নিশ্চিতভাবে মারা যায়। অথচ এ ব্যাপারে ১৯৬৭-৬৮ সালে মারকিন সিনেটের সিলেকট কমিটি এবং মারকিন কংগ্রেসের যে বিশেষ ওষুধ-ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিটি বসে তাঁদের সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পারক ডেভিসের ধুন্ধুমার প্রচারের ফলে খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এক হিসেবে এই সাংঘাতিক ওষুধটি সর্দি, কাশি, গালে ব্রণ, মাথাব্যথা ইত্যাদি অতি সামান্য কারণেও যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে। সে সময় তাঁরা তালিকা বানিয়ে দেখেছিলেন যে, ওই ওষুধ যেখানে চারশটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে ওটির ব্যবহার সংগত ছিল।

এবং এর ফলে প্রতি বছর যে চল্লিশ লক্ষ মারকিনিদের উপর এটি প্রয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে 'অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া' হয়ে কত হাজার জন মারা গেছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই!

চতুর্থত, আমাদের দেশেও ডাকতাররা বিদেশী আর দেশী ওষুধগুলি সম্পর্কে টেকস্‌ট বই এবং জারনাল পড়ে যতটা জানছেন তার চেয়ে ঢের বেশি বিশ্বাস করছেন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের কথায়। তাঁদের হাতে সর্বদাই তৈরি থাকে তথাকথিত গাদা-গাদা রিপোর্ট! প্রায়ই দেখা যায়, একটি ওষুধ কিছুদিন প্রচুর ব্যবহার করে—প্রচারানুগ ফল না পেয়ে কিংবা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (সাইড এফেকট) দেখে তাঁরা ঝপ্‌ করে ওষুধটি লেখা ছেড়ে দিচ্ছেন এবং তার বদলে তাঁর কলমে নতুন আনকোরা লেটেস্ট ফ্যাশানের একটি ওষুধের নাম উঠছে হৈ হৈ করে। এই ব্যাপারটি চক্রবৎ চলছে।

বলা বাহুল্য, এই মনোভাব র‍্যাশনাল বা যুক্তিসহ নয়। আমাদের ডাকতারদের, আমাদের নিজস্ব রোগীদের এবং সামগ্রিকভাবেই সমাজের স্বার্থে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হবার সময় এসেছে।

ড্রাগ অ্যাকশান ফোরাম কিংবা ভলানটারি হেলথ অ্যাসোসিয়েসন এ ব্যাপারে পজিটিভলি একটি কাজ করতে পারেন। তাঁরা শিকাগোর মেডিকেল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েসন দ্বারা প্রকাশিত 'মেডিক্যাল লেটার অন ড্রাগ অ্যানড থেরাপিউটিকস'-এর ধরনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নানা ওষুধের গুণাগুণ এবং ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, তাতে, বিশেষভাবে ডাকতার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

পঞ্চমত, আমাদের দেশের বহু কবিরাজি, এবং ইউনানি ওষুধ—যা আন্দাজে-আন্দাজে, এমপিরিক্যালি তথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলির গুণাগুণও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তার দ্বারা শুধুমাত্র যে সাধারণ মানুষ সস্তায় কিছু ভালো ওষুধ পাবেন তাই নয়, ওই সঙ্গে ক্ষতিকারক অথচ বহুলব্যবহৃত নানা ওষুধের প্রচার বন্ধ হবে।

ষষ্ঠত, "যা কিছু বিদেশী তাই-ই ভালো"—এই ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন দুই চিকিৎসক এবং ওষুধবিজ্ঞানী লুই এস গিলম্যান এবং আলফ্রেড গিলম্যান-এর 'ফারমাকোলজিকাল বেসিস অব থেরাপিউটিকস' নামে বইটির কিছু কথার উল্লেখ করব। তাঁরা বলেছেন যে, বিভিন্ন জাতি আর রেসের শরীরের গঠন, খাবারদাবার এবং জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যে বিস্তর ফারাক। তার ফলে, কোনো একটি বিশেষ ওষুধ একদল মানুষের ক্ষেত্রে খুব কাজের হলেও অন্য আরেকদল মানুষের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অকেজো বা এমনকি, ক্ষতিকারক হতে পারে। অর্থাৎ ব্যাপারটি অতিসরলীকৃত করে বোঝাতে গেলে বলব, এমন কিছু ওষুধও থাকতে পারে যা হয়তো সাদা চামড়ার মানুষদের পক্ষে খুব কার্যকর অথচ কালো ত্বকের ভারতীয়দের পক্ষে বিষবৎ!

এ ব্যাপারটিও খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে।

সপ্তমত, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলি দামের হেরফের করে স্পষ্টতই আমাদের গলা কেটে চলেছে দিনের পর দিন! অনেক সময় তাদের ভারতীয় বা বাংলাদেশী শাখা নিজেদেরই হঙকঙ বা ক্যানাডিয়ান শাখার কাছ থেকে বুনিয়াদি ওষুধ কিনছে এবং সেটি পঞ্চাশ থেকে দুশ শতাংশ লাভে বিক্রি করছে। অথচ মজার ব্যাপার, ওই হঙকঙ বা ক্যানাডিয়ান শাখাই মূল দেশের হিসাবে ঐ বুনিয়াদি ওষুধ পাঁচ, দশ বা পঞ্চাশ গুণ দামে বিক্রি করছে! অর্থাৎ শেষমেষ লাভ দাঁড়াচ্ছে অনায়াসে দশ থেকে একশ গুণ!

আমাদের বিশ্বাস, বিলাতের সেনসবেরি কমিটির অনুকরণে এদেশেও ওষুধের দাম, সত্যিকারের উৎপাদনব্যয়, ওষুধ-কোম্পানিগুলির সত্যিকারের লাভ ইত্যাদি ব্যাপার পুরো খুঁটিয়ে দেখা উচিত।

অষ্টমত, বাজারে বিক্রির জন্য ওষুধের 'ব্র্যানড নেম' সম্পূর্ণরূপে তুলে দিয়ে শুধুমাত্র জেনেরিক নেম ব্যবহার করা সম্পর্কে আমরা একমত নই। আমি নেহাতই ব্যক্তিগত কৌতূহল-বশত গত দু-তিন বছরে কলকাতা এবং শহরতলিতে গুটিকয়েক ওষুধের কারখানার ভিতরে কাজকারবার দেখেছিলাম। কিন্তু বিদেশী নামের কারখানাগুলির তুলনায় দেশি 'মধ্যবিত্ত' কারখানাগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত ও কারিগরিগত নিয়ম পালনের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি। এক সরকারি লাইসেনস-প্রাপ্ত কারখানায় দেখেছি ছেঁড়া ময়লা চিকুটি গেনজি গায়ে কয়েকজন শ্রমিক কিছু একটা ট্যাবলেট বানাচ্ছে এবং হাত না ধুয়েই সদ্য-তৈরি ট্যাবলেট দু-আঙুলে টিপে-টিপে দেখছে সেগুলি যথেষ্ট শক্ত হয়েছে কিনা। আরেকটি তথাকথিত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানে দেখেছি, কারখানার মধ্যেই নিজেদের পরীক্ষার ল্যাবরেটরিতে—যেখানে ওষুধগুলি ঠিক বানানো হয়েছে কিনা নিজেরাই পরীক্ষা করেন—সেখানে ওই ব্যাপারের বিশেষ যন্ত্রপাতিগুলিতে যেভাবে ময়লা আর ঝুলকালি লেগে রয়েছে—স্পষ্টতই বোঝা যায় সেগুলির মোটেই ব্যবহার হয় না। অথচ নাম-কা-ওয়াস্তে একজন রিটায়ার্ড কেমিসটের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে এ ব্যাপারে।

নবমত, বইটিতে কিছু কার্টুন রয়েছে। সেগুলি গুরুগম্ভীর বিষয়ের পাশাপাশি নিশ্চয়ই 'রিলিফ'-এর কাজ করেছে। কিন্তু সেগুলি লেখার মানের মতো যথেষ্ট উঁচুমানের হয় নি। পরের

সংস্করণে সে সম্পর্কে নতুন করে ভাববার জন্য প্রকাশকদের অনুরোধ করছি।

আর শেষ কথা? শেষ কথাটি প্রথম কথারই পুনরাবৃত্তি। বইটি প্রত্যেক ডাকতার, সমাজসেবী ও সাধারণ মানুষের পড়া উচিত।

বিষ্ণু মুখার্জি

যাঁর চোখে ধরা পড়েছিল চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য—সৈয়দ আবুল মকসুদ। মিনার্ভা বুকস, ঢাকা। ১ম খণ্ড ৫০ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড ৫০ টাকা। পরিবেশক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ঢাকা।

কিছুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে নিবন্ধের লেখক মন্তব্য করেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বই পাওয়া যায় না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে তিনি অপরিচিত। অনেক উৎসাহী পাঠকও তাঁর নাম জানেন না।' খুবই খাঁটি কথা। বিশেষ করে হাল আমলের সাহিত্য-পাঠকদের অত্যন্ত সীমিত অংশেরই সুযোগ ঘটেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটার। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষমতাবান লেখক-সাহিত্যিকদের খুব কম জনকেই পশ্চিম বাঙলার পাঠকসমাজ চেনেন। এর হেতুবিশ্লেষণের স্থান অবশ্য এটা নয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই বঙ্গে প্রায় অপরিচিত নাম। কিন্তু মজার কথা হল, তাঁর প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল এই কলকাতা থেকেই, ১৯৪৬ সালে। প্রকাশক : পূর্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩। এই বই সম্পর্কে সমসাময়িক কলকাতার 'সওগাত' পত্রিকায় আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল, "তাঁর গল্পগ্রন্থ নয়নচারাতে বলিষ্ঠ কল্পনাবৃত্তি ও সজাগ বাস্তববোধ বন্ধুর মত হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে।" এই সময় কলকাতার সাহিত্যরসিক মহলে তাঁর নাম বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেশ ভাগ হয়ে যায়। তিনি হয়ে পড়েন ওপার বাঙলার নাগরিক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' কমরেড পাবলিশার্স ২১৭, পার্ক স্ট্রীট কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এটি পাঠকসমাজের হাতে প্রথম আসে ১৯৪৯ সালে, ঢাকা থেকে। তথাপি 'লালসালু' এপার বাঙলার পাঠকদের অনেকেই পড়েছিলেন, এবং এই উপন্যাস সম্পর্কে প্রথম দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার চতুরঙ্গ পত্রিকার ১৩৫৬-র শ্রাবণ সংখ্যায়। কবি আহসান হাবীব তাঁর এই আলোচনায় মন্তব্য করেছিলেন, "নব প্রকাশিত উপন্যাস 'লালসালু' তাঁর অগ্রজদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয়েও বরং বলা যেতে পারে, ব্যতিক্রম হয়েই একালের মুসলিম-রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে দাবি জানাল।"

পারিবারিক জীবন এবং জীবিকার সূত্রে মূলত ওপার বাঙলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যিক জীবন বিবর্তিত হওয়ায় এবং দুই বাঙলার মাঝখানে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অদৃশ্য দেয়াল থাকায় এপার বাঙলায় ধীরে-ধীরে তিনি বিস্মৃত হয়ে পড়েন। কিন্তু একেবারে সবাই ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর সৃজনশীলতা পরিণতির কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সে খবর কেউই রাখতেন না, এমন নয়। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে আসে তিনি শিবনারায়ণ রায়। যাঁর নিজের ভাষায় 'চাঁদের অমাবস্যা' পড়ার পর ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'অসামান্যতা' তাঁকে 'ব্যাবর্তিত' করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে প্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুবের নামও অবশ্য উল্লেখ্য। অনেকেই জানেন, বাঙলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা প্রচুর বলে তিনি মনে করতেন না। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি তিনিই কবি শামসুর রাহমানকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার খানিকটা অনধিকারী ধারণা যে, হালের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম-শ্রেণীতে আপনার ও ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্থান সুনিশ্চিত।"

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবী শিল্পী, সাহিত্যিক কলকাতায় সাময়িক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তখন প্যারিসপ্রবাসী। পাকিস্তান সরকারের চক্রান্তে জীবিকাচ্যুত হয়ে জীবনে প্রথম তিনি স্ত্রী আর পুত্র-কন্যা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হন। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সংগঠন ও রসদসংগ্রহের প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বদেশের সেই সংকটমুহূর্তে দেশবাসীর জন্য, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের জন্য উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। ১৯৭১ সালের ১০ই অকটোবর প্যারিস উপকণ্ঠে ম'দে নিজ বাসগৃহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলকাতা-প্রবাসী শওকত ওসমান একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেটি পরে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে এই নিবন্ধে শওকত ওসমান লিখেছিলেন, "বাঙালি মুসলমানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা নির্মাণের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদের অন্যতম মহৎ কারিগর।"

কলকাতায় বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক উপস্থিতি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ, শোকসভা অনুষ্ঠান, 'দেশ'-এ প্রবন্ধ প্রকাশ ইত্যাদির ফলে সত্তরের দশকের প্রথম দিকটায় ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে এপার বাংলায় পাঠক-সমালোচকচিত্তে কিছুটা কৌতূহল জাগ্রত হয়। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশী উপন্যাসের প্রথম পর্বের লেখক ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ আধুনিক উপন্যাস লেখক।.........বাংলাদেশী সাহিত্যের সৌভাগ্য যে তার যাত্রার সূচনাতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌'র মতো একজন শক্তিশালী আধুনিক উপন্যাস লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন।" কিন্তু এইসব আলাপ-আলোচনা এপার বাঙলার সাধারণ পাঠকের কৌতূহল খুব বেশি দিন জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নি। তাঁর বইপত্র সহজলভ্য না হওয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্ অচিরেই আবার বিস্মৃত হয়ে পড়েন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' দু খণ্ডে পাঠ করে বোঝা যায়, এপার বাঙলাতেই শুধু নয়, ওপার বাঙলাতেও ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে উৎসাহ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও তাঁর জীবনী কিংবা সাহিত্যের সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ দেখা যায় নি। তাঁর অগ্রথিত রচনাবলী সংগ্রহ করে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও কেউ গ্রহণ করেন নি। স্বদেশবাসীর এই চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। যাঁর ফলস্বরূপ আমাদের হাতে এসেছে এই অমূল্য আকরগ্রন্থ। 'এর মধ্যে নিবন্ধ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রামাণ্য জীবনকাহিনী এবং একই সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট রচনাবলীর সামগ্রিক পরিচয়। তাঁর অগ্রথিত রচনাবলী এবং অপ্রকাশিত চিঠিপত্রগুলিকেও এই দু খণ্ড সুবৃহৎ পুস্তকে যথাসম্ভব স্থান দেওয়া হয়েছে। চিঠিপত্রগুলি ব্যক্তি ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বোঝার পক্ষে অমূল্য সম্পদ।

সৈয়দ আবুল মকসুদ ওয়ালীউল্লাহ্-রচিত গল্প উপন্যাস, কবিতা আর নাটকগুলির পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সেগুলির যথাসম্ভব মূল্যায়নেও প্রয়াসী হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে সমসাময়িকদের ঈষৎ পরবর্তী কয়েকজন লেখকের বিচার-বিশ্লেষণও তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাবলী কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে ফরাসি এবং ইংরাজি ভাষার অনুবাদের সময় তাঁর 'লালসালু'র মূল কাহিনীর চেহারা লেখক নিজেই কিভাবে বদলে দিয়েছিলেন, তার পরিচয়ও আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, "জায়গার অভাবে অগ্রন্থিত-অপ্রকাশিত আরো কিছু লেখা যুক্ত করা গেলো না। সে-জন্যে সম্ভাব্য তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই।" যা ছিল একটা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ব্যাপার, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেই অসাধ্য সাধনে এগিয়ে এসেছেন। আলোচ্য দুটি খণ্ডে (৩য় খণ্ড যদি নাও লেখা হয়) তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্যকে সেভাবে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত দিতে প্রয়াসী হয়েছেন তা বরাবরের জন্য প্রামাণ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। ভবিষ্যতের গবেষক-সমালোচকদের মালমশলা সংগ্রহের জন্য আর এত কঠিন শ্রম স্বীকার করতে হবে না।

একজন প্রায় উপেক্ষিত অথচ বাঙলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখককে পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় টেনে আনার জন্য সৈয়দ আবুল মকসুদ যে ক্লেশ স্বীকার করেছেন তা যে অনেকাংশে সার্থক হয়েছে তা আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরই বোঝা যায়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের ডিসেমবরে। ১৯৮৩ সালের অকটোবরে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় লেখক তাই জানিয়েছেন, "প্রায় দু-বছর আগে 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' প্রকাশিত হবার পর অপ্রত্যাশিত সাড়া লক্ষ্য করা যায়।... ......বইটি প্রকাশের পর, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পাঠক-সমালোচকগণ যেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতি নতুন করে আগ্রহান্বিত হন। বইটি বেরুবার পরবর্তী কয়েক মাসে দেশের পত্রপত্রিকায় ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে যত লেখা বেরোয় তা পরিমাণে পূর্ববর্তী তিরিশ বছরে প্রকাশিত রচনাবলীকেও ছাড়িয়ে যায়। নানা দিক থেকে উচ্চারিত হতে থাকে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাম।"

বলা বাহুল্য মাঝখানে বিচ্ছিন্নতার অদৃশ্য প্রাচীর থাকায় এর ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছায় নি।

আবদুর রউফ

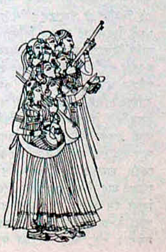

ঢাকার চিঠি

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেমবর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদারদের আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে পাকিস্তান সরকার আর তাদের ঘাতক বাহিনী কুখ্যাত রাজাকার, আল বদর, আল শামন-এর হাতে বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নিহত হন। বলা বাহুল্য, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ন মাসে দেশের সকল পেশার সকল ধর্মমতবর্ণের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—খানসেনা ও তাদের দোসরদের হাতে প্রাণ হারান। নিহত হয়েছেন সম্মুখসমরে সংখ্যাহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রারম্ভে এবং পাকবাহিনীর পরাজয়ের প্রাক্কালেই সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক বুদ্ধিজীবী প্রাণ হারান। উল্লেখযোগ্য যে, সাতচল্লিশের পর থেকে পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা শুধু যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করেছিল তাই নয়, তারা উপর্যুপরি আঘাত হানছিল আমাদের সংস্কৃতির ওপর। এ প্রসঙ্গে বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের কথা স্মরণীয়।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি বছর জাতি ১৪ই ডিসেমবর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করে আসছে। একাত্তরে এই দিনটিতেই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। ১৪ই ডিসেমবর দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি আর বেসরকারি উদ্যোগে নানা সভা, আলোচনা-সভা এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়—তাঁদের জীবন এবং কর্মের ওপর আলোকপাত করা হয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, আইনজীবী, সমাজসেবী প্রভৃতি নানা পেশা আর বৃত্তির মেধাবী মানুষ। পরাজয়বরণের পূর্বমুহূর্তে শত্রুরা বুঝতে পেরেছিল যে রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা, যানবাহন প্রভৃতির ক্ষতি মেরামত করে ব্যবহার্য করে তোলা যায়, কিন্তু কোনো সমাজের বুদ্ধিজীবীদের শেষ করে দিলে সে ক্ষতি হয় সুদূরপ্রসারী—তা অপূরণীয়। তাই তারা ঠান্ডা মাথায় প্রণয়ন করে বুদ্ধিজীবী-নিধনের নীলনকশা। শত্রু আর শত্রুদের দালালরা তালিকা তৈরি করে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি-বাড়ি হানা দিয়ে তাঁদের প্রিয়জনদের সামনে চোখ বেঁধে অস্ত্রের মুখে ঢাকার উপকণ্ঠে একাধিক বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এই পাশবিকতার সঙ্গে এ শতকে একমাত্র নাৎসি-বর্বরতারই তুলনা চলে।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা দেশের খ্যাত-অখ্যাত বহু কবি-সাহিত্যিক থাকলেও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং লেখকদের সংখ্যাও দু-চার জন নয় : ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ার পাশা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই নিহত হন, এবং স্বাধীনতার কয়েকদিন পরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন অসামান্য প্রতিভাবান কথাশিল্পী আর চলচ্চিত্র-পরিচালক জহীর রায়হান। বলা বাহুল্য, অন্যান্য পেশার বুদ্ধিজীবীদের তালিকাও সুদীর্ঘ। তা ছাড়া রয়েছেন অল্পখ্যাত অথচ প্রতিভাবান আরো অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পী।

আমার চোখের সামনে ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের মুখ বারবার ভেসে ওঠে। ড. দেব ছিলেন আমাদের সময়ের বাংলাদেশের একমাত্র দার্শনিক। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান। ঋষিতুল্য এই অজাতশত্রু মানুষটিকে পশু ছাড়া কোনো মনুষ্যসন্তান হত্যা করতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি শুধু আমাদের প্রিয়তম শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় গুরু। মানবতাবাদী এই দার্শনিকের নিষ্পাপ শরীর ২৫শে মার্চ রাতেই খানসেনারা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়—বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করে দেয়।

আমাদের মতো দরিদ্র, অনগ্রসর দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দর্শন বিভাগ আছে, দর্শনের অধ্যাপক আছেন, সেখানে দর্শনশাস্ত্র পড়ানোও হয়, কিন্তু এসব দেশে কোনো দার্শনিক নেই বললেই চলে। যেমন, বাংলাদেশের মানুষও আপেল-আঙুর প্রভৃতি খাবার সুযোগ পায়, যদিও ওগুলো এদেশে উৎপন্ন হয় না, আমদানি করতে হয়। গোবিন্দচন্দ্র দেব দর্শনের শিক্ষকতা করলেও তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন দার্শনিক। তিনি কোনো কারণে দর্শনের শিক্ষকতা না করলেও একজন দার্শনিক হিসেবেই অমর হয়ে থাকতেন। আজীবন অকৃতদার এই মনীষীর খ্যাতি নিহত হবার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই স্বদেশের বাইরে সম্প্রসারিত হতে থাকে।

অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, সমকালীন পশ্চিমী দার্শনিক আর দর্শনের অধ্যাপকদের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দেবের ব্যবধান প্রচুর। রাসেল বা হাইডেগার, সারত্ কিংবা ইয়েসপারস, ভিটগেনস্টাইন বা হোয়াইটহেড, অসটিন কিংবা আয়ার, ব্রড বা পোপার প্রমুখ দার্শনিকের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দেবের দূরত্ব বিস্তর। ড. দেব ছিলেন একেবারে নির্ভেজাল ভাববাদী দার্শনিক, বর্তমান কালের বিশ্লেষণী ও ভাষা-দার্শনিকদের সঙ্গে যিনি আত্মীয়তা বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। দর্শন ছিল তাঁর কাছে জীবনদর্শন—ভাষার মারপ্যাঁচ বা শব্দের খেলা নয়। তা ছাড়া, তিনি যে সমাজের মানুষ ছিলেন তাকে ভালো করে জানতেন : এ সমাজে ভাববাদের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। এজন্যে বলা যায়, তিনি যত বড়ো না দার্শনিক ছিলেন তার চেয়ে বড়ো ছিলেন মানুষ। ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে বরং অনেকখানি নৈকট্য অরবিন্দ, ইকবাল, রাধাকৃষ্ণন বা ব্রজেন শীলের সঙ্গে।

গোবিন্দচন্দ্র-প্রণীত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর প্রধান গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে 'আমার জীবনদর্শন' (১৯৬০), 'তত্ত্ববিদ্যাসার' (১৯৬৬), 'আইডিয়ালিজম অ্যান্ড প্রোগ্রেস, (১৯৫২), 'আইডিয়ালিজম : এ নিউ ডিফেন্স অ্যানড এ নিউ অ্যাপ্লিকেশন, (১৯৫৮), 'অ্যাসপিরেশনস অব দ্য কমন ম্যান,' (১৯৬৩), 'দ্য ফিলসফি অব বিবেকানন্দ অ্যানড দ্য ফিউচার অব ম্যান', (১৯৬৩), 'বুদ্ধ, দ্য হিউম্যানিসট' (১৯৬৯) প্রভৃতি। এ ছাড়াও রয়েছে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু আলোচনা এবং বক্তৃতামূলক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। গত কয়েক বছরে বাংলা একাডেমী থেকে বেরিয়েছে 'গোবিন্দচন্দ্র দেবের রচনাবলী'র তিনটি খন্ড, এগুলোতে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোই শুধু সংকলিত হয়েছে, তাঁর অন্যান্য লেখা দিয়েও আরো একাধিক খন্ড হতে পারে।

গোবিন্দচন্দ্র দেবের ব্যক্তিগত জীবন বাংলাদেশেও আলোচিত হয়েছে খুব অল্পই। ১৯০৭ সালে এই মনীষীর জন্ম সিলেট জেলার এক নিভৃত পল্লীতে। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দেব পুরকায়স্থের সংসারের অবস্থা ভালো ছিল না, তাই তাঁকে শৈশব-কৈশোর অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। অন্যের সাহায্যে পড়াশোনা করেন। ১৯২৫ আর ১৯২৭ সালে যথাক্রমে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে অনারস নিয়ে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯৩১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। জানা যায়, "কলকাতা অধ্যয়নকালে তিনি অনেক বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষকের স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করেন। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ড. হীরালাল হালদার ও ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার এঁদের অন্যতম। এঁদের মধ্যে ড. মহেন্দ্রনাথ সরকারের নাম নিতান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন তিনি এবং সবচেয়ে বেশী প্রশংসামুখর ছিলেন ড. রাধাকৃষ্ণনের পাণ্ডিত্য ও বাচনভঙ্গীর।"

১৯৭৫ সালে 'তত্ত্ববিদ্যা-সার'-এর যখন দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় তখন 'লেখক প্রসঙ্গে' ভূমিকার এক জায়গায় বলা হয়, "এম-এ পাশ করার পর ড. দেব কিছুকাল ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উপর গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন বোম্বাই-এর অমলনীরে অবস্থিত রিসার্চ ইনসটিটিউটে। অমলনীর থেকে ফেরার পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে।...১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে। ১৯৬৩ সালে দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। তিনি এ বিভাগের 'প্রফেসর' হন ১৯৬৭ সালে ; কিন্তু এরপরই তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে চলে যান মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া প্রদেশের উইলকসবারে কলেজে। এক বৎসর সেখানে কাটানোর পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ফিরে আসেন ; কিন্তু ১৯৭০ সালের অকটোবরে তিনি আবার চলে যান উইলকসবারেতে। ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে সেখানে অবস্থান করার সময় তাঁর প্রচারিত সমন্বয়ী ও মানবতাবাদী দর্শনে সেখানকার গুণগ্রাহীরা এত মুগ্ধ হন যে, সেখানে তাঁর স্মরণে 'দ্য গোবিন্দ দেব ফাউনডেশন ফর ওয়ার্লড ব্রাদারহুড' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।" [আবদুল মতিন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, সম্পাদনা হাসান আজিজুল হক, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. আট-নয়।]

ব্যক্তিগত জীবনে ড. দেব ছিলেন উদারচেতা, সবরকম ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এবং শিশুর মতো সরল। তাঁর সারল্য নিয়ে অনেক ছাত্র রসিকতা করত, তিনি নিজে তা টের পেয়েও রুষ্ট হতেন না, বরং কখনো তাঁকে নিয়ে যারা কৌতুক করত তাদের আনন্দে তিনি নিজেও যোগ দিতেন। অবশ্য হাস্যাস্পদ বলতে যা বুঝায় তিনি তা ছিলেন না, কিংবা অশ্রদ্ধার পাত্রও ছিলেন না। এই সহজসরল পরোপকারী মানুষটি ছিলেন অসামান্য কর্মঠ। সারাক্ষণ কাজে বা পড়াশোনায় লিপ্ত থাকতেন। বিভিন্ন সংগঠন আর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নিজেকে নামেমাত্র যুক্ত রাখতেন না, সেসবের কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। মানুষ হিসেবে যেমন তিনি অকপট আর সরল ছিলেন, তেমনি লেখক হিসেবেও তাঁর ভাষাশৈলী ছিল অত্যন্ত ঋজু, দর্শনের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় পরিবেশন করতেন। সচেতনভাবেই তিনি সারল্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "আমি সারা জীবন অল্পবিস্তর যে-শাস্ত্রের আলোচনা করেছি, যার সংস্কৃত নাম দর্শন, আজকের দিনের লোকের তা শুনলেই ঘুম পায়। সেজন্যেই পেশাদার কবিরাজ যেমন তিক্ত ঔষধ সুমিষ্ট অনুপানসহ রোগীকে সেবন করান, আমিও অনেকটা সেই নিয়মেই এলোমেলো অনুপানে দর্শনের চোখা চোখা কথা বিদ্বজ্জনসমাবেশে পেশ করে থাকি।" ['আমার জীবনদর্শন']।

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার বাসনা ছিল গোবিন্দ দেবের। 'আমার জীবনদর্শন'-এর শুরুতেই তাঁর সে-বাসনার কথা অবলীলায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর পৃথিবী তথা সমাজ তাঁর উচ্চারিত কামনায় কর্ণপাত করে নি। তাঁর ভাষায়,

"নিজের নানা দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভাল কাজ করে বেঁচে থাকার আগ্রহ আমার ভেতরে খানিকটা সজাগ ছিলো..."। তাই তিনি ক্রমাগত নানা ধরনের ভালো আর মঙ্গলজনক কর্মের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিলেন।

আগেই বলেছি তিনি পশ্চিমী বিশ্লেষণী দার্শনিকদের মতো ছিলেন না, তাঁর মুখ্য প্রবণতা ছিল প্রাচ্যের ভাববাদেই। বিশ্লেষণী দার্শনিকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "ডেকার্ট-উত্তর দর্শনে তত্ত্বালোচনার যে ন্যূনতম অংশ ছিলো তাকেও তাঁরা ছলেবলে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, ভাষাবিশ্লেষণই দর্শনের সবচেয়ে বড় কাজ। ভাবের আবেগে এঁরা ভুলে যান, দর্শন যদি তত্ত্বালোচনা ছেড়ে দিয়ে ভাষাতত্ত্বের আসর দখল করতে চায় তবে তা তত্ত্ব-রসাস্বাদ থেকে যেমন হবে বঞ্চিত তেমনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও হবে অপারগ।"

এক কথায়, ড. গোবিন্দ দেব তাঁর জীবনদর্শনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা এ-রকম : "ইতিহাসের আদি যুগ থেকে মহাপুরুষেরা প্রায় একবাক্যে যে-পথের সন্ধান দিয়েছেন, আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় সেরাতুল মুস্তাকীম—সত্যের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ, বেদ যার নাম দিয়েছে ঋত, তার পেছনে যে জীবন-দর্শন তারই একটু ইঙ্গিত-আভাস দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার দর্শন-রচনায়।"

তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই বিশদভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। নানা সামাজিক তথা পেশাগত কাজকর্মের ফাঁকেও তিনি যে-রচনাবলী রেখে গেছেন তার মূল্য অল্প নয়।

নিহত হবার কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল এক সন্ধ্যায় সলিমুল্লাহ হলের সামনের ছায়াচ্ছন্ন ফুটপাতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা হল। চারদিকে তখন আন্দোলন আর আন্দোলন। কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হল তাঁকে। উপদেশ দিলেন রাতবিরেতে যেন বাইরে চলা-ফেরা কম করি। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, এটা তিনি দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব কি জানতেন দেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজন পড়বে তাঁরও পবিত্র রক্তের!

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আলোচনা

দেশে বিদেশে

এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া?

গত বছরের ৪ঠা ডিসেম্বরের সকালে বোম্বাইয়ের সান্টাক্রুজ স্টেশনের প্রবেশ-পথের সামনে এই দৃশ্যটির অবতারণা হয় : লোকসভায় নির্বাচন-প্রার্থী, কংগ্রেস (ই) নামে পরিচিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রীসুনীল দত্ত হ্যান্ড-বিল বিতরণ করছেন এবং স্বয়ং তাঁর হাত থেকে সেই প্রচারপত্রটি গ্রহণ করবার জন্যে সেখানে এত লোক জড়ো হয়েছে যে স্টেশনে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ। আশপাশের বাড়ির বারান্দা মহিলাদের ভিড়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম। তাঁদেরই একজন একটা বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে মারাঠিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হিরো খুদ আয়া।" একজন চিত্রপ্রযোজক, শ্রীবলদেব কোশা, মন্তব্য করলেন, "একেই বলে নির্বাচনে জেতার কৌশল। হিন্দি ফিল্মের হিরো কখনো হারে না।"

কিন্তু ফিল্মের হিরো কি সত্যিকারের হিরো? জেঠমালানি বলেছিলেন, "এটা কোন লড়াই নয়। কংগ্রেস (ই) যদি মনে করে পার্লামেন্ট ফিল্ম-স্টুডিও হবে, লোকজনকে তারা ছোট করে দেখছে।"

এবারে এলাহাবাদের একটি দৃশ্য, তারিখ ২৭ নভেম্বর, কালেকটরেটের চৌহদ্দীর মধ্যে দু লাখ লোকের ঠাসা ভিড়। কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীঅমিতাভ বচ্চন এসেছেন মনোনয়নপত্র দাখিল করতে, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জয়া বচ্চন (ভাদুড়ী)-কে সঙ্গে নিয়ে। সার্কিট হাউস থেকে আরম্ভ করে সারা পথ তাঁদের আসতে হয়েছে ভিড়ের ঠেলা সামলাতে সামলাতে। শহরের গোটা পুলিশবাহিনীর অর্ধেক লেগেছে এক-জন নির্বাচনপ্রার্থীর জনপ্রিয়তার ধাক্কা থেকে জনজীবনকে রক্ষা করার কাজে। মেয়েরা গায়ের দোপাট্টা খুলে তাঁর পথে বিছিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু শ্রীবহুগুণা বলেছিলেন, এলাহাবাদের লোক যথেষ্ট রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন, জিজ্ঞেস করেছিলেন, "একজন হালুইকরের তৈরি জিলিপি যদি পছন্দ না হয়, তা হলে তো তার চেয়ে ভালো হালুইকরের খোঁজ করবেন, নাকি একজন দরজির কাছে যাবেন?"

এলাহাবাদের লোক হয়তো খুব হুঁশিয়ার, বোমবাইয়ের লোকও বোকা নয়। কিন্তু এলাহাবাদে, একদা উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি চারবার লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে চারবারই জিতেছিলেন, সেই শ্রীহেমবতীনন্দন বহুগুণাকে হারিয়ে জিতলেন শ্রীঅমিতাভ বচ্চন। বোমবাইয়ে শ্রীরাম জেঠমালানি, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সহ-সভাপতি, যিনি ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে ৯৭,০০০ ভোটে হারিয়েছিলেন তখনকার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী এইচ. আর. গোখলেকে, এবং ১৯৮০-র নির্বাচনে হারিয়েছিলেন কংগ্রেস (ই) রাজ্য নেতা শ্রীরামরাও আদিককে, সেই জবরদস্ত আইনজীবী হেরে গেলেন, জিতলেন শ্রীসুনীল দত্ত।

আশা করা যায়, ভারতের অষ্টম লোকসভা এর পরেও ফিলম তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ না করে এতকাল যা করে এসেছে তাই করবে, এবং হয়তো দেখা যাবে এলাহাবাদের নতুন সংসদ-সদস্যও জিলিপি-রসিকদের হতাশ করছেন না, শ্রীবহুগুণার জিলিপির মতো অতখানি প্যাঁচালো বস্তু তাঁর হাত দিয়ে যদি নাও বেরোয়। শ্রীসুনীল দত্ত স্টুডিওর বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত। বোমবাই শহরের তিনি শেরিফ ছিলেন। তা ছাড়া, ক্যানসার-সংক্রান্ত জনসেবামূলক কাজের সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন অনেক দিন থেকে। শ্রীঅমিতাভ বচ্চনের অবশ্য ফিলমি খ্যাতির যে উত্তুঙ্গে বিরাজ করছিলেন সেখান থেকে নেমে এসে সর্বসাধারণের মধ্যে কাজ করা সহজ ছিল না তবু তিনিও নিজে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, এবং এক সর্বভারতীয়-খ্যাতি-সম্পন্ন কবির পুত্র। এঁদের দুজনের কারো সম্বন্ধেই এ কথা এখনই বলা সম্ভব নয় যে, লোকসভায় তাঁদের ভূমিকা গড়পরতা সাধারণ সদস্যের চেয়ে নিম্নমানের হবে।

লোকসভার বিশাল উদার বক্ষে যেমন অধ্যাপক মধু দণ্ডবতে কিংবা শ্রীবিজু পট্টনায়কের স্থান আছে, তেমনি এমন সদস্যও সেখানে ঠাঁই পান যিনি হাজিরা খাতায় সই করে, এবং যখন যেমন দরকার 'হাঁ' কিংবা 'না'-এর দিকে নিজের ভোটটি দিয়েই মনে করেন তাঁর কর্তব্য সমাধা হল। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের

"প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিতে জনমনে ইমেজ-সৃষ্টির প্রয়োজন স্বীকার করতেই হয়। এবারে নতুন দেখা গেল, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়োগ করে, বিপুল অর্থব্যয়ে, পেশাদার ইমেজ-নির্মাতাদের সাহায্য নিয়ে, সুপরিকল্পিতভাবে জনমনকে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা। এই অমিত-প্রভাবশালী ইমেজ-নির্মাণ এবং ইমেজ-বিকিরণের যন্ত্র যার হাতে, সে জন-মানসে একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে। তখন প্রকৃত গণতন্ত্রের কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে?"

একজন সদস্যের কথা জানা যায়, যাঁর সুদীর্ঘ সংসদীয় জীবনের একটিমাত্র উক্তি পারলামেনটের দৈনিক কার্যবিবরণী, হ্যানসার্ডে নথিযুক্ত আছে : "স্পীকার মহোদয়, ওই জানালাটা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, আমি কি ওটা বন্ধ করে দিতে পারি?"

শ্রীসুনীল দত্ত, শ্রীঅমিতাভ বচ্চন এবং শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা বালি সংসদে নিজেদের যোগ্যতা কত দূর প্রমাণ করতে পারবেন, সেটা ভবিষ্যতের কথা। আপাতত যেটা আমাদের চিন্তার বিষয় তা হল, নির্বাচনে প্রবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে তাঁদের জয়লাভ সম্ভব হল কিসের জোরে?

তিনজনের পেছনেই কংগ্রেসের সমর্থন ছিল ; অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর এবং শ্রীরাজীব গান্ধীর সম্মিলিত টানে যে ভরা কোটাল প্রায় ভারত জুড়ে উদ্বেল হয়েছিল, তা থেকে খানিকটা অতিরিক্ত জোর তাঁরা অবশ্যই পেয়ে থাকবেন। কিন্তু এই আলোচনার সূত্রপাতে যে দুটি দৃশ্যের উল্লেখ আছে তাতে বোঝা যায়, হিন্দি ফিলমের হিরোকে সত্যিকারের হিরোর শিরোপা দেবার একটা তাগিদও ছিল প্রবল এবং ব্যাপক।

মানুষের মনের ওপর সিনেমার প্রভাবের এটা একটা প্রমাণ তো বটেই, সেই সঙ্গে ভালো অভিনেতার যে কত দূর ক্ষমতা থাকে কল্পনার মানুষকে রক্তমাংসে-গড়া সত্যিকারের মানুষের রূপ দেবার, তারও এটা একটা প্রমাণ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, লক্ষ-লক্ষ এলাহাবাদবাসী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে ভোট দেন নি, ভোট দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট বহুসংখ্যক চরিত্রকে যারা প্রজ্বলন্ত ঘৃণার আগুনে পাপকে পুড়িয়ে দেয়, আবার ভালবাসার কোমল আলোয় আবিষ্ট করে দেয় দেশের অসংখ্য কিশোরী, তরুণী এবং তদুর্ধ্ব-বয়স্কদের মন, যারা একাধারে প্রেমিক আর যোদ্ধা। ভোট পেল তারা, আর সংসদের আসনে গিয়ে বসলেন শ্রীঅমিতাভ বচ্চন। কে তিনি? কী তাঁর চরিত্র? কী পরিচয় তাঁর নিজস্ব সত্তার? সমারসেট মমের একটি অল্পখ্যাত উপন্যাসের নায়িকা একজন অভিনেত্রী। তাঁর ছেলে তাঁকে বলছে, "তুমি যখন একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাক, হঠাৎ দরজা খুলতে আমার ভয় হয়। ভয় হয়, দেখব ঘরে কেউ নেই।"

তবু, একথাও ঠিক, দীর্ঘকাল মোটামুটি একই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে যে অভিনেতা লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে একটা ছাপ ফেলে দেন, সেটা যেন তার নিজের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ—এ রকম একটা ধারণা ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। আমেরিকান অভিনেতা গ্যারি কুপার, জন ওয়েন এবং জিমি স্টুয়ার্টের নাম এ প্রসঙ্গে মনে আসে।

সিনেমা-শিল্পের পক্ষে এ ব্যাপারটা লাভজনক, এবং অভিনেতার পক্ষেও সুবিধাজনক বটে। এখন কথা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার চরিত্র এক করে দেখার যে প্রবণতা এবার লক্ষ করা গেল, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং অগ্রগতির স্বার্থে তা কত দূর বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য প্রশ্নটা, এবং সিনেমার অভিনেতার নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার এবং ঔচিত্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকার অবশ্যই আছে। অনুচিত—এমন কথাই বা কে বলবে? আসল প্রশ্ন, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল প্রার্থী হিসেবে এঁদের কেন বাছলেন, লোকেই বা এত বিপুল ভোটে এঁদের কেন জেতালেন?

প্রথম প্রশ্নের খুব সহজ একটা উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটি থেকেই বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ, এঁরা জিতবার মতো প্রার্থী হবেন জানা ছিল, তাই এঁদের দাঁড় করানো হয়েছিল। বিলক্ষণ। লড়াই তো জেতার জন্যে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, এবং সেই প্রশ্নটিই এবারকার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কেউ কেউ বলেছিলেন, নানা বৃত্তির লোক নির্বাচনে বড়ো-বড়ো দলের মনোনয়ন পেয়ে থাকেন, অভিনয়ও একটা বৃত্তি, অতএব অভিনেতাও মনোনয়নের যোগ্য। এই সূত্র ধরেই মূল আলোচ্য বিষয়টি উত্থাপন করা যেতে পারে।

কোনো লেখক, কি সাংবাদিক, কিংবা আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, অথবা অন্য যে-কোনো বৃত্তির লোক যখন নির্বাচনে প্রার্থী হন, ভোটদাতাদের সামনে দুটি প্রশ্ন হাজির হয়। একটি, তাঁর দল কেমন ; আরেকটি, তিনি নিজে কেমন? অবশ্য প্রশ্ন দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না, কারণ প্রার্থী মন্দ হলে তাঁর দলের সম্পর্কেও লোকের মন্দ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবু ধরে নেয়া যায়, ভোটদাতার বিবেচনার জন্যে এই দুটি প্রশ্ন সামনে থাকে। নির্দল ছাড়া অন্য সব প্রার্থীকেই একাধারে নিজের দলের যোগ্যতা, এবং নিজের যোগ্যতার দাবির ওপর দাঁড়িয়ে ভোট চাইতে হয়।

দলের কথা এখন থাক। প্রার্থীর নিজের যোগ্যতার দাবি দাঁড় করাতে হয় তাঁর নিজের কীর্তিকলাপ এবং ধ্যানধারণার ওপর। বস্তুত, মানুষ তার কীর্তিকলাপের মধ্যে দিয়ে নিজের ধ্যানধারণা যতটা প্রকাশ করে, ততটাই মানুষ হিসেবে সে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারের বাগাড়ম্বরের মধ্যে থেকে ভোটদাতা সেই সত্যিকারের মানুষটিকেই খুঁজে বের করবেন, এবং তারই যোগ্যতার বিচারের ওপর, সম্পূর্ণভাবে না হলেও, অন্তত অংশত নির্ভর করবে ভোটদাতার সিদ্ধান্ত। এই রীতি গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যসম্মত, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল।

তার বদলে যদি দেখা যায়, রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের দেবদুর্লভ চরিত্রের প্রতি ভক্তিবশত লক্ষ-লক্ষ লোক ভোট দিচ্ছেন নির্বাচনপ্রার্থী একজন অভিনেতাকে, কিংবা দেখা যায়, কল্পিক দুর্বৃত্তের যম এক কল্পিত দুর্ধর্ষ পুরুষের কল্পিত কীর্তিকলাপে অভিভূত হয়ে একটা গোটা শহরের মানুষ এমন একজনকে ভোটের ডালি উজাড় করে দিচ্ছেন যিনি পেশার প্রয়োজনে বীরের খোলস ছেড়ে বদমায়েশের খোলসও ধরতে পারেন, এবং ভালোবাসার বদলে ঘৃণারও উদ্রেক করতে পারেন, অর্থাৎ আগে যাকে বলা হত ভোট-রঙ্গ, তা যদি সত্যিই রঙ্গ-তামাশার চরিত্র ধারণ করে, তা হলে সত্যিই আশঙ্কা হয়, গণতন্ত্র তার বস্তুভার হারিয়ে ছায়ামাত্রে পরিণত হবে।

অভিনয়ও পেশা, ডাকতারিও পেশা, কিন্তু তফাত এইখানে যে কোনো ডাকতার এমন বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারেন না, কিংবা বলা উচিত, এমন কোনো বিভ্রম-সৃষ্টি তাঁর পেশার অনিবার্য ফল নয়, যাতে সম্পূর্ণভাবে কল্পমায়ার কাঁধে চেপে তিনি নির্বাচনে জিতে যেতে পারেন। অবশ্য অভিনেতা অভিনেতামাত্র নন, সামাজিক জীবও, যদিও সিনেমা-তারকার অত্যধিক জনপ্রিয়তা সামাজিক জীব হিসেবে তাঁকে খর্ব করতে পারে। কারো বেলায় তা যদি নাও হয়, সর্বসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ যদি তিনি করেও থাকেন, তবু সন্দেহ থেকে যায়, ভোট কে পেল—তিনি, না তাঁর অভিনয়প্রতিভার সৃষ্টি চরিত্রমালা?

ভরসার কথা, ভারতের পারলামেনট ফিলম-স্টুডিওতে পরিণত হবার আশঙ্কা এখনও সুদূর। সিনেমা-অধিকৃত রাজনীতি মানে ইমেজ-সর্বস্ব রাজনীতি। প্রার্থনা করি, তার দিন বিলম্বিত হোক। কিন্তু এবারকার লোকসভার নির্বাচনে ইমেজের আধিপত্য-বিস্তারের অন্য কিছু কিছু লক্ষণও দেখা গেল। কাজেই, সব মিলিয়ে একটু দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে।

সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের দুটি প্রধান মাধ্যম—ছাপার অক্ষর, অর্থাৎ প্রধানত খবরের কাগজ, এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম, অর্থাৎ ক্যাসেট, রেডিও আর টেলিভিসন। আমাদের সৌভাগ্য, ছাপার অক্ষরের জগতে সরকারের একচ্ছত্র অধিকার এদেশে নেই, তবু গত নির্বাচনে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে কংগ্রেসের প্রচারকে প্রায় একচ্ছত্র বলা চলে, অন্য কোনো দলকে সেখানে খুঁজে পাওয়াই কঠিন ছিল। তেরোটি বিরাট-বিরাট বিজ্ঞাপনের পেছনে কংগ্রেস নাকি দশ কোটি টাকা খরচ করে। তা ছাড়া পাঁচ কোটি বহুরঙা পোসটার কংগ্রেস ছাপিয়েছিল। সব মিলিয়ে সারা দেশে এই একটি দলই ইমেজের বান ডাকিয়ে ছেড়েছিল। ভারতে নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম প্রচুর অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন এজেনসিকে নির্বাচনী প্রচারের কাজে লাগানো হল। বলা বাহুল্য, এত খরচের ভার বহন করা একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

রেডিও আর টেলিভিসন অবশ্য আইনত নিরপেক্ষ, কিন্তু কৌশলে শাসকদলের অনুকূলে প্রচার তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া সহজেই সম্ভব। আর, ইচ্ছাকৃতভাবে তেমন কিছু যদি নাও করা হয়, প্রধানমন্ত্রী, যেহেতু তিনি প্রধানমন্ত্রী, রেডিও এবং টেলিভিসনের প্রচারে একটা বড়ো রকমের জায়গা দখল করে থাকতে বাধ্য। ভারতের ১৭০টি টেলিভিসন-প্রচার-কেন্দ্র থেকে শ্রীরাজীব গান্ধীর সুদৃশ্য মুখাবয়ব বিকীর্ণ হয়ে সারা দেশের লক্ষ-লক্ষ টেলিভিসনের পরদায় ফুটে উঠবে নানা উপলক্ষে। পদাধিকারের এ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ফলে, জনসাধারণের মনশ্চক্ষে অতি অল্প দিনের মধ্যে শ্রীরাজীব গান্ধীর এমন একটি ইমেজ গড়ে উঠল যার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো কোনো সম্বলই দেখা গেল না বিরোধী পক্ষের কোনো দলের হাতে। ঘটনাসংস্থান তাঁর অনুকূলে ছিল, ক্ষেত্র তাঁর জন্যে প্রস্তুত ছিল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষসমূহের চোখে-মুখে লোকে দেখছিল একটা অসহায় আতঙ্ক। এমন অবস্থায় শ্রীগান্ধীর ইমেজ, একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে, ভারতাকাশে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এ কি স্বপ্ন? এ কি মায়া?

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিতে জনমনে ইমেজ-সৃষ্টির প্রয়োজন স্বীকার করতেই হয়। এবারে নতুন দেখা গেল, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়োগ করে, বিপুল অর্থব্যয়ে, পেশাদার ইমেজ-নির্মাতাদের সাহায্য নিয়ে, সুপরিকল্পিতভাবে জনমনকে প্রভাবিত করবার সফল প্রচেষ্টা। ভাবনার কথা এই যে, এই অত্যাধুনিক রীতির রাজনীতি, আমাদের দেশে এত দিন ধরে যে গণতান্ত্রিক চেতনা একটু-একটু করে গড়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে তাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। অমিতপ্রভাবশালী ইমেজ-নির্মাণ এবং ইমেজ-বিকিরণের যন্ত্র যার হাতে, বিপুল আর্থিক সংগতি যার করায়ত্ত, সে জনমানসে একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে। তখন প্রকৃত গণতন্ত্রের কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে?

দক্ষিণ আফ্রিকা

১৯৮৪-র নোবেল শান্তি পুরস্কার নেবার জন্যে অসলো যাওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরের ধর্মযাজক বিশপ ডেসমনড টুটু ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ওয়াশিংটনে অবতরণ করেছিলেন। সেখানে মারকিন কংগ্রেসের হাউস অব রেপ্রেজেনটেটিভস-এর ফরেন অ্যাফেয়ারস সাব-কমিটির সামনে যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তার সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানালেন, নিজেদের নিয়ম ভেঙে। বিশপ টুটু কিন্তু তাঁদের সামনে নিজের বক্তব্য অতি স্পষ্ট ভাষায় বলতে কসুর করেন নি। তিনি বললেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি "ইমমরাল, ইভিল, অ্যান্ড টোটালি আনক্রিশ্চান" অর্থাৎ, এক কথায় পাপ।

তিনি ঘোষণা করলেন, "আমরা মুক্তি-

লাভ করব, এবং আমরা মনে রাখব কে আমাদের মুক্তিলাভে সাহায্য করেছে।" সে, আর যেই হোক, আমেরিকা নয়। বিশপ টুটুর কথা শোনার পর আমেরিকাবাসী কারো মনে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এর পর প্রেসিডেনট রেগনের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। নিজের ডিম্বাকৃতি অফিস-ঘরে একটি বিবৃতি দেবার পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বললেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার নীতিগুলি ঘৃণাজনক," কিন্তু সেই সঙ্গে দাবি করলেন, "সে দেশের সরকারকে নীতি বদলাতে রাজি করার পথে আমরা লক্ষণীয় অগ্রগতি করেছি।" বিশপ টুটু তার জবাবে জানালেন, "কিছু ফললাভ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আপার্টহেইট নীতিতে যারা উৎপীড়িত তাদের চোখে পড়বার মতো কিছু হয় নি।"

'আপার্টহেইট' শব্দটি সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ভাষা থেকে উদ্ভূত, দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ-বংশীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী আফ্রিকানদের ভাষা আফ্রিকানস থেকে গৃহীত। শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ 'পৃথকতা'। যে সরকারি নীতির নাম হিসেবে শব্দটি প্রযুক্ত, বলা হয়, তার উদ্দেশ্য শ্বেত এবং অশ্বেত বিভিন্ন জাতির মানুষ পৃথক থাকবে এবং পৃথকভাবে উন্নয়ন লাভ করবে।

কথাটা শুনতে তত মন্দ নয়। বিশেষ করে আজকাল যখন চতুর্দিকে জাতি- এবং উপজাতি-গত পৃথক সত্তা, আইডেনটিটি ইত্যাদির পুনরুদ্ধার, রক্ষা, এবং সে সম্পর্কে গর্ববোধ করার আবশ্যকতা অনেকে অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন তখন 'পৃথকতা' নীতি আকর্ষক বলে অবশ্যই মনে হতে পারত। কিন্তু তার বদলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নীতি বিশ্বজনমতের দরবারে অবিমিশ্র ঘৃণারই উদ্রেক করে চলেছে। তার কারণ, বাক্ এবং অর্থের মধ্যে প্রবঞ্চনার যে মস্ত বড়ো ফাঁক, সেটার কথা আর কারো জানতে বাকি নেই।

শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার ১৭ শতাংশের বেশি নয়। অথচ তারা পৃথকভাবে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে অশ্বেতকায়দের দিয়েছে দেশের ১৩ শতাংশ। বাকি দেশ তাদের নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত। দেশে যে-সমস্ত এলাকা 'নেটিভ'দের জন্যে সংরক্ষিত, সব দিকে থেকেই সেগুলি এত নিকৃষ্ট যে, নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় বিশপ টুটু বলেছেন, সেসব জায়গায় অন্নসংস্থান করাই এক সমস্যা। রুজি-রোজগার যেখানে সম্ভব, খাদ্য যেখান থেকে আনতে হয়, সেসব জায়গা কৃষ্ণকায়দের জন্যে নির্দিষ্ট বাসস্থান থেকে বহুদূরে। খাদ্যাভাবে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে, নয়তো শিশুরা খাদ্যাভাবজনিত এমন অসুখে ভুগছে যা সারবার নয়।

নোবেল বক্তৃতায় বিশপ টুটু আরও বলেছেন, ৩০ লক্ষ ঈশ্বরের সন্তানকে তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে জঞ্জালের মতো স্তূপীকৃত করা হয়েছে বান্টুস্তানে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট 'হোমল্যানডে'। তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা কালা-আদমি।

অথচ, বিশপ টুটু বলেছেন, আমি যে দেশ থেকে এসেছি সে দেশ অতি সুন্দর, ভগবান তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সকলেরই জন্যে যথেষ্ট সংস্থান তিনি সেখানে রেখেছেন। আপার্টহেইট মানুষের স্বার্থপরতাকে করেছে আরও দৃঢ়মূল, তাদের লোভ এখন হাত বাড়িয়েছে যা কিছু ভোগের বস্তু সবটুকুই নিজেদের ভাগে টেনে নেবার জন্যে।"

দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতকায় গোষ্ঠীর পরিচালিত শাসনের এই নীতি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অবলম্বিত পন্থায় কোনো দিন পরিবর্তিত হবে, সে আশা করবার মতো লোক আমেরিকাতেও কমে আসছে। সে পন্থাকে প্রেসিডেনট রেগন বলেছেন "কনসট্রাকটিভ এনগেজমেনট"-এর পথ। অর্থাৎ নীতির পরিবর্তনে চেষ্টা চালিয়ে যাব, কিন্তু গঠনের পথে—ভাঙার পথে নয়। অর্থাৎ, সেদেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে বিপন্ন কি বিব্রত না করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজ হাসিল করব।

প্রেসিডেনট রেগনের এই নীতিই এখন বিপন্ন। আমেরিকার ভেতর থেকেই এর বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠছে।

প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ঝড় উত্তাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করে ওয়াশিংটনে দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাসে চারজন বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় নেতাকে আটক করার পর থেকে। ইনডিয়ানার রিপাবলিকান সেনেটর রিচার্ড লুগার (সেনেটের শক্তিশালী ফরেন রিলেশনস কমিটির যিনি সভাপতি) এবং আরেকজন রিপাবলিকান সেনেটর, আফ্রিকা-বিষয়ক সাব-কমিটির প্রধান, ন্যানসি ক্যাসেবম প্রেসিডেনটকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "আপার্টহেইটের নিন্দে করুন আরও জোরগলায়।" মারকিন কংগ্রেসের ৩৫ জন রক্ষণশীল সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত বার্নার্ডাস ফুরিকে ক্যাপিটল হিল-এ ডেকে আমন্ত্রণ করে এনে একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে তাঁরা বলেছেন, "আপার্টহেইটের অবসানের জন্যে জরুরি ব্যবস্থা প্রয়োজন, এই মনোভাবের প্রমাণ যদি না পাই, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ কাজ হতে বড়ো একটা দেখা যায় নি। আরও কঠোর কোনো পদক্ষেপের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার এতদিনকার প্রধান সহায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তুত হতে হবে—আজ না হোক, কাল।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য : সঙ্গ-প্রসঙ্গ

উত্তর-জীবনানন্দ কবিতায় জীবনের কথা

কবিতার কোনো দেশ নেই ; আন্তর্জাতিক নিষেধের পাঁচিল টপকে কবিতা ঢুকে পড়ে এর ঘরে, ওর বাগানে। শীতপাখিদের সঙ্গে দল বেঁধে বাংলাদেশের কবিরা এসেছিলেন কলকাতায় 'কবিতা-উৎসবে' যোগ দিতে। আধুনিক বাঙলা কবিতার দুই বিশিষ্ট পুরুষ শামসুর রহমান আর আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় চতুরঙ্গের পক্ষ থেকে।

শামসুর রহমান

প্রশ্ন : উত্তর-জীবনানন্দ একজন কবি হিসেবে আধুনিক বাঙলা কবিতায় সবথেকে লক্ষণীয় পরিবর্তন কী মনে করেন?

উত্তর : ভাষাব্যবহার এবং ছন্দনির্মাণের ক্ষেত্রে একটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গি এসেছে। এটা তিরিশের পরবর্তী কবিদের কবিতায় একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ক্যাজুয়াল মানে কিন্তু হালকা নয়—অনেক গভীর কথাও এই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলা হয়। বাংলাদেশের কবিতায়, আমি বলতে পারি, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-গণ-অভ্যুত্থান-মুক্তিযুদ্ধ—এ বিষয়গুলো এসেছে। ডকুমেনটেশনের গুরুত্ব বাড়ল। কথ্যছন্দ ব্যাপকতা পেল। ৫০ থেকে এই ক্যাজুয়াল ভঙ্গি বলা যায় জোরদার হল।

প্রশ্ন : একটা খুব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আপনার দেশ যাচ্ছে। এর মধ্যে আপনার সামাজিক ভূমিকাটা কী?

উত্তর : একজন মধ্যবিত্তের। আমি যেখানে থাকি সেই পাড়াটা খুব সাধারণ। আমার পাঠকরাও সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত। আমি এর মধ্যে মানুষের প্রগতি আর কল্যাণে বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন : 'বাংলাদেশ ব্যাংকের তাড়া তাড়া নোট/একঝাঁক ক্রুদ্ধ পাখি হয়ে ঠোকরাচ্ছে পথচারীদের ;/হাজার হাজার কাঠমোল্লার আকাট হৈ হল্লায়/ডুবে যাচ্ছে প্রগাঢ় উচ্চারণ। শক্তিশালী কবিসংঘ অষ্টপ্রহর মেতে রয়েছে বাথরুমের দরজা-জানলা, পাইপ, বেসিন আর কমোড সারাবার কাজে এবং/কুকুরের পাল কবিতা উগড়ে দিচ্ছে মধ্যরাতে।' (স্থানীয় সংবাদ, ইকারুসের আকাশ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২)—এই কবিতাটিকে কোন্ পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করব? একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে এই রচনাটি কি আপনার বিরুদ্ধেও যায় না?

উত্তর : সমাজের পচনশীল একটা দিক কতগুলো প্রতীকের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি, আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমার কিছু করার নেই... একটা পরিস্থিতিকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি ; যদি কেউ খুঁটিয়ে আবিষ্কার করেন যে আমি সেই পরিস্থিতিরই একজন কুশীলব, তাহলে আমি নাচার। আমি মনে করি একজন কবি সকল সময় সত্য উচ্চারণ করবে... আর তা তার নিজের বিরুদ্ধে গেলেও। সবাই নিশ্চয়ই নয়...একটা বিশেষ শ্রেণীর কথাই আমি বলছি...কবিতার পুরোটা দেখা উচিত। এই কবিতার শেষে সিরাজদ্দৌল্লা নিজের কাটা মাথা হাতে নিয়ে বাংলাদেশের নতুন মানচিত্রের মধ্যে দিয়ে চলেছেন ; এরকম একটা ইমেজ রয়েছে।

> "উত্তর-জীবনানন্দ বাঙলা কবিতায় ভাষাব্যবহার এবং ছন্দনির্মাণের ক্ষেত্রে একটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গি এসেছে..."
>
> "সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু, কবিতার শত্রু।"
>
> "মধ্যবিত্ত-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার পাঠক আর কবির সংখ্যা বাড়ছে।"
>
> **শামসুর রাহমান**

প্রশ্ন : সামন্তযুগে কবির খ্যাতি আর রুটি জুটত রাজন্যবর্গের অনুগ্রহে। এখন তার জায়গা নিয়েছেন সরকার বা মিডিয়ার মালিকরা। আপনি এই অবস্থার পরিবর্তন কি কাম্য মনে করেন?

উত্তর : না—মানে আমি ঠিক মানছি না যে সরকার বা মিডিয়া-মালিকরাই মূল নিয়ামক। বরং আমি বলব পাঠক—পাঠকই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই বই কিনে পড়েন।

প্রশ্ন : কিন্তু মিডিয়া তো একজন কম শক্তিশালী লেখককে বেশি প্রচারে ফোরফ্রনটে নিয়ে আসতে পারে—

উত্তর : পারে কিন্তু সব সময়ের জন্য নয়। এটা চিরকাল চলতে পারে না। পাঠকই আবিষ্কার করবেন যে কে ভালো লেখক। নয় কি?

প্রশ্ন : আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলন অনেকবার বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। আপনাদের ওখানে কি এইরকম আন্দোলন হয়? হলে তার চেহারাটা কী?

উত্তর : আমাদের ওখানে এ-জাতীয় আন্দোলন অত তীব্র নয়। দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। সেরকম প্রতিষ্ঠানও অবশ্য আমাদের ওখানে গড়ে ওঠে নি। অবশ্য এখানেও ধরুন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন—তা ওর অনেকেই তো এখন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গেছেন। এটা আমাদের ওখানে সেরকম নয়।

প্রশ্ন : কমলকুমার মজুমদারকে কি আপনি ফিউডাল লেখক মনে করেন? তাঁর মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?

উত্তর : না, আমি কমলবাবুকে ফিউডাল বলব না, কেননা উনি তো ব্রাত্যদের নিয়েই বেশি লিখেছেন ; যেমন অন্তর্জলী যাত্রা...পিঞ্জরে বসিয়া শুক। উনি ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্তনাদকেই কিন্তু ফোকাস করেছেন—ধরুন, সতীদাহকে গ্লোরিফাই করেন নি। অবশ্য

তাঁর পরের দিকের লেখা 'খেলার প্রতিভা'য় আমার মনে হয় উনি অনেক সংবেদনশীল পাঠককেও হারিয়েছেন...

প্রশ্ন : এটা এক ধরনের ব্যর্থতা নয় কি?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যর্থতা—তবে অনেক লেখকের ব্যর্থতা তো অনেক লেখকের সাফল্যের চাইতে বড়ো।

প্রশ্ন : 'কবিতা কী'—এই প্রশ্নে মূলত যে দু-দলকে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের একদল লেখালিখির আগেই কোনো তত্ত্বকে সচেতনভাবে খাড়া করেন এবং পরে অত্যন্ত মেপে শব্দ আর দৃশ্য রচনা করেন। অন্যদল স্বভাব-উচ্ছৃঙ্খল, অনেকটা সহজ কবিত্বে বিশ্বাসী। আপনি নিজেকে কোন্ শিবিরের অন্তর্গত মনে করেন, বা আপনার লেখার পদ্ধতিটি কী রকম?

উত্তর : ঠিক সংজ্ঞা দিয়ে আমার মনে হয় কবিতার পুরো সত্য ধরা যায় না। ধরা যাক, এমনি কোনো আইডিয়া নেই, কিন্তু কয়েকটা শব্দ বা একটা লাইন এল দান—গিফট হিসেবে। তারপর তাকে ফলো করতে-করতে কখনো তিন-চার দিনে, কখনো একমাসে একটা লেখা তৈরি হয়। কখনো আরো দেরি, মাসের পর মাস লেগে যায়। লেখবার পর মনে হয় যে একটা প্রসেসের মধ্যে ছিলাম।

প্রশ্ন : এক সময় শ্রোতা (তখন পাঠক কমই ছিলেন) আর কবির মধ্যে এক সরাসরি সংযোগ সম্ভব হত। কবিতা এখন অনেক বেশি জটিল। কবিতা যত বেশি সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তত বেশি-সংখ্যক তরুণ-যুবকরা কবিতা লেখার ঝুঁকি নিচ্ছেন! এর কারণ নির্দেশ করলে ভালো হয়।

উত্তর : শিক্ষার হার বাড়ছে। তা ছাড়া মধ্যবিত্ত-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। এটা ঠিক যে সে অর্থে কবিতা কোনোদিন মাসের কাছে যাবে না। এই অনেকে কবিতা লিখছেন, এটা পরে দেখা যাবে হয়ত সেরকম কবি কমই।

প্রশ্ন : অনেকে কবিতা লিখছেন। এটার কারণ কি আন-এমপ্লয়মেনট?

উত্তর : না—না, কিছু করার নেই, তা থেকে কেউ কবিতা লেখে না, এটা একটা চয়েস, একটা সিলেকশনের ব্যাপার রয়েছে। ওই মধ্যবিত্ত বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হয় কবিতার পাঠক আর কবির সংখ্যাটা বাড়ছে।

প্রশ্ন : আপনার পেশা, জীবন-যাপন আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে বা সেটা কতটা অনুকূল?

উত্তর : একটা দৈনিকের আর একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করে আমার এখন মনে হয় সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু, কবিতার শত্রু। কিন্তু যেহেতু কবিতা লিখে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসা সম্ভব নয়, তাই আমাকে পেশা-গত কাজ করতেই হয়।

প্রশ্ন : আপনি রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে কী ভাবেন?

উত্তর : আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমি মনে করি এই ব্যবস্থাটার পরিবর্তন দরকার।

প্রশ্ন : এটা কি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসবে?

উত্তর : না, আমি ভায়লেনসে বিশ্বাস করি না—আমি আদর্শের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের কথা বলছি।

প্রশ্ন : সেটা কি গান্ধীবাদী সমাজ-তন্ত্র?

উত্তর : না—মানে, আমি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কথা বলছি।

প্রশ্ন : নন-ভায়লেনটলি? সেটা সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ, এটা হয়তো অনেকটা সোনার পাথরবাটি।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন। আপনার 'ভোট দেবো' কবিতার শেষ তিন পঙ্‌ক্তি (যা মূল সুর কবিতাটির)'ব্যালট পেপারে খুব ঝুঁকে/আমি ভালোবাসা-কেই ভোট দিয়ে ঘরে/কিংবা পার্কে যাবো শিস বাজাতে বাজাতে।' (বাংলা-দেশ স্বপ্ন দেখে : ১৯৭৭ মে)—এটাকে কি পিওর ডকুমেনটেশন বলব, না, এটা কবিতার রিয়ালিটি?

উত্তর : এটা প্রেমের কবিতা—হ্যাঁ, একটা সামাজিক অবস্থার কথা এতে আছে—না, আমি পারছি না। পারছি না বলেই তো লিখেছি।

আল মাহমুদ

প্রশ্ন : উত্তর-জীবনানন্দ বাঙলা কবিতায় সবথেকে লক্ষণীয় পরিবর্তন কী মনে করেন?

উত্তর : এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার মনে হয় যে, জীবনানন্দর কবিতা ছিল নেগেটিভ ; এর পরে কবিতা ক্রমে পজিটিভ হয়ে ওঠে, জীবনানন্দ বলা যেতে পারে সামাজিক অনেক-কিছুতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন—কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে ডুবে ছিলেন। তাই বলা যায় যে জীবনানন্দ আমাদের থেকে দূরে থাকলেও আমরা তাঁর থেকে দূরে থাকতে পারি নি, কারণ আমরাও প্রকৃতির মধ্যে ডুবে আছি।

প্রশ্ন : 'একজন থাকে, যাকে বহুদিন হাসতে দেখি নি/ভাত মাছ তুলে ধরে জেলে দেয় ভাঙা বাতিদান ;/আমার রচনা হতে তেলাপোকা আর আরশোলার মল/রোজ ভোরে সাফ করে। আত্মহত্যা করি এই ভয়ে/লুকায় নিদ্রার বড়ি, দরকারি রুজ্জু ফেলে দেয়।' (আশ্রয়, লোকলোকান্তর)। এরকম তীব্র ব্যক্তি-সংকট আপনার রচনায় চোখে পড়ে। এ ধরনের সমাজ-বিমুখতার কারণ কী? এগুলোকেও কি নেগেটিভ বলা যায় না?

উত্তর : আত্মসচেতনতা অনেক সময় সমাজ-জীবনকে অতিক্রম করে যায়। অবশ্য এসব কম বয়সের লেখা। এইসব লেখাকে, হ্যাঁ, নেগেটিভ বলা যায় ...যদিও জীবনানন্দর স্থবিরতা কবে তুমি-র মতো নেগেটিভ নয়। এখানে অন্তত একজন রয়েছে যে ভাত মাছ নিয়ে বাতিদান তুলে ধরে...। পরে আমার লেখায় এই পরিবর্তনটা এসেছে—'সোনালি কাবিন' থেকেই আমার রচনা আরো বেশি করে পজিটিভ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন : একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে এসে ঢোকবার ফলে কবিতা কি সাধারণ পাঠকের থেকে বেশি দূরে সরে যাচ্ছে?

উত্তর : আমাদের ওখানে তো কবিতাই একমাত্র শিল্প। পঞ্চাশের তরুণরাই কবিতাকে এত জনপ্রিয় করে তোলে ...শামসুর রহমান, আল মাহমুদের কবিতা পড়াটাও স্ট্যাটাসের একটা অংশ—

প্রশ্ন : এটা কি কবিতার ক্ষতি করছে?

উত্তর : হ্যাঁ, তা অনেক সময় করছে, তবে নতুনরাও উঠে আসছেন, তাঁরা আমাদের বিরোধিতাও করছেন, অনেকেই খুব ভালো লিখছেন।

প্রশ্ন : প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের চেহারাটা বাংলাদেশে কী-রকম?

উত্তর : না, এটা ঠিক এরকম নয়—আমাদের ওখানে বরং আমরা চাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। আমরা চাই আরো বড়ো কাগজ গড়ে উঠুক, আরো বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। আমাদের দেশে মাস মিডিয়া কোনো ক্ষতি করে নি।

প্রশ্ন : মানুষ কি বেশি ভিজুয়াল-ওরিয়েনটেড হয়ে যাচ্ছে বলে কবিতার থেকে বেশি দূরে সরে যাচ্ছে?

উত্তর : না, কবিতাই খুব জনপ্রিয় আমাদের ওখানে ; এই তো প্রায়ই আমাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে টি.ভি.-তে, কবিতার সঙ্গে নানা দৃশ্য—এইসব খুবই জনপ্রিয়।

প্রশ্ন : তা হলেও ভিজুয়াল কিছুটা আকর্ষণ তো করছেই—

উত্তর : হ্যাঁ, তা হয়তো করছে, তবে আগেই বলেছি—কবিতাই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প।

প্রশ্ন : কবিতা তৈরির আগে আপনার কি কোনো তত্ত্ব আসে? না, সরাসরি কবিতা লেখায় আপনি অভ্যস্ত?

উত্তর : কোনো তত্ত্বতে কবিতা লেখা যায় না...সৌন্দর্যসৃষ্টিটা পূর্বপরিকল্পিত—শব্দ থেকে অতিরিক্ত অর্থ বার করে নেওয়াটা পূর্বপরিকল্পিত। বেশি কনসাসনেস কবিতার ক্ষতি করে বলে মনে হয়।

"উত্তর-জীবনানন্দ কবিতা ক্রমে পজিটিভ হয়ে ওঠে, জীবনানন্দর কবিতা ছিল নেগেটিভ...।"
"আমরা চাই আরো বড়ো-বড়ো কাগজ গড়ে উঠুক, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক।"

আল মাহমুদ

প্রশ্ন : আপনার জীবনযাপন কিভাবে আপনার লেখাকে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর : কনজারভেটিভ মুসলিম ফ্যামিলি থেকে আমি এসেছি। আরবি-পারসির খুব চল ছিল আগে। পরে সংস্কৃতও ঢুকেছে। মুক্তিযুদ্ধে সকলের সঙ্গে যোগ দিয়েছি—জীবনই আমার লেখায় উঠে আসে। গ্রামে থাকতাম... অবশ্য ঢাকাতে আরবান অ্যাগোনি নেই —ঢাকাতে গ্রাম-প্রাধান্যই বেশি। আমাদের ওখানে সরাসরি প্রায় কোনো লেখক-কবিই রাজনীতি করেন না—কিন্তু রাজনীতি লেখার মধ্যে আসছে, সব সময়ই আসছে।

প্রশ্ন : আমাদের এখানে লেখার বাজারি মান অনুযায়ী জনপ্রিয় না হলে অনেক মহৎ লেখকের রচনাও কম পড়া হয় ; যেমন সতীনাথ, জগদীশ গুপ্ত, কমলকুমার—আপনাদের ওখানে অবস্থা কী রকম?

উত্তর : না, এরকম নয়, কারণ এই-রকম ধ্রুপদী লেখক আমাদের মধ্যে নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি কমলবাবুর স্টাইলকে সমর্থন করি না—কিন্তু মুগ্ধ হই। কমলবাবুর ধর্মীয় চেতনার দিকটা, হিন্দুত্ব আমাকে আকর্ষণ করে। জেল-খানায় উপনিষদ, কোরান, বাইবেল পড়-তাম। এখন আমি ধর্মরাজ্যকেই সমর্থন করি—

প্রশ্ন : ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যানাটিজমও তো আসে?

উত্তর : না, ফ্যানাটিজমের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। দুটো বৃহৎ শক্তির মাঝখানে মানুষের টিকবার জন্যই ধর্মের দরকার।

প্রশ্ন : 'হে মোহান্ত, তেমন কোনো শব্দ জানো কি/যার উচ্চারণকে মন্ত্র বলা যায়?/হে মোয়াজ্জিন, তোমার আহ্বানকে/কী করে আজান বলো যা এতো নির্দিষ্ট।/আর হে নাস্তিক/তোমার উচ্চকণ্ঠ উল্লাসকে কোন শর্তে আনন্দ বলো,/যা এতো দ্বিধান্বিত।/তাই আমি নাস্তিক নই। বিশ্বাসী নই।' (পিপাসার মুখ। লোকলোকান্তর।) আপনার আগেকার এই সংকট থেকে আপনি দূরে চলে এসেছেন। ধর্ম আপনার লেখায় এখন কী-রকম আসছে?

উত্তর : সেরকম নয়—মাঝে-মাঝে উপমা হিসেবে হয়তো আসে।

প্রশ্ন : আপনি এখন লেখালিখি নিয়ে কী ভাবছেন?

উত্তর : আমি এখন গদ্য নিয়ে বেশি ভাবছি—ভাবছি একটা উপন্যাস লেখার কথা—আত্ম-জীবনীমূলক।

তুহিন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রকলা

'গ্রুপ ওয়ান'-এর ছবি

কনিষ্ঠরা আলোচনার সামগ্রী হন তখনই, যখন তাঁরা জ্যেষ্ঠদের স্বীকার করে নিয়েও তারুণ্যের স্বতন্ত্র শিল্পী-স্বভাবের নজির রাখতে পারেন। 'গ্রুপ ওয়ান'-এর চারজন সদস্য অশোক মল্লিক, শ্যাম বানু, শিপ্রা ভট্টাচার্য আর শেখর রায় ব্রিটিশ কাউনসিল লাইব্রেরির প্রেক্ষাঘরে প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই গুরুপরম্পরার জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে এক-একটা ব্যক্তিগত শিল্পভাবনার জগৎকে তিল-তিল করে নির্মাণ করতে শুরু করেছেন।

অশোক মল্লিকের মোট এগারোটি ছবি, শ্যাম বানুর আটটি, শিপ্রা ভট্টাচার্যের আটটি, এবং শেখর রায়ের মোট এগারোটি ছবি নিয়ে তৈরি সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনী চারটি সম্পূর্ণ আলাদা মুডকে ধরিয়ে দিয়েছে।

গোড়াতেই বলে রাখি, 'গ্রুপ ওয়ান'-এর চারজন সদস্যের প্রাথমিক একতা হল, তাঁরা প্রত্যেকেই চলতি শতকের উপান্তে দাঁড়িয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দৃশ্যমান অবয়বকে অবলম্বন করে ছবি এঁকেছেন।

অশোক যে শরীরী আবেদনকে ধরান, তা হল মূলত 'মস্তিষ্ক'। মানুষের মাথাকে, এমনকি জন্তু-জানোয়ারের মাথাকেও তিনি নানারকম টেকসচারে দেখেন। তাঁর ছবিতে মাথাগুলি ঈষৎ খর্বকায়, মুখের প্যাটারন গোল বা চৌকো গোছের, খানিকটা পাথরে কুঁদে তোলা কৃত্রিম শরীর। আর তার ওপর পেশীর এক-একটা পুরু পরদা লাবণ্যহীনভাবে প্রকট হয়ে থাকে। বিশেষ করে তাঁর 'ক্যাম্পেইন' আর 'ফেয়ারওয়েল' ছবিতে আলোকপ্রাচুর্য আর এপিক মন্তাজের ব্যবহার দর্শককে অনেকখানি নাড়া দেয়।

শেখর নিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা। 'ফেসেস' সিরিজে তাঁর দ্রষ্টব্য বিষয় মানুষের মনোলোকের বিচিত্র রহস্য। বিভিন্ন মানসিক দশায় মানুষের চোখের চাউনিতে, ঠোঁটের অবস্থানে, নাকের ফোলা-ফাঁপায়, কপালের ভাঁজে, থুতনির বক্রতায়, গালের পেশীর সংকোচন-প্রসারণে, দৃষ্টির দূরত্বে ব্যবধানে যে বিচিত্র ভূগোল ফুটে ওঠে শেখর তাকে চমৎকার মেলে ধরেছেন একসপ্রেশনিস্ট ঢঙে। সিগারেট-আঙুলে, চিন্তাক্লিষ্ট যে 'ইনটেলেকচুয়্যালস' শিল্পী আঁকেন, সেখানেও জলবিভাজিকা, ভঙ্গিল পর্বত, ব-দ্বীপ, অন্তরীপ ভেদ করে পৌঁছে যান এক সূক্ষ্মচারী বোধে।

শ্যাম বানু তাঁর ছবির অন্তরে, নিভৃতে, তুলির আলতো টানাপোড়েনে বুনে দেন কিছু দেশীয় নকশা, যদিও বুনেছেন খুবই আধুনিক ঢঙে। তাঁর অগোছালো এলোমেলো রঙের দাগে ফুটে উঠতে থাকে এক-একটা অবয়ব। ফলে রঙ-তুলি নিয়ে খানিকটা হিজিবিজি মকশো করার ভঙ্গিতে তাঁর 'এলিফ্যান্ট', 'বক্সার' কিংবা 'কুস্তিগিরে'র চেহারা পেতে থাকে। বিশেষ করে তাঁর 'সেমিনার' ছবিটি দর্শকমনে এক জীবন্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায়।

শিপ্রা ভট্টাচার্য তাঁর ছবিকে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে স্থাপন করেছেন। তাঁর মানুষেরা অভিজাত সামন্তপ্রথার অনভিজাত ইনডিজেনাস। কেউ বা সাবেকি যৌথ পরিবারের সদস্য। তাদের মধ্যে কেউই ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে পীড়িত নয় বলেই বোধহয় তাদের পেটের স্তরে-স্তরে থাক-থাক করে জমা থাকে চর্বি, অথবা তাদের অনেকেই উদরসর্বস্ব হয়। 'রিল্যাকসিঙ আলুবাবু' বা 'বিষ্টুবাবু উইথ হিজ পেট' ছবি দেখে বোঝা যায়, গ্রামীণ এলিটদের সম্পর্কেও শিল্পী একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করেন। তথাপি শরীরী গড়নের আদলে শিল্পী ঝুলিয়ে রাখেন অসমান বাঁকাট্যারা ধাঁচের প্রকাণ্ড নবীনতা, তার পেলবতার অভাবে প্রতীত হয় শিল্পের বর্তমানতা।

সাবালকত্বের দ্বিধামুক্তি যে প্রত্যেকেই অর্জন করেছেন, তা বোঝা গেছে চারজন শিল্পীর ছবি দেখেই। মনে হচ্ছে জট-পাকানো বাস্তব জীবনের গিঁট খোলা আর দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্বকেও তাঁরা উপেক্ষা করবেন না।

বর্ণালী দাস

নাটক

জীবনের থিয়েটারের দিকে

অভিনয়ের থিয়েটার থেকে জীবনের থিয়েটারে অভিগমন নিয়ে এক সময়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে না গিয়ে, বিবিধ উদাহরণের প্রেক্ষিতে দেখাতে চেয়েছিলাম—কিভাবে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গড়ে উঠেছে এই জীবনের থিয়েটারের আদল। প্রসঙ্গক্রমে নানা অনুষ্ঠানের কথা এসেছিল। যেমন, এই মুহূর্তে মনে আসছে, পোল্যানডের থিয়েটার লেবোরেটোরিয়ম-প্রযোজিত 'ট্রী অব পিপল' অনুষ্ঠানটির কথা। প্রথাগত থিয়েটারের কোন্ আদলই বা তা গড়ে তুলছে?

প্রকৃতপক্ষে, 'ট্রী অব পিপল'-এ আমার যোগদানও আকস্মিক। 'থিয়েটার অব সোরসেস'—এই ট্রানস-কালচারাল প্রোগামটির পাঁচদিনের কর্মব্যস্ততার পর দু-এক দিনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। বিশ্রামদিনের বিকেলে থিয়েটার লেবোরেটারিয়মের দোরগোড়ায় প্রচুর ভিড় দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম। এদের অধিকাংশই অল্প বয়সের যুবক-যুবতী। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, এঁরা 'ট্রী অব পিপল'-এ যোগদানের জন্য সমবেত হয়েছেন। চেষ্টা-চরিত্র করে আমিও ঢুকে গেলাম ওঁদের সঙ্গে।

সন্ধে থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হত। সারা রাত ধরে চলত। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার বাধ্যবাধকতা খুব একটা ছিল না। তবে, রাত্রির খাবার খরচার জন্য নির্দিষ্ট কিছু অর্থ দিতে হত। একটি বড়ো হলঘরে সবাই জমা হত। নির্দিষ্ট শর্ত একটিই : সেটি হল মৌখিক নিস্তব্ধতা। এই মৌখিক নিস্তব্ধতার মধ্যেই চলত মুভমেনট। থিয়েটার লেবোরেটোরিয়মের একজন দক্ষ ব্যক্তি হাতে তুলে নিতেন এই মুভমেনট-স্রোতোধারার রাশ। আর এই স্রোতে প্রত্যেকেই সাবলীলভাবে দেহ ভাসিয়ে দিতেন। এটা ঠিকই যে এই দীর্ঘ অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনো গল্পকথাকে অনুসরণ করছে না। কোনো বিশেষ আঙ্গিকের বাধ্যবাধকতার মধ্যেও আটকে থাকবার অবশ্য-শর্ত নেই। আগেই উল্লেখ করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে এই গোত্রের থিয়েটার-সম্ভাবনার এখনো উন্মেষ হয় নি, যদিও স্থানে-স্থানে তার অঙ্কুর অবশ্যই প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এবং এইরকমই সব অঙ্কুর নিহিত রয়েছে নানান লোক-অনুষ্ঠানের মধ্যে।

তথাকথিত সাহিত্যিকতা থেকে এই অনুষ্ঠান অন্য এক মেরুর দিকে যাত্রা করছে। সম্প্রতি ম্যাকসমুলর ভবনে আয়োজিত একটি ত্রিলজির সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল, সেখানে নির্দেশকের অভিনিবেশ অভিনয়শিল্পকে খানিকটা ভেতর দিকে টেনে এনে, এবং কাব্যানুভবকে খানিকটা দৃশ্যময়তায় উৎকীর্ণ হতে দিয়ে, দেখা আর শোনার একটা মেলবন্ধনের জায়গা বোধহয় আরো বেশি অনুভববেদ্য করে দেন বলে মনে হয়েছিল বারবার। অবশ্যই ত্রিলজির যে নির্দিষ্ট কাহিনীকথা অনুসরণ করা হচ্ছে, তা একান্তই সাহিত্যকেন্দ্রিক। অষ্টাদশ শতকের কবি ফ্রিডরিশ হ্যোলডারলীনের জীবন এবং শিল্প নিয়ে গড়ে তোলা প্রথম নাট্যগাথা, নিয়তি ও দেবযান। পরের অনুষ্ঠান নিয়তি ও বিপ্লব। এটিও একটি জীবনভিত্তিক নাট্যরূপ। উনবিংশ শতকের নাট্যরচয়িতা গেয়র্গ বুশনার-এর জীবনালেখ্য অবলম্বনে এর নাট্যকাহিনী। পরের নাট্যকাহিনী হেল্‌লফ্ বীয়ারমান-এর নাট্যকাহিনী অবলম্বনে ড্রাগনবধের পালা। ড্রাগনবধের পালা বাদ দিলে অন্য দুটি নাট্য-আঙ্গিকে যুক্ত হয়েছে চিত্ররূপ। ট্রুডবার্টা দাশগুপ্তের স্লাইড-নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই চিত্ররূপের একটি আস্বাদ অনুভব করা যায়।

স্বভাবতই, পশ্চিমের দেশগুলিতে নাট্যকর্মকে শিল্পের আঙিনা থেকে জীবনের নিকটতম মেরুতে নিয়ে যাবার একটা প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলছে। উল্লিখিত উদাহরণটি তারই একটি নির্দেশমাত্র। এইরকম আরো উদাহরণ পেশ করেছিলাম আগেকার একটি লেখায়। শুধুমাত্র জীবনের নিকটতম মেরুস্পর্শই নয়, এই নাট্য-গবেষণার সাহায্য নিয়েই লক্ষ করা হচ্ছে থিয়েটার নামের এই জীবন্ত মাধ্যমটির শক্তিক্ষমতা। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু অঞ্চলে 'থিয়েটার'-এর থেরাপিউটিক ফাঙশন-এর উপর ভিত্তি করে নানান কর্ম-অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও জীবনযাত্রার অন্য আর-এক মাত্রা খুঁজে পেতে থিয়েটার-মাধ্যমটি নিয়ে চলছে নানান গবেষণা। এবং এ-সমস্ত গবেষণার ভিত্তিভূমি হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে, থিয়েটারকে শিল্পের আঙিনা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, শিল্পিত-প্রসাধনমুক্ত করা।

ম্যাক্সমুলর ভবন-আয়োজিত ত্রিলজির প্রথম অনুষ্ঠান নিয়তি ও দেবযান-এ শুধুমাত্র ফ্রীডরীশ হ্যোলডারলীন-এর জীবনালেখ্য সম্বন্ধে অভিনয়ই নয়, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হ্যোলডারলীনের 'ডি হাইমাট' (আপন স্বদেশ) কবিতাটির একটি চিত্ররূপ। স্লাইডের মাধ্যমে তাকে দর্শকদের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হানস য়ুগেন-নাগেল-এর সম্পাদনায় বিভিন্ন ধ্রুপদী সংগীতের অংশবিশেষ নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য সংগীত-সমাহার। অবশ্যই এইখানে থিয়েটার-মাধ্যমের সঙ্গে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের মেলবন্ধন করার একটি মহৎ চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এবং সেটি আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, এই নাটকে ব্যবহৃত ভাষাও কতটা সাহিত্যগন্ধী। অসামান্য কিছু কবিতার টুকরোও ব্যবহৃত হয়েছে এই নাট্যগাথাটিতে। শিল্পিত উপাদানে নির্মিত এর গঠনরূপ দর্শককে কতটা আহ্লাদিত করেছে, এই প্রশ্নের থেকেও যে মূল প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয় তা হল—থিয়েটারের শিল্পসম্ভাবনার চেয়েও

জৈবনিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাই কি এই সময়ে প্রাসঙ্গিক নয়?

এই জৈবনিক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতেই এক সময়ে অভিনেতাদের শারীরিক সক্ষমতার ওপর থিয়েটার বিশেষ জোর দিয়েছিল। শুধু বাহারি, নয়নলোভন রূপের অধিকারী হলেই আসর মাত করা যায় না, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সুদক্ষ সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে একটি পূর্ণ জীবনের আস্বাদ দেওয়া থিয়েটারের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে সেই সময়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। শুধু তর্ক-বিতর্কই নয়, তার নানান উল্লেখযোগ্য উদাহরণও আমরা দেখতে পেয়েছি। ম্যাক্সমুলর ভবন-আয়োজিত ড্রাগনবধের পালা-য় অবশ্য সাহিত্যানিরূপিত ভাষার বদলে এসেছিল সতেজ প্রাণোচ্ছল সংলাপ। এমনকি, অভিনয়ের আঙ্গিকও অনেক জৈবনিক, স্বতঃস্ফূর্ত। অবশ্যই অন্য দুটি নাট্য-আঙ্গিকে অভিনেতারা নড়া-চড়া করার সুযোগ পান নি বললেই হয়, কোরাসের ব্যবহারে সেখানে তাঁদের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। পরিবর্তে ড্রাগনবধের পালায় অভিনেতারা মঞ্চে শরীরের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, একক অভিনয়ের অবকাশ প্রায় সর্বক্ষণই ছিল এ নাটকে। শুধু মনুষ্যচরিত্রের রূপদানই নয়, মনুষ্যেতর চরিত্রদেরও (মুখোশের সাহায্যে) রূপায়ণ করা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে, কতটা সাবলীল আর সক্ষম ছিল এই শরীরী অভিনয়। এই প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট আশাপ্রদ না হলেও, অন্তত চেষ্টাটুকুর জন্য আমাদের প্রশংসা তাঁদের অবশ্যই প্রাপ্য।

সাহিত্যিকতার থেকে থিয়েটারের ভিন্ন যাত্রাপথের উল্লেখ করছি। সাহিত্যকে ভিত্তি করেও থিয়েটারের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের যথেচ্ছ সংযোগসাধনের একটি চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, পোল্যানডের থিয়েটার ল্যাবরেটোরিয়মে হেরম্যান হেসের 'জারনি টু দ্য ঈসট' অবলম্বনে এক অভিযাত্রার প্রচেষ্টার মধ্যে। হেরম্যান হেসের 'জারনি টু দ্য ঈসট'-এর ভাবছায়াকে নিয়ে শুধুমাত্রই একটি অভিযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল, কাহিনীভাগের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ঐ অনুষ্ঠান রূপায়িত হয় নি, হলে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অবশ্যই থাকত।

ইয়েরজি গ্রোটভস্কির 'থিয়েটার অব সোরসেস' ট্রানস-কালচারাল প্রোগ্রামের শুরু হয়েছিল থিয়েটারের শরীরী কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করে। সেখানে অবশ্যই থিয়েটার প্রতিপাদ্য ছিল না। এই প্রোগ্রামের শুরু হয়েছিল উনিশ-শো আশি সালের মে মাসে। দীর্ঘ তিন বছরে এই প্রোগ্রামটির রূপরেখা অনেক পালটেছে, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সক্রিয় কর্মীদের সংখ্যাও বেড়েছে। 'থিয়েটার অব সোরসেস'—এই ট্রানস-কালচারাল প্রোগ্রামটির ভিত্তিভূমি হিসেবে যে চারটি স্তম্ভ বিদ্যমান, তা হল 'সাইলেনস', 'অ্যাটেনশন', 'অবজারভেশন' ও 'ডিসোসিয়েশন'। এই চারটি সূত্রই দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ; এবং বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক-সামাজিক অবয়বে এই সূত্র চারটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও ভিন্ন নামে—ভাষার ভিন্নতার জন্য। এই চারটি সূত্রকে ভিত্তি করে নানান অ্যাকশন তৈরি হয়েছে। সেই অ্যাকশনে যোগ দেওয়াই নয়, পারটিসিপেনটদের তিন থেকে সাতদিন থাকাও এই প্রোগ্রামের বিশেষ নিয়ম। 'থিয়েটার অব সোরসেস' একটি প্যারালাল লাইফ-স্টাইল তৈরি করছে কি করছে না, এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে সহচরদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু দিন অতিবাহিত করা—জীবনের সঙ্গে এখানেই এর অভেদ্য যোগ। এই যোগ জীবনের নির্দিষ্ট ছায়ারূপ পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে নয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়েই।

লক্ষণীয়, এই সময়ের থিয়েটার-সংক্রান্ত যে বিভিন্ন কর্মচর্চা চলছে, তার দলিলের দিকে চোখ রাখলে থিয়েটারের বর্তমান যাত্রাপথ বেশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই গতিপথ এই মুহূর্তেই জলবৎ সরলীকৃত নয়। তবে, বিভিন্ন নাট্যসাধকের কাছে যে প্রশ্নটি চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হল শিল্প-মাধ্যম হিসেবে থিয়েটার যে দিনকে দিন জীর্ণ হয়ে পড়ছে, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হারিয়ে জীবনেরই তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে, ক্রমশই তা দাঁড়াচ্ছে অর্থহীন। শুধু জীবনকে মূলধন করেই থিয়েটার তার নিজস্ব তাৎপর্য খুঁজে নেবার চেষ্টায় আছে। শারীরিক আর মানসিক জীবনের যথেচ্ছ ব্যবহারে, অনেকের সঙ্গে নিজস্ব সংযোগের অমোঘ ক্রিয়ায় থিয়েটার তার শক্ত ভিত্তিগঠন খুঁজে নিক ক্রমশ, এই প্রত্যাশা নিয়েই নিবন্ধটি এখানে শেষ করা গেল।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

'বিশ্বসাহিত্য' ফীচারটি এ-সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।